—এক—

কালিয়ার যে-ঘাটে তারপাশা-খুলনার ষ্টীমার লাগে সে-ঘাটের কথা বলিতেছি না। তাহার উত্তরের ঘাটে যেখানে সন্নিহিত গ্রাম কয়েকটির অধিবাসীরা পূর্বাহ্ণে স্নান করিতে ও অপরাহ্ণে গা ধুইতে আসে, সেই ঘাটের কথা বলিতেছি। সেই ঘাটের উঁচু পাড়ের সবুজ গালিচাতে পা ছড়াইয়া বাঁ হাতের তলায় মাথা ভর করিয়া বিমান সন্ধ্যার আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব দেখিতেছিল। তাহার সামনে লম্বা মাস তিনেক ছুটি; বি. এ. পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ী গিয়াছে। কিন্তু মাত্র এই কয়েক দিনের বিশ্রামে যেন সে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আর নিষ্কর্ম জীবন ভাল লাগে না। তাই সে চিন্তা করিতেছিল, এখন কি করা যায়, যাহাতে দিনগুলি কোনও মতে কাটান যায়।

সে স্থির করিল, পল্লীসংস্কারের দিকে মন দিবে। তাহাতে পাড়া-গাঁয়ের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থাই প্রথম কার্য। দ্বিতীয় কার্য, অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলন চালাইতে দেশের যে কয়েকটি পুরাতন দেব-মন্দির আছে, সেগুলির মধ্যে যেটি আয়তনে বৃহত্তম, সেইটির অস্তিত্ব রাখিয়া অন্য মন্দিরগুলিতে দেব-দেবী যে-সমস্ত আছে, তাঁহাদিগকে ঐ বিরাট মন্দিরে আনিয়া স্থাপনা করিয়া এবং ছোট-ছোট মন্দিরগুলির দরজা বন্ধ করিয়া বা একেবারে সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, ঐ বড় মন্দিরে জাতি-নির্বিশেষে সমস্তকে প্রবেশের অধিকার দিয়া একত্র জল-স্পর্শের ব্যবস্থা করান। তৃতীয় কার্য যাহা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা নারী-প্রগতির উপায় নির্দেশ করা। স্ত্রী-শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য গ্রাম্য স্কুল কয়েকটিতে ছেলে মেয়ের একত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত করান। বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে

বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, সর্বোপরি যাহাতে গ্রামস্থ কেহ মেয়েদের অন্ততঃ ষোল বৎসরের পূর্বে বিবাহ না দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

বিমান সেই রূপ শুইয়া শুইয়া পল্লী-সংস্কার-ব্যবস্থার কার্য-সূচী মনে মনে আঁকিতেছিল এবং আগামী কল্য হইতে গ্রামে যাহাতে অন্ততঃ সপ্তাহে দুইটি করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারা যায়, তাহার বন্দোবস্তের চিন্তা করিতেছিল।

ইত্যবসরে পশ্চাৎ হইতে কে যেন আসিয়া দুই হাতে তাহার চোখ দুইটি ঢাকিয়া ধরিল। সৌভাগ্যক্রমে সে তাহার 'সেলের' চশমা-জোড়া তখন ডান হাতে ধরিয়া কার্য-পদ্ধতি চিন্তা করিতেছিল, নতুবা উহা ভাঙ্গিয়া চুর-মার হইয়া যাইত।

যে বিমানের চোখ ঢাকিয়াছিল, সে কিছু কাল ঐ রূপই ঢাকিয়া ধরিয়া রহিল, কিন্তু বিমান—সে কে প্রভৃতি কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া চুপ করিয়া একই ভাবে শুইয়া রহিল। শেষে যে চোখ ঢাকিয়াছিল, সে-ই জিজ্ঞাসা করিল—আমি কে?

বিমান উত্তর করিল—

দেখলি মজা ময়না?

কি মজা?

বিমান বলিল—

তোর সবুর সইল না, যে আমি আগে কথা কইব।

ময়না বলিল—

কি করে সবুর সইব? মা যে তোমাকে এখুনি নিয়ে যেতে বলেছে। আমি তোমায় সারা পাড়া খুঁজেছি। তোমাদের বাড়ী গিয়েছি, তোমার 'ক্লাবে' গিয়েছি, অমূল্যদের বাড়ী গিয়েছি, শেষে আন্দাজে এখানে এসেছি। তা যাক, বিমান-দা! ওঠ, চল।

বিমান বলিল—

কেন রে ময়না এত তাড়াতাড়ি ? কি ব্যাপার কি ? কাকীমা কেন আমায় ডেকেছেন ? কাকীমা কি লুচি-পলোয়া করেছেন ?

ময়না উত্তর করিল—

লুচি-পলোয়া না করলেও আমাদের বাড়ী তোমার নেমন্তন্ন। অনেকে খাবে, তুমিও খাবে। ওঠ বিমান-দা ! চল। রাত হলে মা বকবে।

বিমান ময়নার মুখে কাকীমার নেমন্তন্নের কথা শুনিয়া এবং অনেকে খাবে, সেও খাবে—শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল। সে পুনরায় বলিল—

হঠাৎ কি রে ময়না ?

ময়না উত্তর করিল—

তুমি কিছু জান না বিমান-দা ? না—? তুমি ন্যাকা সেজ না। না ওঠ, আমি যাই। এই বলিয়া ময়না সে-স্থান ত্যাগ করিল।

ময়নাদের বাড়ী বিমানদের বাড়ী হইতে খানিক দূরে। বিমান ময়নার মাকে কাকীমা বলে। সে কিছু দিন হইল এই ধর্ম-সম্পর্ক নিজে পাতাইয়াছে। যথনই সে দেশে থাকে তথনই সে সর্বদা ময়নাদের বাড়ী যায় আসে, তাহার লেখা-পড়ার তত্ত্বাবধান করে। ময়নার মাতা তাহাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। ময়নার বৃদ্ধ নিরীহ পিতা শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় বিমানের অমায়িক স্বভাবের প্রশংসা করিতেন এবং নিজের এক মাত্র কন্যা সাধিকা যে তাহার ঐকান্তিক যত্নে এ-যাবৎ লেখা-পড়া শিখিয়া আসিয়াছে, এ-জন্য তিনি তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

ময়না চলিয়া গেলে বিমানচন্দ্র কিছু কাল যাবৎ তাহার সেই পল্লী-সংস্কারের কল্পনা হইতে বিরত হইল। সে কাকীমার নিমন্ত্রণের জন্য যতটা না

বিস্মিত হইল, তাহার অপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইল, ময়নার ঝড়ের মত আসিয়া ঝড়ের মত চলিয়া যাওয়াতে। সে চিন্তা করিতে লাগিল।

ময়না সাধিকার ডাক নাম। তাহার বয়স বার তের। সে গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, উপন্যাসের চরিত্র যখন, তখন নিশ্চয়ই সুন্দরী।

বিমান আর অধিক কাল শুইয়া থাকিল না। রাত্রিও যে তখন কম হইয়াছিল, তাহা নহে। সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল—কাকা কি তবে তাইই করবেন? ছি!

নদীর ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিতে হইলে বিমানকে ময়নাদের বাড়ীর সামনে দিয়াই আসিতে হয়। সে পথ চলিতে চলিতে কখন যে ময়নাদের বাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সে নিজেও বোঝে নাই। সে যেন যন্ত্র-চালিতের মত নিজের বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বিমান নিজ প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া গায়ের জামাটি পর্যন্ত না খুলিয়া তক্তপোষে শুইয়া পড়িল।

বিমানের মাতা সে রাত্রিতে স্বভাবমত পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বারান্দায় মাদুরের উপর 'একটি হ্যারিকেন' জ্বলিতেছে, তিনি তাহার সম্মুখে রামায়ণের সেতু-বন্ধের মধ্যে ডুবিয়াছিলেন।

সহসা অমূল্য আসিয়া ডাক দিল—মাসিমা! বিমান-দা আসে নাই? ময়নার বিয়ের পাকা দেখার নেমন্তন্ন যে। ও-বাড়ীর মাসিমা বিমান-দার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন; রাত যে অনেক হয়ে গেল।

বিমানের মাতা বলিতে পারিল না, যে ছেলে কোথায়। তিনি বই হইতে মুখ তুলিয়া অমূল্যের দিকে তাকাইলেন বটে, কিন্তু পুনরায় পাঠে মন দিলেন। অমূল্য চলিয়া গেল। এত ক্ষণে বিমান ও-ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কি না কে জানে?

—দুই—

হিন্দুদের দেবতাদের মধ্যে কার্তিক যদি বিশেষ রূপবান থাকিয়া থাকেন, তবে আমাদের কার্তিক কিন্তু সেই রূপই ছিল। কিন্তু "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। কার্তিকের বিধবা মাতা তাই আকাশে যত দেবতা আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পায়ে ফুল-চন্দন মানত করিয়াছিলেন,—গুণধর পুত্র যেন তাহার ভাবী শ্বশুরের প্রশ্নের যেটার জবাব নেহাৎ না দিলে নহে, তাহার বেশী না বলিয়া ফেলে। এ-দিকে ছেলের কাছে মা ভয়ে ভয়ে সমস্ত সময় জপের মন্ত্রের মত আওড়াইতেছিলেন—লক্ষ্মী বাবা! তোমার শ্বশুরের সুমুখে যা তা বল না, তিনি যা জিজ্ঞাসা কর্বেন, তার জবাব দিতে পার্লে দিও, নতুবা চুপ করে মাথা নীচু করে থেক। তা হলেই তিনি বুঝবেন ছেলে ভাল, নম্র, ছেলের যেমন চেহারা, তেমন গুণ।

কার্তিকচন্দ্র মায়ের উপদেশে ধপ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া তাহার গগন-ভেদী চীৎকারে বাড়ী তোল-পাড় করিয়া লইয়া বলিল—

তুমি ভাবছ কি মা! আমায় তুমি বোকা ঠাওরেছ? আমি কি তেমন বোকা? আমিই নদের চাঁদের বিয়ের পাকা দেখা দেখলাম। সে বিয়েতে ত আমিই মোড়লী করেছি। কেউ আমায় বলতে পেরেছে—কার্তিক বোকা? মা! আমি তোমার তেমন ছেলে নই মা! সে-দিন নদের চাঁদের শ্বশুর আমার গায়ে দু চার বার হাত চাপড়ে বল্লে—বাহবা কার্তিক! তুমি ত বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। এই দেখ মা! আমি তোমার

সত্যি বলছি—গুরুর দিব্যি মা! মা-কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি—তাতেও তুমি বিশ্বাস না কর্লে চল, তুমি এক্কুণি ঠাকুর-ঘরে চল—সাক্ষাৎ হরি নারায়ণ দুর্গা শিব কালী গণেশ আমাদের শালগ্রাম; তা ছুঁয়ে বলছি—এই কাপড়ের মাঝখানটা যখন সে-দিন বিকেলে খড়ের পালার আগুনের ফুলকিতে পুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল, আমি তক্কুণি নদের চাঁদের শ্বশুরের সামনে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ডোবার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আমার কাপড়ের আগুন নিভে গেল। মা! কেমন আমার বুদ্ধি নেই? জলে আগুন নেভে, তা বুঝি আমি জানিনা? মা! আর এক রকমে আগুন নেভান যায়, আমি তা 'ফিফথ ক্লাসে' বিজ্ঞানের বইতে পড়েছি। মা! তাতে লেখা আছে, যদি কোনও কিছুতে আগুন ধরে, অমনি তা অন্ত একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফেলতে হয়। মা! আমার কাপড়ে যখন আগুন লেগেছিল, তখন নদের চাঁদকে জোর গলায় হেঁকে বলেছিলাম—নদেরচাঁদ, শীগগির আয়, আমায় একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফেল, আমাতে আগুন ধরেছে। তা নদে-বেটা তাদের বড় ঘরে বসে খিল-খিল করে হাসছিল, আর বলছিল—বেশ হয়েছে, পুড়ে মর শালা! আমি কি করি মা! জলে গিয়ে না লাফিয়ে পড়ে তখন এই প্রক্রিয়া যখন জানি? তাইতে মা! যত ক্ষণ নদে-বেটাকে ডাকছিলাম, তত ক্ষণ আমার গায়ে আগুনের তাত লেগে আমার উরুর এখানটায় ফোস্কা পড়েছিল।

এই বলিয়া কার্তিক তাহার মাতাকে সেই দগ্ধ স্থানের চিহ্ন কাপড় তুলিয়া দেখাইল।

অরুন্ধতী পুত্রের সেই ডগ-ডগে পোড়া ঘায়ের কথা মনে ভাবিয়া তখনও শিহরিয়া উঠিলেন এবং কপালে হাত দিলেন। তিনি যে চূণ ও নারিকেল

তেল মিশাইয়া পুত্রের দগ্ধ-স্থানে সেই সময়ে লাগাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কার্তিকের সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না, কারণ তাহার সেজ মেয়ে চারু বড়ই তিরস্কার করিত, কেন তিনি বোকাটার সঙ্গে কথা বলিয়া বাড়ীতে হাঙ্গামার সৃষ্টি করেন। মাতা তাই মেয়ের কথামত কাজ করিতেন।

আকাশের দেবতারা বোধ হয় সে-দিন অরুন্ধতীর কাতর নিবেদন কানে শুনিয়াছিলেন। তাই শ্রীমান কার্তিকচন্দ্র শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখে মাত্র দুইটি কথা বলিয়াছিল। একটি তাহার নাম শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেবশর্মা, অন্যটি সে 'ফোর্থ ক্লাসে' পড়ে। অবশ্য এই দুইটি উত্তর সে তাহার শ্বশুরের প্রশ্ন মতই দিয়াছিল। এই সময় তাহার প্রাণের বন্ধু নদের চাঁদ তাহাকে ডাক দিয়াছিল—

কার্তিক! শোন।

কারণ কার্তিকের দিদি চারু নদের চাঁদের সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, যে যেই কার্তিক দুই একটি প্রশ্নের জবাব দিবে, অমনি সে তাহাকে ডাক দিবে। কার্তিকচন্দ্র তাই নদের চাঁদের ডাকে সে-স্থান হইতে চলিয়া আসিল।

নদের চাঁদও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চল কার্তিক! ও-পাড়ায় দুটো বড় কুকুরের লড়াই হবে।

কার্তিক জোরেই বলিল—দেখ নদে! আমার শ্বশুর-মহাশয়কে ত বলা হল না, ক্লাসের সব ছেলেরা আমাকে 'ফার্ষ্ট বয়' বলে, গাঙ্গুলী মাষ্টার রোজ আমায় আমার নাম যা, তাই হয়ে দাঁড়াতে বলে।

নদের চাঁদ চারু-দির ইঙ্গিতমত বলিল—তা হলে তুই কুকুর লড়াই দেখবি না? আমি যাই। কার্তিক! এই কুকুর দুটো রোজ আসবে না।

কার্তিকচন্দ্র তখন সত্য সত্যই ভাবিল—বিবাহ অবশ্য রোজ হইতে পারে, তাহার শ্বশুর-মহাশয় অবশ্য রোজ আসিতে পারেন, কিন্তু এই কুকুর দুইটি চলিয়া গেলে আর হয় ত নাও আসিতে পারে। তাহার একটি আনন্দের বস্তু, কুকুরের লড়াই দেখা। যখন একটা বলবান কুকুর অন্তঃদুর্বল কুকুরকে আক্রমণ করিয়া টুটি কামড়াইয়া ঝাঁকিতে থাকে, তখন কার্তিকচন্দ্রের স্ফূর্তির আর সীমা থাকে না। সেও ঐ ঘেউ-ঘেউ-করা কুকুরের একটার লেজ এ-দিক দিয়া টানে, অন্যটার লেজ ও-দিক দিয়া টানে, ভয় তাহাতে তাহার মোটেই হয় না। কিন্তু শেষে যখন অপেক্ষাকৃত বলশালী কুকুর দুর্বলটিকে খেলার ছলা ছাড়িয়া আহত করিবার চেষ্টা করে, তখন কার্তিক আর স্থির থাকিতে পারে না। নিজেই গিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ঘুষি মারিয়া দুইটাকে ছাড়াইয়া দেয়। তারপর যদি কোন কুকুরের আহত স্থান দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তখন সে নিজের পরিহিত গেঞ্জী অথবা কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়া উহা জলে ভিজাইয়া সেই রক্ত ধোয়াইয়া দেয় এবং নিকটস্থ যে-বাড়ীতেই হউক না, ঢুকিয়া, চুণ-হলুদ মিশাইয়া আনিয়া আহত স্থানে লাগাইয়া দেয়। আর মনে মনে বলে—'ফিফথ ক্লাসে' হরিপদ-মাষ্টার যা শিখিয়েছে, তা অনেক কাজে লাগে।

নন্দের চাঁদ কার্তিককে লইয়া গেলে অরুন্ধতী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। চারু যে এত কাল সশস্ত্র পুলিশের কাজ করিতেছিল, সে তখন তাঐ-মহাশয়ের কাছে অগ্রসর হইল।

দেখিল—অতি দিব্য কান্তি, অশীতিপর বৃদ্ধ, কিন্তু রূপ-জ্যোতি যেন সমস্ত দেহাবয়ব হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কেশ পলিত, শ্মশ্রু শণের মত সাদা—বুকের কড়া পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মুখের বাণী যেন অমৃত।

চারুকে দেখিবা মাত্র শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মেয়েটি কে বেয়ান ঠাকরুন?

বৈবাহিকা জবাব দিলেন—আমার মেয়ে চারু। চারু আমার সেজ মেয়ে। ওর আগে আমার দুই মেয়ে আছে, তারা এখানে নাই। সবাই শ্বশুর-ঘর করে। তাদের অবস্থা বেশ ভাল—জায়গা জমি টাকা পয়সা যথেষ্ট। এখানে সব সময় থাকলে এদের কারুরই চলে না। তবে কি জানেন আমার ত একটি মেয়ে কাছে না থাকলে চলে না। কে এই বয়সে মায়ের কষ্ট বোঝে? দেখুন—ছেলেই বলুন, আর যাই বলুন, মার যত্ন মেয়ে ভিন্ন করে না, আর মায়ের দুঃখ মেয়ে ছাড়া কেউ বোঝে না। আমি তাই আমার তিনটি মেয়েকে পালা করে বছরে চার মাস রাখি। আমার সব মেয়েরই সন্তানাদি হয়েছে। বাছারাও সব বেঁচে আছে। তিনি যে-বার স্বর্গে যান, সে-বারে আমার স্বর্ণের ছোট ছেলেটি হয়। সেই ছেলেরও বয়স পাঁচ বৎসর পেরুতে চল্ল।

পাত্রকে এক রূপ দেখা শেষ করিয়া শম্ভুনাথ স্নানাদি সমাপন করিতে গিয়াছিলেন। স্নানের আহ্নিকের সময়ও শম্ভুনাথ শুধুই ভাবিতেছিলেন—সদ্বংশজ হইলেই হইল, মেয়ে বড় হইয়াছে। কার্তিকই বা খারাপ ছেলে কিসের? তিনি মনে করিলেন—ওঃ! একটা ভুল হয়েছে ত। বেয়ান ঠাকরুণের কাছে ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কার্তিক সন্ধ্যা-আহ্নিকটা জানে কি না। যে দিন-কালের পরিবর্তন হতে চলেছে, তাতে আর এ সব পুরাণ প্রথা থাকবে না। এখন মেয়েকে শিক্ষা দাও, দেশের কাজ কর্বে। ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে চলা-ফেরা কর্বে। কি সর্বনাশ! আগুন আর ঘি একত্র!

সে-দিন আহ্নিকে বসিয়া শম্ভুনাথ মনঃ-সংযোগ করিয়া আহ্নিক করিতে

পারিলেন না। কোনও মতে তিনি ভগবানের পায়ে নিবেদন জানাইয়া পূজার আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। চারু আহ্নিকের আসনের নিকটেই তাঐ-মহাশয়ের আহারাদির আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

শম্ভুনাথ খাইতে বসিয়া আহারের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি বৈবাহিকাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—

বেয়ান-ঠাকরুণ কি আমাকেই বর ঠাউরেছেন না কি ?

চারু এই বৃদ্ধের রসিকতায় মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

শম্ভুনাথ খাবারের প্রত্যেক পদটির রন্ধনই অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং খাইলেনও বেশ। শেষে আহার শেষ করিবার উদ্যোগ করিতেই বৈবাহিকা মহাশয়া বলিলেন—

না, আরও খান ; আপনার কিছুতেই পেট ভরে নাই।

বৈবাহিকা বলিলেন—

সত্যি বেয়ান-ঠাকরুণ ! আমি লজ্জা করে খাই না। এ ত নিজের বাড়ী। এখানে লজ্জা কর্লে কোথায় প্রাণ ভরে খাব ?

চারু বলিল—

না তাঐ-মশায় ! ঐ পায়েসটুকু সমস্তই আপনার খেয়ে উঠতে হবে।

তাঐ-মশায় দীর্ঘ একটি তৃপ্তি-ভোজনের ঢেকুর তুলিয়া বলিলেন—না মা ! আর পারি না। মা ! খাওয়ার ভেতর কি আছে ? এ বাড়ীর ঐকান্তিক যত্নে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়েছি। আমার ময়না এসে এমন শাশুড়ী আর এমন ননদ পেয়ে বাস্তবিকই সৌভাগ্যবতী হবে।

আহারের পর বিশ্রাম করিয়া শম্ভুনাথ যখন উঠিয়া বসিলেন, তখন বেলা প্রায় চারিটা। শম্ভুনাথ দেখিলেন, কার্তিকের বড় মামা তখন আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাহার বাড়ী যাত্রাপুরের উত্তর গ্রামে। তিনিই এই

পরিবারটির তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহার নিজের ঘর-সংসার আছে বলিয়া দিবা-রাত্র বোনের বাড়ীতে থাকিয়া নিজের কাজের ক্ষতি করিতে পারেন না। তবে তিনি খবর পাইলেই আসিয়া থাকেন। কার্তিকের মামা সমস্ত ব্যাপার সম্যক জানিয়াই শম্ভুনাথের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রতি কথায়ই তিনি শম্ভুনাথের পায়ে হাত ঠেকাইয়া আলাপাদি করিতে লাগিলেন। শম্ভুনাথও তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ অতি ধূর্ত, রাশ-ভারি লোক ছিলেন। কার্তিকচন্দ্র সংসারে যদি কাহাকেও ভয় করিত, তবে সে মাত্র তাহার মামাকে। তাহার এত বক-বকানি ডাকাত-মামার সম্মুখে যেন উপিয়া যাইত। ব্রহ্মাণ্ডনাথ এই বাটীতে আসিবার পূর্বে কার্তিককে ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত চোখ গরম করিয়া বলিয়াছিলেন—যা, কার্তিক! রান্না ঘরে গিয়ে চুপ করে থাক। যখন ডাকব, তখন আসবি।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম কথাই যাহা শম্ভুনাথের সঙ্গে হইয়াছিল, তাহা দেনা-পাওনা লইয়া। শম্ভুনাথ অনেক ধরা-ধরি করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে মত করাইলেন, যে তিনি তাঁহার মেয়েকে গহনাদি সাধারণ মত দিবেন। তাঁহার জামাতাকে বর-শয্যা, বরাভরণাদি দিতে তিনি স্বীকৃত আছেন এবং বিবাহের যাতায়াতাদি বাবদ এক শত এক টাকার অধিক তিনি দিতে পারিবেন না।

অরুন্ধতী তাঁহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—

দাদা! আমাদের বেয়াই অতি সজ্জন, জোর-জবরদস্তি করে তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় কর্তে রাজী নই। কার্তিকের আশীর্বাদ হোক।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তাই গম্ভীর স্বরে কার্তিককে ডাকিলেন। আশীর্বাদের যোগাড়-যন্ত্র পূর্ব হইতেই চারু করিয়া রাখিয়াছিল। সে যথা-রীতি সমস্তই আনিয়া দিল।

কার্তিক সেখানে আসিয়া তাহার চড়া গলায় বলিয়া উঠিল—মা! নন্দের চাঁদ কিন্তু তার বিয়ের পাকা দেখায় বাড়ীর সকলকে প্রণাম করেছিল, আমিও কিন্তু তাই কর্ব। বড়-মামা! তুমি আমায় চুপ কর্তে বলেছিলে, আমি কিন্তু চুপ কর্লাম।

—তিন—

আমি তাকে ভালবাসি, বড় ভালবাসি। সে আমার দেহ, সে আমার প্রাণ, আমি তাকে ছাড়া কিছুতেই বাঁচতে পারি না—বিমানচন্দ্র সে-দিন ভোর রাত্রিতে বিনিদ্র-শয্যায় শুইয়া ইহাই মনে মনে বলিতেছিল। সত্য কথা বলিতে কি—সেই রাত্রিতে সে এক পলকও ঘুমায় নাই। একটা সুষুপ্তির জড়তা তাহার চক্ষু আশ্রয় করিয়াছিল, তাই যেন সে সদাই মনে করিতেছিল—সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তন্দ্রার আবেশে তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন বাড়ীতে শুইয়া নাই। সেই কালিয়ার নদী-তটে—তাহার শেষ স্পর্শ-শান্তির লীলা-নিকেতনে পা দুখানি ছড়াইয়া হাতে মাথা ভর দিয়া শুইয়া আছে, আর কে যেন পেছন হইতে আসিয়া ঝুপ করিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। কি সে অনুভূতি! তাহার মাদকতায় তীব্র হলাহল না থাকিয়া যেন দিব্য উন্মাদনা আছে।

বিমান মনে মনে ভাবিল—ময়না ত আমার চির কালের। সেই বাল্যের, সেই কৈশোরের, সেই যৌবনের। তাহার জন্য এতই বা চিন্তা কিসের? কিন্তু কি একটা অপরিমেয়া শক্তি আসিয়া তাহাকে তীব্র দংশন করিয়া বুঝাইল—কুসুমের কোরকের ক্রমিক বিকাশ কি সুন্দর! আজ একটি গোলাপ-কলিকা অঙ্কুরিত হইল; পর-দিন সে বাস্তবিকই প্রণয়-ভরে ফাটিয়া পড়িল; এই রূপে ক্রমে ফুলের পরিণতি হইল। কিন্তু এক বার সে প্রাণ ভরিয়া ফুটিলে বিকাশের চরমোৎকর্ষ দেখাইতে পারে। ময়নাকে সেই শিশু-কাল হইতে সে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আসিতেছে—প্রাণ ভরিয়া আদর করিতেছে, কিন্তু

আজ তাহার সে-দর্শনের সার্থকতা কোথায়? আর ত তাহাকে সে দেখিয়া আকণ্ঠ পিপাসা মিটাইতে পারিবে না। সে-দৃষ্টিতে এখন উঁচু পাহাড়ের বাধা লাগিবে।

হঠাৎ বিমানের শরীরে কে যেন তীব্র জোরে ধাক্কা মারিল; তাহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইল। সে নিজেকে সংযত করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল—ভোর হইয়া গিয়াছে। ঘরের পূর্ব দিকের বেড়ার ফাঁক দিয়া সূর্যোদয়ের রক্তিম রেখা সরু লাল সূতার দাগের মত একখানি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সে মুখ ময়নার। ময়না ডাকিল—বিমান-দা!

বিমান পাশ ফিরিয়া ময়নার দিকে তাকাইয়া বলিল—

ময়না, এত ভোরে তুই এসেছিস?

ময়না উত্তর করিল—

বিমান-দা! তোমাদের বাড়ীর কেউ ত ঘুম থেকে ওঠে নাই, কিন্তু আমাদের বাড়ীর সকলে উঠেছে। বিমান-দা! আমি জেঠাইমার ঘরে উঁকি মেরে দেখলুম—জেঠাইমা যেন রাত দুপুরের ঘুম ঘুমুচ্ছেন। ও বাবা! কি ঘুম গো! জেঠাইমা খুব ঘুমুচ্ছেন দেখে আমি তাঁকে ডাকলুম না। বিমান-দা! ওঠ, তোমার কি ভোর-বেলা বেড়াবার সময় হয় নি?

বিমান ঘাড়টা উঁচু করিয়া সুমুখের জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—

দূর পাগলি! এখনও যে রাত আছে! এত সকালে উঠব কি রে?

সাধিকা বলিল—হাঁ! এই তোমার সকাল? তবে তোমায় আবার লেপ ঢাকা দিয়ে দিই। এই বলিয়া সাধিকা বিমানের বিছানার পায়ের তলার ধব-ধবে সাদা খদ্দরের চাদরটা বিমানের গায়ের উপর তুলিয়া আপাদমস্তক আবৃত করিয়া দিল। বিমান কৌতূহলবশতঃ কিছুই বলিল না, বা সাধিকার

কোন কাজে বাধা দিল না। সে কৃত্রিম নাক ডাকিয়া ঘুমের ভান করিল। সাধিকা তখন বিমানের মাথার উপরের কাপড়টা তুলিয়া নিজের মাথাটা উহার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল—বাঃ রে ঘুম! বিমান তবুও তেমন শব্দ করিতে লাগিল।

সাধিকা নিরুপায় হইয়া তাহার দুই হাত দিয়া বিমানের মাথাটি জড়াইয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে তাহার দুই হাতের চারিটি আঙুল দিয়া বিমানের চোখ দুইটি খুলিতে চেষ্টা করিল। তাহার মুখখানা ঝুঁকিয়া বিমানের মাথার উপর রহিল।

বিমানের কৃত্রিম ঘুমের নাসিকা-ধ্বনি তখন মিলাইয়া গিয়া মাত্র দুইটি তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ছুটিয়া গেল। উহা সাধিকার কোমল মুখখানি পোড়াইয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ বিমানের গায়ে চাদরখানি এক টানে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল—বিমান-দা! আমি আসলে তুমি ভালবাস না। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত কর্তে চাই না। বিমান-দা! আমি যাই।

সাধিকার এই ব্যাকুল-করা অভিমানে বিমানের হৃদয়ের ভিতরে যেন তীব্র আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে কোনও কথা না বলিয়া কেবল সাধিকার ন কৃষ্ণ বর্ণ কুন্তল যাহা ছড়াইয়া তাহার মুখের উপর, চোখের পাশে ও মানের বালিশের গায়ে পড়িয়াছিল, তাহা এক এক গাছি করিয়া হাতে রাইতে লাগিল। সাধিকাও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সাধিকা বলিল—বিমান-দা! কথা হবে না?

বিমান উত্তর করিল—ময়না! কাকা ফিরে এসেছেন—না?

ময়না বলিল—বিমান-দা! আমি কি ঐ কথা বলতে বলেছি?

বিমান নির্লিপ্তভাবে বলিল—বল না ময়না!

ময়না জেদ করিল—না, আমি বলব না। বিমান-দা! তুমি কি ক্রমেই ভূত হচ্ছ? মা তোমায় এত ডাক ডাকছেন, আমি এত সাধা-সাধি কচ্ছি, তুমি কিছুতেই যেন শুনছ না। তোমার মন-মরা ভাব যেন কিছুতেই যাচ্ছে না। বিমান-দা! বল, তুমি কেন এমন কচ্ছ? বিমান-দা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, কেন তুমি আমায় এ দু দিন পড়াতে যাও নি? বিমান-দা! আমার ত বেশ মনে পড়ে, এ দু বছরের ভিতর তুমি যত দিন বাড়ীতে ছিলে, আমাদের বাড়ী গিয়ে আমায় প্রত্যহই কত কি না শিখিয়েছ, কত আদর-আহ্লাদই না আমায় করেছ। বিমান-দা, মা-বাবা তাতে তোমায় কত প্রশংসা করেন। বিমান-দা! আমি তোমার না জানি কি করেছি, তাইতে তুমি আমার উপর রাগ করে আমাদের বাড়ীতে যাও না, মার সঙ্গেও দেখা কর না। বিমান-দা! আমার সত্যি মোটেই ভাল লাগে না। তুমি বল, আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, তবে আমি ক্ষমা চাইছি।

সাধিকা এই বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিমান তখন বিছানায় বসিয়া তক্তপোষের দক্ষিণ দিকের টেবিলের দেরাজ হইতে একখানা কাগজে মোড়া দুইটি চুলের 'ক্লিপ' বাহির করিয়া ময়নার হাতে দিয়া বলিল—ময়না! এই দুটো দিয়ে আজ চুল বাঁধবি, দেখবি, তোকে কেমন সুন্দর দেখাবে। ওতে যে-সব চুনো রেশমী ফিরোজা সাদা পাথর বসান আছে, তাতে রোদের আলোতে কেমন রং খেলবে।

ময়নার অশ্রু যেন আরও দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার সে-কান্না বিমান অবিশ্রান্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে প্রবোধ দিবার বিশেষ ইচ্ছা বা শক্তি তাহার থাকিল না। ময়না যখন অবিরল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন সে ময়নার

হাত দুইখানি মুখ হইতে টানিয়া লইতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু বিমান ত তাহা কিছুতেই সরাইতে পারিল না। অবশেষে বিমান ময়নাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া মৃদু স্বরে বলিল—ময়না ! লক্ষীটি আমার ! কেঁদ না।

ময়না শেষে বিমানের হাত হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া বিমানের বালিশেই মুখ মিলাইয়া নীরবে চোখের জলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল।

বিমান ময়নার হাতে পূর্বে যে দুইটি 'ক্লিপ' দিয়াছিল এবং ময়না যাহা আস্তে মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা তুলিয়া নিজেই তাহার চুলের খোঁপার ভিতর গুঁজিয়া দিতে চেষ্টা করিল।

ময়না নিক্ষিপ্ত তীরের মত তাহার বাম হাতখানি ছুটাইয়া অর্ধ-বিদ্ধ 'ক্লিপ'টি টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল।

বিমান ব্যথিতের মত বলিতে লাগিল—ময়না ! কর্ছ কি ? কর্ছ কি ? চুল যে ছিঁড়ে গেল।

কাহার কথা কে শোনে। ময়না যে-কাজ করিতেছিল, তাহাই করিতে লাগিল। চুল ছিঁড়িয়া 'ক্লিপ'টি মচকাইয়া উহা পূর্ব দিকের জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল।

বিমান ইহাতে কিছুই বলিল না। শুধু ভাবিল—ময়না যেন সুখী হয়।

সাধিকা আর বিমানের শয্যা-পার্শ্বে অগ্রসর হইল না। তাড়াতাড়ি য-দরজা দিয়া আসিয়াছিল, সেই দরজার দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া মুখ ভার করিয়া ভাবিল—সে যে-জন্য আজ প্রত্যূষে আসিয়াছে, তাহা ত শেষ করা হইল না। তাই সে একটু বিলম্ব করিয়া ঘরে পুনরায় প্রবেশ করিল এবং কিছুই না বলিয়া ঘরের খুঁটি ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমান বলিল—ময়না! কি জন্য এসেছিলি, তা ত বললি না?

ময়না কিঞ্চিৎ বিলম্বে বলিল—আমায় বলতে দিলে কোথায়?

বিমান বলিল—কি? বল।

ময়না বলিল—বলব আমার মাথা। আজ যদি না যাও, তবে মজা দেখবে!

বিমান বুঝিল—কাকীমা আবার ময়নাকে তাহার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বলিল—কে মজা দেখাবে ময়না?

ময়না জবাব দিল—আমি দেখাতে পারি না?

বিমান বলিল—কি মজা দেখাবে?

ময়না সেইভাবে দাঁড়াইয়া বলিল—আর আসব না, কথা কইব না।

বিমান ময়নাকে একটু খোঁচা মারিতে বলিয়া উঠিল—বেশ ত, জামাই-বাবুকে কথা কইতে দিবি ত? সাধিকা তড়িৎগতিতে সে-স্থান হইতে অদৃশ্য হইল।"

সাধিকা চলিয়া গেলে বিমান দেখিল—প্রাতঃ-সূর্য্যালোক সমস্ত বাড়ী-খানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার আর সে-দিন ভোরে বেড়াইতে বাহির হওয়া হইল না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া চোখ মুখ ধুইয়া কিছু জল-যোগ করিল এবং মনে ভাবিল, বন্ধু-বান্ধবের কতগুলি জমা চিঠি-পত্রের জবাব দিবে। সে-জন্য সে পুনরায় তাহার ঘরে আসিয়া এক গোছা চিঠির কাগজ, খাম বাহির করিয়া লিখিতে বসিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল—বীরভূমে তাহার যে সহ-পাঠী বন্ধুটি আছে, তাহার চিঠির উত্তর এত দিন না লিখিয়া সে বড়ই অন্যায় করিয়াছে। রমেন অনেকগুলি সংবাদ জানিবার জন্য চিঠিখানা লিখিয়াছিল। একটি সংবাদ, সে কেমন পরীক্ষা দিয়াছে, 'ফাষ্ট ডিভিসনে' কত উপরে নাম থাকিবে। অন্য সংবাদ, তাহার

"ধ্যানের ছবি" কেমন আছে, কেমন পড়া-শুনা করিতেছে, গান্-বাজনা তাহার কাছে কত দূর শিখিয়াছে, আর—'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—গানখানি কেমন গায়, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বিমানচন্দ্র প্রথমেই রমেনের চিঠিখানার জবাব লিখিতে বসিল—

কালিয়া (যশোহর)
২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৭।

ভাই রমেন,

তোমার চিঠিখানার জবাব আমার বহু পূর্বে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি কারণে যে এত দিন জবাব দিই নাই, তাহা তোমার বুঝিতে মোটেই বিলম্ব হইবে না, যদি তুমি ঐই চিঠিখানা পড়া শেষ করা পর্যন্ত তোমার ক্রোধের বাঁধ মানাইতে পার। পরীক্ষা মন্দ দিই নাই। তোমার আশানুরূপ ফল বোধ হয় হইবে। আমার "ধ্যানের ছবি" বোধ হয় ধ্যানেই আঁকিয়া রাখিতে হইবে। তোমার বাড়ীর 'ফোটো'গুলি কি তুমি কাহাকেও হাতড়াইতে দাও? কাঁচের ভিতর পুরিয়া কেমন পছন্দসই সোণালি রং ফলান্ 'ফ্রেমে' বাঁধাইয়া রাখ, তারপর তাহাতেও তোমার শাসনের বাঁধনের আশঙ্কা মিটে না, পাছে কেউ উহা ছুঁইয়া ময়লা করে, কি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাই তুমি উঁচুতে শক্ত পেরেক মারিয়া উহা ঝুলাইয়া দেওয়ালের সঙ্গে রাখিয়া দাও। তোমার এত আদরের আশা পূর্ণ হয় শুধু দেখিয়া, নয়নে নয়ন মিলাইয়া, ইহাকে সকলের দৃষ্টির বাঞ্ছা-কল্প-তরু করিয়া। যদি কেউ ঐ ছবি দেখিয়া প্রশংসা করে, তবে তোমার বুকখানা গর্বে ফুলিয়া উঠে। এবং তুমি তাই চাও, সকলে উহার প্রশংসাই করুক—দর্শনের উপভোগ দিয়া, স্পর্শের নহে। ভাই! আমারও তাই। চির কাল "ধ্যানের ছবি" হৃদয়ে পুষিব। পার্থিব

ভোগে তাহাকে কলঙ্কিত করিব না। যদি দিন এ-রূপই থাকে, তবে তুমি তাহা দেখিয়া প্রমাণ লইতে পারিবে। তোমার প্রিয় সঙ্গীতখানি তাহাকে ভাল করিয়াই অভ্যস্ত করাইয়াছি। পড়া-শুনাও সে বেশ করিতেছে। ভাই! ভোগের নেশাটা মধুর, কিন্তু তাহার নিকাশটা আরও মধুর। তোমাদের কুশল সর্বদা কাম্য। কলিকাতায় দেখা হইবে। ইতি—

তোমারই বিমান।

পুঃ। আজ কাল আমাদের গ্রামের কতকগুলি উন্নতিকর কার্যে ব্যস্ত আছি।

বিমানচন্দ্র রমেনের চিঠিখানা শেষ করিয়া খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া মনে করিল—চিঠিখানা এখনই ডাকে ফেলিতে পারিলে আজিকার ডাকেই যাইতে পারে। তাই সে আর অন্য চিঠি তখন না লিখিয়া, এই চিঠিখানা রওনা করিয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া দ্রুত 'সার্টটি' গায়ে পরিয়া পোষ্টাফিসের দিকে বাহির হইয়া পড়িল এবং মনে ভাবিল—বাটী আসিবার পথে সে কাকীমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে। ঘড়িতে বাজিয়া উঠিল—বেলা তখন নয়টা।

—চার—

বিমান তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। যে-দৌর্বল্য তাহার মনে অবিরল ক্লেশ জন্মাইতেছিল, আজ সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, সেই দৌর্বল্য সে ত্যাগ করিবেই। সে মনে মনে বলিল—মানুষ কি-রূপ স্বার্থান্ধ। নিজের গণ্ডা ষোল আনা না পাইলে সে কি-রূপ বিবেচনা-হীন হইয়া পড়ে। তাহার আর তখন জ্ঞানই থাকে না। এই যে কাকীমা,—যিনি তাহাকে নিজের ছেলে হইতে একটুও অন্য রূপ দেখিতে জানেন না, তাহাকে সে কতই না র্ম-পীড়া দিয়াছে। বিমান বলিতে তিনি অজ্ঞান। দুপুর রাতেও যদি তনি একটা ভাল খাবার লইয়া খাইতে বসেন, তখনই তিনি কি-রূপে বিমানকে া দিয়া মুখে তুলিবেন, তাহা ভাবিয়া অস্থির। অমনই যে-কোনও অবস্থায় তনি তাহাকে সংবাদ দেন, যাহাতে বিমান আসে। যদি তিনি বোঝেন—িমান হয় ত এখন আসিতে আপত্তি করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি মূল্যকে মিথ্যা শিখাইয়া দেন—অমূল্য! বিমানকে বলবি—তার কাকীমার ড় পেট বেদনা কর্ছে; সে যেন আসতে ক্ষণকাল বিলম্ব না রে। বস্তুতঃই এ-কথা বিমান অবিশ্বাস করিতে পারিত না। কারণ াহার কাকীমার বহু কাল যাবৎ কেমন এক রূপ পেট-বেদনার রোগ ছিল। ত ডাক্তারী, কবিরাজী, টোটকা চিকিৎসা এ-যাবৎ করা হইয়াছে, সে দনা কিছুতেই সারে নাই। বিমানও এ-জন্য কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার বিরাজের নিকট হইতে বহু ঔষধ নিজেই মূল্য দিয়া কিনিয়া ডাকে পাঠাইয়া য়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে পেট-বেদনা কমে নাই। যাক।

সেই এত স্নেহের বিমানচন্দ্র আজ অদূর ভবিষ্যতের এই স্বার্থের হানি মনে গণিয়া সেই কাকীমার সঙ্গে দেখা করে নাই, তাঁহার অন্তঃস্থলে আঘাত করিয়াছে।

বিমান তাই চিন্তা করিল—কোন্ অনুতাপের আগুনে নিজেকে দগ্ধ করাইলে কাকীমার নিকট সে নিজেকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে।

বিমান মনে মনে নিজেকে পুনরায় যাচাই করিতে চেষ্টা করিল।

সে ভাবিতে লাগিল—এই মা-ডাক, এই কাকীমা-ডাক, এই দিদি-ডাক, এই নানা ধর্ম-সম্পর্কের ডাক ত পল্লীগ্রামে বা সহরে সর্বত্রই শোনা যায়। এই পাতান সম্বন্ধের কি দাম আছে? অনেকেই পাতায়, অনেকেই ত দেখি একটা ঘটা-পেটা করিয়া দিন কতক খুবই আদর-আপ্যায়ন লুটিয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, মাও আবার নিজের দুই পাঁচটা ছেলে মেয়ে, তাও আবার বেশ শেয়ানা—ছেলের বয়স ষোল সতর, মেয়ের বয়স তের চৌদ্দ থাকিতে—কোন ঘরের পরের ছেলেকে ছেলে ডাকিয়া সম্পর্কের আন্ত-শ্রাদ্ধ, অর্থের দান-সাগর করিয়া থাকেন। সেই পাতান ছেলেই হইয়া পড়ে আসল ছেলে, আর নিজের পেটের ছেলে মধুর মহিমার আবর্তনে হইয়া পড়ে নকল ছেলে।

বিমানচন্দ্র মনে মনে ইহা ভাবিয়া হাসিয়া কুল পায় না। যে ব্যক্তি জলে ডুবিতে চলিয়াছে, সে একটা তৃণ হাতে পাইলেই মনে করে—এই বুঝি মস্ত বড় কাঠের গোড়া পাইলাম, এই বুঝি বাঁচিলাম।

বিমান তাই স্ব-পক্ষে একটি নজির পাইয়া এই মহাদোদুল্যমান মনের অবস্থায় নিজেকে মনে মনে সান্ত্বনা দিল—তবে বুঝি তাহার কাকীমা-ডাক পাতান কোনও দোষের হয় নাই। কিন্তু সে ভাবিতে কষ্ট বোধ করিতেছিল—

বাধ্য হইয়া সে কেন সাধু সাজিয়াছে। কেন সে তীর-ধনু হাতে লইবার জন্যই গায়ে ভস্ম মাখিয়াছে। হায় রে মূর্খ! তোর যে দুই দিক দিয়া কূল নাই। এই সাধিকার বাল্যের মধুর কমনীয়তা—সে যে সামান্য এই দুই বৎসর হইতে নহে, সেই সুদূর সাত আট বৎসর পূর্ব হইতে—তাহার চোখের কোণে ঘুমের আবেশের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। ছাত্র-জীবনে যখন সে গ্রাম্য স্কুলে পড়িত, তখন সে দৈনিক স্কুলে যাইবার সময় এই সাধিকার ভবিষ্যৎ-কালের দিব্য-শ্রীর উন্মেষ মনে মনে গণিত। সাধিকা বড় হইলে দেখিতে কেমনই হইবে। তাহার ঢল ঢল কান্তি বিমানের হৃদয়-মন্দিরে কেমন আলোর বাতি জ্বালিয়া দিবে। তাই সে সাধিকার সঙ্গে, শুধু সাধিকার দর্শন আকাঙ্খায়—মহলা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই আজ তাহার কাকীমা, আজ তাহার ময়না।

বিমান নিজের মনে সমস্তই গণিয়া দেখিল—চালাকি করিয়া কোন কাজ হয় না। এই ধর্ম-সম্পর্ক পাতানর মধ্যে তাহার যদি কোন-রূপ লাভের আকাঙ্ক্ষা না থাকিত, অথবা ধর্ম-সম্পর্ক মোটেই না পাতাইত, তবে হয় ত তাহার ভাগ্যে সাধিকাকে পাওয়া বিশেষ কঠিন হইত না। কারণ তাহারাও সদ্বংশজ ব্রাহ্মণ, কুলীন। তাহার পিতা জ্ঞানাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, সম্মানিত। বিমান নিজেও শিক্ষিত, বিবাহ-যোগ্য। বিমান তাহা একে একে সমস্তই ভাবিল এবং কিছুতেই নিজেকে নির্দোষ বলিয়া ধরিতে পারিল না।

সে মনে মনে বলিল—হায়! যদি ভগবানকে ডাকিতাম! যত দিন হইতে সাধিকাকে আমার চোখে লাগিয়াছে, তত দিন হইতে যদি ভাবিতাম—সাধিকা, তুমি আমার হবে—তবে হয় ত এই ধর্ম-সম্পর্ক পাতাইয়া নিজেকে কলুষিত করিতাম না। এই সম্বন্ধের কি মূল্য আছে?

যত দিন চোখের নেশা! সে ঘোর কাটিয়া যাউক, যাহা তাই। যে তাহার সম্ভার লইয়া আসিয়াছিল, কিংবা যাহার কাছে আমার বরণ-ডালা ধরিয়াছিলাম, সমস্তই আমায় ফিরাইয়া লইতে হইবে, অথবা ফিরাইয়া দিতে হইবে। বরং এই জাঁক-জমকের সময়টার মধ্যে কত অখ্যাতি, কত ক্লেদ, কত গ্লানি বিষের হাওয়ার মত ছড়াইয়া পড়ে। সেই কাণ্ড না ছাপিয়া কিছুতেই পারে না। চির অশান্তি লোকে আপনা-আপনি দিতে থাকে।

বিমান স্থির করিল—যখন মৃগয়ার ভেক লইয়াছি, তখন ছলা ছাড়িব না। মৃগয়ায় লোভ নাই। যখন কোনও পাখী কাছে আসিয়া উড়িয়া পড়িবে, তখন আর তাহাকে শিকার করিব না। পালিয়া পুষিয়া বড় করিব। সেই বড় হইবে, পোষার আনন্দ নিজেই উপভোগ করিব। জানি, সংসার বিপদ-সঙ্কুল, কিন্তু এই বিপদেই সম্পদ আসে কি না দেখিব।

পোষ্টাফিস হইতে বিমান অনেক সময় কাকীমাদের বাড়ী গিয়াছে। কিন্তু এত কাল ভয়ে কাকীমার সঙ্গে দেখা করিতে সাহস পায় নাই, তাই সেও বাটীর মণ্ডপের মধ্যে তক্তপোষের শতরঞ্চির উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়া আস্তে আস্তে সময় গণিতেছে। ইতিমধ্যে শম্ভুনাথ সেখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি বিমানকে দেখিয়াই বলিলেন—বাবা! যাও দেরী কর না, একটু মাথায় তেল দিয়ে ঝুপ করে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এস। বাবা! আর ত বিলম্ব নাই। তিন দিনের দিন বিয়ে, আমি একা কি করি? যাও বাবা! বেশ হয়েছে। প্রজাপতির নির্বন্ধ, এ আর কেউ ঠেকাতে পার্বে না। নইলে কথা নাই, বার্তা নাই—আনন্দ আমায় যে-দিন সন্ধান বললে, যে যাত্রাপুরে একটি

ছেলে আছে, তা ছাড়া এ-মুলুকে আর ছেলে নাই। বাবা! আমি কি কর্ব? আমার ত সেই ভাবনা। কোথায় পাব চুলি? কোথায় পাব একটু সাদা 'দেব্য'? কে বা দেখে আসে? কে বা করে? যাক। নারায়ণ আছেন।

বিমান কাকাকে দেখিবা মাত্র উঠিয়া বসিয়া সবই শুনিল। সে বলিল—

কাকা! আপনার কোনও ভাবনা কর্ত্তে হবে না। আমি আছি না? আমায় শুধু আপনি বলবেন—কি কর্ত্তে হবে—কি আনতে হবে। তা হলেই সব হয়ে রইবে জানবেন। আপনার কিছু চিন্তা নেই।

শম্ভুনাথ বলিলেন—

তা যাক। বাবা! দেরী করো না, ওঠ, ওঠ। ওরে ময়না! তোর মাকে বল—বিমান দেখি সকাল থেকে এসে এখানে শুয়ে আছে। তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে?

পিতার ডাকে কন্যা ছুটিয়া আসিয়া মণ্ডপে এক বার উঁকি মারিয়া মার কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—

মা! বিমানদা।

মা কোও জবাব দিলেন না, বরং আরও গম্ভীর হইয়া রহিলেন দেখিয়া সে পুনরায় মণ্ডপে আসিয়া দুপ দুপ করিয়া খাটের উপর গিয়া বিমান-দার চোখের 'সেলের' চশমাটি খপ করিয়া খুলিয়া লইয়া বলিল—

ওঠ, আর এখানে বসে অতিথ সাজতে হবে না। দেখো—মা তোমায় কি করে!

শম্ভুনাথ ময়নার ভাব-গতিক দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

বিমান! মমনার এত দৌরাত্ম্যি তুমি ভিন্ন কে সহ্য কর্বে?

বিমান কোনও কথা বলিল না।

ও-দিকে মায়ের চীৎকারে মেয়ে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল—

পাজি মেয়ে! এদিকে আয়।

বিমান ক্ষুণ্ণ হইল।

শম্ভুনাথ বলিলেন—

বিমান! ঘরে যাও, উনি ত রেগেই অস্থির। তুমি গিয়ে একটু শান্ত কর।

শম্ভুনাথ পত্নীর জিহ্বার ধার বড়ই ভয় করিতেন। সংসারে যে-স্বামী উহা উপেক্ষা করে, তাঁহাকে নাকি গোঁয়ার আখ্যা দেওয়া হয়। এ-দেশে পত্নী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অবশ্য যায় না, আদালতে উহা লইয়া মোকর্দ্দমাও এ-যাবৎ বিশেষ হয় নাই, কিন্তু স্বামী পত্নীর স্নেহানুবর্ত্তী হইয়া তাহার অনেক মন যোগাইয়া চলে।

সাধিকার পিতাও এই বৃদ্ধ বয়সে সাধিকার মাতার তেজ, অভিমান কড়ির মূল্যে বিকাইতেন না।

ও-দিকে আবার এত ভক্তি কোথায় দেখিব। স্বামী-গত প্রাণ! স্বামীই এক মাত্র ধ্যান। কালিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই নিঃস্ব গৃহস্থের এই পরম শান্তির অভাব এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহই দেখিয়াছে বলিয়া বলিতে পারিবে না।

সংসারে দরিদ্র গৃহের মত পীড়া-দায়ক স্থান আর কোথায়? সেই আদত জিনিষটি, যাহা মুনি-ঋষিরা অতি জলদ কণ্ঠে 'অনর্থম্' বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিন্ন সংসারীর জীবন বিড়ম্বনা। ধর্ম্ম করিতেও অর্থ চাই, অধর্ম্ম করিতেও অর্থ চাই, সুতরাং এই 'চাইয়েরই' যত জ্বালা।

দরিদ্র-গৃহে শুধু ক্যাটক্যাটানি, শুধু বাক্যের ঝঞ্ঝনা, গঞ্জনা, তুমুল নিনাদ, আর্তনাদ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ইন্দুমতী ক্ষণকালের জন্য শম্ভুনাথকে এই অভাবের তাড়নায় উদ্ব্যস্ত করিতেন না।

তিনি বুঝিতেন এবং সর্বদার জন্য মনে রাখিতেন—সুতা জিনিষটা ত 'রবার' নয়। উহা ত টানিলে বাড়িবে না, বরং ছিঁড়িয়াই যাইবে। তবে উহা টানিয়া আর কি লাভ? সংসারে তাঁহার কপালে যদি সুখ হইত, তবে তিনি সাত-সাতটি ছেলে-মেয়ের মা হইয়া উপযুক্ত বয়সে পুত্রবতী হইয়া পুত্র-হারা হইবেন কেন? সেই প্রথম সন্তান যদি তাহার বাঁচিয়া থাকিত, তবে ত তিনি আজ তাহার রোজগার খাইতে পারিতেন। আজ তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতি বৃদ্ধ স্বামীকে তাড়া-হুড়া করিতে হইবে কেন? স্বামীর এই বৃদ্ধ বয়স! মানুষ কি চায়? সারা জীবনটাই কি সেই রামপ্রসাদের 'কলুর বলদের' মত ঘানি টানিতে হইবে? কেন স্বামী স্ত্রীর জন্য উঞ্ছবৃত্তি করিতে যাইবেন? আজ তাঁহার জীবনের অপরাহ্ণে হরি-নামের মালা হাতে রাখিয়া তিনি অহর্নিশ শেষের সম্বল জোগাড় না করিবেন? ইন্দুমতী তাই স্বামীকে বেদনা দিতেন না।

ময়না মায়ের কণ্ঠ-স্বরে চুপ করিয়া গিয়া হেঁসেলের রান্নার কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু পরমুহূর্তে যাহা দেখিল, তাহাতে সে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়া কাতর হইল। মা সেই রান্না-ঘরের পশ্চিম-উত্তর কোণের জলের 'ফিল্টারের' তেপায়ার একটা পায়া বাঁ হাতে করিয়া ধরিয়া অন্য হাতে নিজের লাল পেড়ে শাড়ীর শেষ প্রান্তে মুখ ঢাকিয়া অবিরল কাঁদিতেছেন। তাঁহার ধব-ধবে কাপড়খানি ফিল্টারের সামনের চিরাবদ্ধ জল-কাদায় লুটো-পুটি খাইতেছে।

মায়ের কান্নার শব্দে ময়নার হাতের হলুদ হাতেই রহিল। সে তৎক্ষণাৎ

নোড়াটা শিলের উপর রাখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া বিমান-দার প্রতি সজল নয়নে ক্যাল-ক্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—

বিমান-দা! শীগগির এস, মা দেখি কেমন কর্চ্ছে; হাউ হাউ করে কাঁদছে।

বিমান ইহা শুনিবা মাত্র এক লাফে মণ্ডপের পোতা ডিঙ্গাইয়া উঠানে পড়িল। শম্ভুনাথ আস্তে আস্তে বলিলেন—

কার্তিক সকলকে প্রণাম করায় কথা বলেছে, তাতে কি হয়েছে? ওঁর যা কাণ্ড। ঐ কথাটাই সেই অবধি ভাবছেন। ওঁর ময়নাকে বুঝি বা জলে ফেলে দেওয়া হল।

বিমান সারা উঠানটা এক রূপ দৌড়াইয়া আসিয়াছিল। ময়না বিমান অপেক্ষাও দ্রুত দৌড়াইয়া রান্না-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মায়ের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বিমান রান্না-ঘরের ছাঁচে পৌঁছিয়া টিপি টিপি চৌ-কাঠের উপর ডান পা রাখিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল—কাকীমা কি-রূপ আছেন এবং কেন কাঁদিতেছেন।

ময়না সজল-নেত্রে কাঠের মত দাঁড়াইয়া। তাহার [illegible]গুলি আলু-থালু, পিঠ বহিয়া পড়িয়াছে। গায়ে একটি মোটা দেশী ছি[illegible]র সেমিজ, কপালের চন্দন তিলকগুলি বেশ শুকাইয়া ফুট-ফুটে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। রক্ত চন্দনের যে কয়েকটি বরফি-ফুল কচি লাল মুখের চিবুকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন ফিট গৌর বর্ণের সঙ্গে মিশিয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে। বিমানের এত ক্ষণ তাহা চোখে পড়ে নাই। সে যখন কাকীমার ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিতে মন দিল, তখন তাহার চোখে ময়নার নব সজ্জা যেন প্রখর হইয়া তীরের মত তাহার বুকে বিদ্ধ হইল।

ময়না মায়ের কান্নায় সেই বাল্য অবধি বড় ব্যাকুল হইত।

অবশ্য এ-সংসারে এ-রূপ আর্তনাদ নূতন নহে। মাঝে মাঝেই উহা হইয়া থাকে। মাতা যখনই কোন দুঃখের বা সুখের কার্যে যোগদান করিতেন, তখনই তাঁহার চক্ষু বাহিয়া জল পড়িত এবং সে-শোকে যদি কেহ ইন্ধন দিত, তবে তাহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিত।

এই সে-দিন পুষ্পের একটি ছেলে হইলে মা হাটু-পাটু করিয়া দেখিতে গেলেন—কেমন ছেলে হইয়াছে। কিন্তু যখনই তিনি কচি শিশুর মুখখানি দেখিলেন, তখনই অমনই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—মনে হইল তাহার মেজ মেয়ে যুঁথিকার কথা। ময়নার মেজ-দি যূঁথিকা সেই আট বৎসর পূর্বে সন্তান-প্রসবে মারা গিয়াছিল। যুঁথিকার একটি সুন্দর ছেলে হইয়াছিল। ছেলেটি জীবিত অবস্থায়ই নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু যুঁথিকা 'এক্লেমপসিয়া'-রোগে মারা যায়। সদ্যোজাত শিশু কি করিয়া মাতৃ-হারা হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? তবু দিদিমার যত্নে তুলার পাঁজ দিয়া দুধ খাইয়া এক মাসের অধিক বাঁচিয়াছিল। কিন্তু যম তাহাকে শেষে কিছুতেই ছাড়িল না। ছেলেটির একটি উরুস্তম্ভ হইয়াছিল। অতটুকু শিশু তাহাতেই শেষ হইল।

বিমান বলিল—ময়না, কাকীমাকে ডাক।

ময়না তাহার সজল আয়ত চক্ষু বিমানের পানে এক প্রাণে পাতিয়া চুপি চুপি বলিল—

বিমান-দা! তুমি ডাক। সে আরও কণ্ঠ-স্বর খাট করিয়া বলিল—বিমান-দা! তোমার কথা মা শুনবে।

ময়না কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, বিমান ত দরজার উপর। সে চোখ ইসারা করিয়া ময়নাকে ডাকিল।

ময়না চুপি চুপি কাছে আসিয়া বিমানের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—

ধ্যানের ছবি

বিমান-দা! মার দুঃখে দুঃখও আসে। জান না সেবার অমর-দার মরণ?

বিমানের মন সে-দিকে ছিল না।

সে দেখিতেছিল—দুঃখের মাঝে পড়িয়া ময়নাকে কেমন দেখায়। সুখের মাঝে সে ত তাহাকে কতই দেখিয়াছে।

সে ভাবিল—কি অপূর্ব সমাবেশ! এক দিকে নব বিবাহের মধুর আঁখি, অন্য দিকে দুঃখিতার সজল নয়ন।

বিমান তখন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাকীমাকে একেবারে সাপটিয়া ধরিয়া বলিল—

কাকীমা! এমন আনন্দের দিনে চোখের জল ফেললে আপনার ময়নার অকল্যাণ হবে। কাকীমা! উঠুন, ঐ দেখুন, পাড়ার মেয়েরা বিছি-ধান ভানতে এসেছে। এখনই এসে তারা ভিড় করবে।

কাকীমা ক্ষণকাল পরে বলিল—যাই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার এক বার কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল—

বিমান! তুই পর হস না। ম য়না যে তোর বোন।

বিমান মাথা নত করিয়া শুধুই ভাবিতে লাগিল—

কাকীমা কি মানবী? তিনি কি এই জন্যই কাঁদিতেছেন। অন্তর্যামী যিনি, তিনি আর শম্ভুনাথ জানেন, ইন্দুমতী কেন এত চোখের জল ফেলিতেছেন।

—পাঁচ—

আজ গোধূলি-লগ্নে যখন বিবাহ, তখন ব্রহ্মাণ্ডনাথ আন্দাজ করিলেন, যাত্রাপুর হইতে একখানা তিন-মাল্লাই নৌকায় নব-গঙ্গার ভিতর দিয়া গুণ টানিয়া দ্রুত গেলে কালিয়ায় পৌঁছিতে তাহাদের পাঁচ ছয় ঘণ্টার অধিক সময় কিছুতেই লাগিবে না। জিনিষ-পত্র ত সমস্তই গোছান আছে। মাঝি বেটাদের ভাল করিয়া পেট ভরিয়া ভাত খাওয়াইয়া লইতে হইবে, যেন তাহারা পথে আবার খাবার হাঙ্গামা বাধাইয়া অযথা বিলম্ব না করে। সঙ্গে তামাক সাজিয়া খাওয়াইবার জন্য ও অন্যান্য ভাণ্ডারী-কাজের জন্য কৈলাস দাসকে লওয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পাকা-কাঁচা মস্ত গোঁফ-জোড়ায় চাড়া দিয়া হাঁক দিলেন—'কার্তিক'!

কার্তিক তুড়ির পায়রার মত দৌড়াইয়া আসিবার সময় ভীত কণ্ঠে বলিল—

এই ত আমি বড়-মামা! আমি কি তেমন বড়-মামা? আমি কি তোমার তেমন বড়-মামা? আজ্ঞে! হাঁ!

ব্রহ্মাণ্ড বেজায় ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—

দূর হারামজাদা! পাজি! বেশী কথা বলিস কেন? শূয়ার! আমি তোকে বেশী বক-বকাতে বারণ করি নি? গাধা! ফের যদি বাজে বকিস, তোর হাড় বেঁটে দেব।

কার্তিকচন্দ্র শঙ্কায় যেন মাটির ভিতর সিঁধিয়া গেল। যে চোখ গরম বাবা! সে মনে মনে বিড়-বিড় করিতে লাগিল—

ধ্যানের ছবি

'গুরু জনকে মান্য করিবে', 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'চুরি করিও না', 'পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে', 'কাহারও মনে ব্যথা দিবে না', 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'। মা বলেছেন—কার্ত্তিক! তোর বড়-মামা গুরু জন; তাঁকে মান্য কর্‌বি। আমি কি অন্যায় কল্লাম? আমি ত বড়-মামাকে মান্য করেই কথা বলি। তিনি আমায় ডাকলে আমি ভক্তি করেই ত ডাক শুনি। তাতে কেন বড়-মামা আমায় বকেন?

কার্ত্তিক মাথা নত করিয়া আস্তে আস্তে বক-বক করিতে লাগিল—

'ফোর্থ ক্লাসে' 'সংস্কৃত সোপানে' পড়েছি—অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বড়-মামা আমায় হিংসা করেন কেন? কেন হিংসা করেন—আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি? বড়-মামা আমায় বকেন কেন? তাতে কি হিংসা করা হয় না? বড়-মামা বোধ হয় 'ফোর্থ কেলাসে' 'সংস্কৃত সোপান' পড়েন নাই। আর তা নইলে বড়-মামা বোধ হয় 'ফোর্থ কেল্যাসেই' পড়েন নাই। আচ্ছা, তাই যদি পড়তেন—নিশ্চয়ই গুরুর দিব্যি—তিনি জানতেন—অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে কার্তিকচন্দ্রের মুখ দিয়া হঠাৎ জোরেই বাহির হইয়া গেল—

বড়-মামা! আপনি 'ফোর্থ কেলাসে' পড়েছেন? আপনি 'সংস্কৃত সোপান' পড়েছেন?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ কার্তিকচন্দ্রের সহসা এই প্রশ্নে তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের কাছে ছিল একটা রূপা-বাঁধান হুঁকা, তিনি সেইটা তুলিয়া সজোরে কার্ত্তিকের পানে ছুঁড়িয়া মারিয়া হাঁক দিলেন—ও চারু! আমি কিছুতেই এই বোকাটাকে সামলাতে পার্লাম না।

হুঁকাটি কার্ত্তিকের গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু উহা নিকটস্থ একটা তামাক-কাটা কাঠে লাগিয়া চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল।

কার্ত্তিকচন্দ্র দ্রুত সেইটা হাতে করিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—

হিংসা—হিংসা—এ নিশ্চয়ই হিংসা—বড়-মামা 'ফোর্থ কেলাসে' পড়েন নাই—গুরুর দিব্যি পড়েন নাই—'সংস্কৃত সোপান' কাকে বলে জানেন না। তাতে পরিষ্কার লেখা আছে—অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। কি উপায় হইবে! কি করিয়া তিনি এই ক্ষেপাটাকে লইয়া গিয়া বিবাহ দিয়া সসম্মানে আবার বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন? ব্রহ্মাণ্ড তখন আর বিশেষ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া চিন্তিত মনে অরুন্ধতীর কাছে গেলেন।

দাওয়ায় চারু বসিয়াছিল। সে বিশেষ মুখ ভার করিয়া বলিল—

বড়-মামা! ও-রকমে চলবে না। আমি ওর ওষুধ জানি, এবং ঐ াকমে ওকে জব্দ রাখি।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিশেষ আশান্বিত হইয়া বলিলেন—

বল চারু, আমায় বুদ্ধি দে, আমায় বাঁচা।

চারু তখন বলিল—

বড়-মামা! কার্ত্তিকের এক মাত্র ওষুধ নদে। বর-যাত্রী আর কাউকে াওয়া হবে না, এক মাত্র নদেকে। তা হলে আপনি যাবেন, নদে যাবে, দাস যাবে, কার্ত্তিক ত আছেই—আর বাকি তিন জন। চারু তৎক্ষণাৎ 'কে ডাকিতে পশ্চিমের ঘরের সুধাংশুকে বলিল—সুধু, লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি দৌড়ে নদেকে গিয়ে বল—নদে-দা, চারু-দি তোমায় এক্ষুণি ডাকছে। ক মিনিট পরে নদের চাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারু তাহার বড়-মামার সুমুখে নদেকে বলিল—

নদের চাঁদ! তোমাকে কিন্তু সব সময় কার্তিকের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। দেখো, যেন একটিও বাজে কথা না বলে, তা হলে ভাইটি! সব ফাঁক, বিয়েই হবে না। দেখ ভাই! কার্তিকের বয়স মাত্র এই ষোল সতর, তবে এক্ষুণি বিয়েটা দেওয়া হচ্ছে এই জন্য, যদি এই সময়ে বিয়েটা না দিয়ে ফেলি, তবে এ-পাগলের আর বিয়েই হবে না। তা যাক ভাই,—তুমি দেখো। ও যে-সব গল্প ভালবাসে—তা ত তুমি জানই, ওকে সব সময় তাই বলবে, যাতে চুপ করে থাকে।

নদের চাঁদ চারু-দিকে বড়ই ভালবাসিত, তাহাকে বেশ মান্য করিত। সে বলিয়া উঠিল—

তা পার্ব, চারু-দি! তুমি দেখবে এখন? এখন থেকে কার্তিকের কথা বন্ধ কর্ব? দেখবে? দেখবে?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ লাফাইয়া উঠিল—

নদের চাঁদ। বাবা! লক্ষ্মী! তা হলে ত তুমি আমায় বাঁচাও। দেখ বাবা! আমি যে কত পূজা মানসিক কর্ছি ওর জন্যে, তা আর কি বলব?

নদের চাঁদ বলিল—

না বড়-মামা! কিছু মানসিক কর্তে হবে না। আপনি দেখে [illegible]বেন? এখনই প্রমাণ চাই?

চারু বলিল—না নদের চাঁদ, এখন থাক।

নদের চাঁদ জবাব দিল—

না চারু-দি। বড়-মামাকে দেখিয়ে দিই। এ যাদু বিদ্যে বড়-মামা! এ যাদু! কি পুরস্কার দেবেন বড়-মামা? বলুন। আমি কার্তিককে এখনই চুপ করে দেব। সে আজ সকাল থেকে কথা বন্ধ কর্বে, আর মুখ খুলবে—আজ রাত দুপুরে, বিয়ে হয়ে যাবার পর।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বুঝিলেন—

এটিও কার্তিকের দোসর। যাক, 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'।

যদের চাঁদ তখন হইতে কার্তিকচন্দ্রের 'বডি-গার্ড' হইল।

এক দিকে চারু বিবাহের আবশ্যকীয় কার্য—যথা, স্নান করান, গাত্র-

। প্রভৃতি, অন্য দিকে—ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিবাহের আভ্যুদয়িকাদি করাইতে

লেন। চারু আসিয়া বড়-মামাকে বলিল—

ড়-মামা! যোগেশ এখনও দর্পণ দিয়ে যায় নাই।

ব্রহ্মাণ্ড বলিলেন—

ারু! ও-বেটাকে সঙ্গে নিতে হয় না?

ঃ-ঘর হইতে অরুন্ধতী বলিয়া উঠিলেন—

াদা! এ শুভ কাজে কাউকে বেজার করো না। যার যা গণ্ডা,

তা দিলে, সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্বে—এই শুভ কাজ নিরাপদে

াক।

্রহ্মাণ্ডনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর ধারের ঘরের পেছনের ছাঁচের তলায় গিয়া

। সেই গগন-ভেদী স্বরে ডাক দিলেন—

। যোগেশ! শীগগির আয়।

যাগেশের বাড়ী কার্তিকদের বাড়ী হইতে অনতিদূরে, উত্তরের

খানি বাড়ীর পরে। সে তাহার ছোট্ট ঘরের দাওয়া হইতে প্রতি-

দিল—

ড়-বাবু! ডাকেন না কি?

হ্মাণ্ড বলিলেন—

র হারামজাদা! ঘরের মধ্যে বসে বলে—ডাকেন নাকি? বেটা

র বেটা নবাব! এ-বার মজা দেখিয়ে দেব—সালতামামীর সময়।

তিন চার দফা নালিশ করে দিলে, বুঝবে বেটা কেমন মনিব। কিছু বলি নি দেখে।

ব্রহ্মাণ্ড রোষ-কষায়িত নেত্রে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া কাজে মন দিবার পূর্বে যোগেশ আসিয়া হাজির হইল।

তাহাকে দেখিবা-মাত্র ব্রহ্মাণ্ড দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিলেন—তোমার রূপ গজিয়েছে? তোমায় দেখব? হাতিয়ার কই? দর্পণ কই? আজ বিয়েয় যাবি।

যোগেশ কম্পিত স্বরে বলিল—

বড়-বাবু! ছোট ছেলেটা মরে মরে।

ব্রহ্মাণ্ড কহিলেন—কেন? কি হয়েছে?

যোগেশ উত্তর দিল—বড়-বাবু! আমরা ভিটে-বাড়ীর প্রজা, মরি, কি বাঁচি, এক বার পায়ের ধূলো ত বাড়ীতে দেবেন না! ছেলেটা আজ তিন মাস ভুগছে। জর, ম্যালেরিয়া, পেটে পিলে-যকৃৎ। বড়-বাবু! মনিব বিমুখ হয়েই প্রজাদের দুর্দশা। এই ত সরকারী ডাক্তার বলছিল—ওকে, সরকারী ওষুধ দিই কি করে? তোদের বড়-বাবুকে বলতে পারিস না—এ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে কি ফল? এ 'ইউনিয়ন-বোর্ড' না থাকলে নয়, যদি তার খরচ না চলে? 'টিউবওয়েল' যে কয়েকটা করেছিলেন, তার তিনটের 'পাম্প' ত নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, জলও ওঠে না, কিচ্ছু না। সরকারী ডাক্তার-খানায় এক শিশিও ওষুধ নাই। 'ফ্রি স্কুল' যেগুলি হয়েছে, তাতে 'মাষ্টার'দের মাহিনা রীতিমত দেওয়া হয় না বলে পড়ান ভাল হয় না। রাস্তা ঘাটেরও ঐ অবস্থা। তবে এক থাকার মধ্যে আছে কতগুলি লোক জমা হয়ে ফি-রবিবারে হল্লা, আর গরীব প্রজাদের শাস্তির ব্যবস্থা।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

আমার ও-সব নাল্শি শোনবার সময় নাই। বিয়ে থেকে এসে শুনব। তা যাক, তুই চল আমাদের সঙ্গে। তোর ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি। যোগেশ! কোনও আপত্তি করিস না। আমরা যখন নদীর ঘাট দিয়ে যাব, তখন আমি হেঁকে নবীন ডাক্তারকে বলে যাব, তোর ছেলে যেন আমাদের আসার আগে না মরে। তবে সে ডাক্তারের ভাত আমি এ-গ্রাম থেকে তুলে দেব। এ তুই ঠিক জানিস, তোদের বড়-বাবুর যে-কথা সে-কাজ।

যোগেশ আর আপত্তি করিতে সাহস করিল না। তবে সে মনে মনে বলিল, যদি ছেলেই মরে, তবে 'বোর্ডের' ডাক্তারের ভাত মরল, আর থাকল, তাতে কি আসে যায়। সে তখন অবনত-মস্তকে বলিয়া গেল—

বাড়ী গিয়ে আসছি—বড়-বাবু! আপনারা তৈয়ার হন।

পশ্চাতে চারু দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—যোগেশ, দর্পণের কথা যেন মনে থাকে।

যোগেশ চলিতে চলিতে বলিল—থাকবে, দিদি-ঠারেন!

যথা-বিহিত সমস্ত কার্য শেষান্তে ব্রহ্মাণ্ডনাথ দুর্গা! দুর্গা! সিদ্ধি-দাতা গণেশ! সিদ্ধি-দাতা গণেশ! বলিতে বলিতে বাড়ী হইতে নৌকার দিকে নদীর ঘাটে চলিলেন। পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় 'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজ-তুরগা' ইত্যাদি বলিতে বলিতে কার্তিকের অনুগমন করিলেন। নন্দের চাঁদ তাহার পেছনে। পুর-নারীগণ মঙ্গল-গীতি গাহিলেন। চারুর মন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

—ছয়—

বিকাল পাঁচটায় দেখা গেল বিমানচন্দ্র তিন জন মুটের মাথায় করিয়া তিনটি বড় মোট লইয়া কাকীমার শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত।

শম্ভুনাথ তখন সম্ভবতঃ ও-পাড়ায় সিদ্ধান্ত-পঞ্চাননের বাড়ীতে একটা ছোট খাট সামাজিক বৈঠকে যোগ-দান করিতে গিয়াছেন; কি যেন একটা গোল-যোগ বাধিয়াছে। বিমানচন্দ্র উঠানে পা দিতেই সাধিকা তাহাকে বলিয়াছে—বিমান-দা! এই ব্যাপার।

বিমানচন্দ্র সাধিকাকে কিছু না বলিয়াই দ্রুত পদে প্রস্থান করিল, পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে।

এ-দিকে শম্ভুনাথ এক রূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই গিয়াছিলেন—বিমান যখন খুলনায় গিয়াছে, তখন কোন জিনিষই বাদ পড়িয়া থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। আর টাকাও তাহার হাতে নগদ এক শত ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত কল্য প্রাতে বিমানের হাতে যখন তাহার কাকা এক শত টাকা দেন, তখন বিমান তাহার কাকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

কাকা! এ-টাকা আপনি কোথায় পেলেন?

কাকা সে-কেলে লোক, তিনি ফিস ফিস করিয়া বারংবার বিমান[illegible] নিষেধ করিয়া—বাবা! তোমার কাকীমা যেন জানতে না পারেন—বলিয়াছিলেন—বাবা! শ্রীমন্ত চাটুয্যে আমাদের 'বাখারির' তিন বিঘে জমি বন্ধক রেখে এই এক শত টাকা কর্জ্জ দিয়েছে। বাবা! আমি চেয়েছিলাম দেড় শত, তা শ্রীমন্ত চাটুয্যে বল্লে—

জেঠা-মশাই, পুরিয়ে মন না। আমাকে ঐ তিন বিঘে জমি ছেড়েই দিন। কবলাখানা এই বিয়ের পরই না হয় 'রেজেষ্টি' করে দেবেন, আপনার বিয়ের যখন তাড়াতাড়ি। ও টাকায় কুলোবে? শেষ বয়সে মেয়েটাকে ভাল করে পাত্রস্থ করা দেখে যান।

বাবা! শ্রীমন্ত বেশ সৎ লোক। আমার কাছ থেকে খত এখনও লিখে নেয় নাই। খত পরে দিলেও চলবে। আর শ্রীমন্ত বলেছে যদি এই জমি তিন বিঘে বিক্রী না করি, তবে এক শ টাকায় টাকা প্রতি চার পয়সা সুদ দিতে হবে। তার কম সুদে সে কিছুতেই টাকা দিতে চাইল না। আমি বাবা! কি করি, তাই স্বীকার করে টাকা নিলাম। তা শ্রীমন্ত বল্লে—জেঠা-মশায়! আপনার কথা খতের চেয়ে বেশী। বাবা! যে গতিক দেখছি, চার পয়সা সুদে টাকা যখন নিয়েছি, তখন আমার 'বাখারির' ভুঁই আর থাকবে না। আচ্ছা বাবা! তবে ঐ জমি দিয়ে দুশ টাকা নিলে হয় না? দেখি বিয়েটা যাক, ভেবে দেখব। বাবা! তোমার কাকীমাকে ঋণী রেখে মরতে চাই না, তাতে যদি ভিক্ষে করে খেতে হয়, সেও ভাল। অদৃষ্টে থাকে, সে তাই কর্বে। ময়নাটার ত বিয়ে হল। তার জন্যে ত আর ভাবতে হবে না।

খুলনা যাওয়ার পূর্বে এই টাকাটা হাতে লইবার সময় শম্ভুনাথের কথাগুলি শুনিয়া বিমানের মন যে কি-রূপ হইয়াছিল, তাহা 'এক্স্-রে'-আবিষ্কারক, যিনি মানুষের দেহ-যন্ত্রের কোথায় কি আছে না আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার যন্ত্র বাহির করিয়াছেন, তিনিও নিশ্চয় তাহা বুঝিবার শক্তি রাখিতেন না।

কিন্তু এই সংবাদে একটা উপায় যাহা হইল, তাহা অতি চমৎকার।

বিমান ময়নাকে ছাড়িয়া এক দিনের সেই সঙ্গীন সময়ের প্রবাসে—

অস্ত্রোপচার দক্ষ ডাক্তার যখন নিজের অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে নিজের হাতে অস্ত্রোপচার করিয়া সন্তান প্রসব করান, সেই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে, সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধি-ক্ষণে যে-রূপ সময় কাটায়—সে-রূপ সময় কাটাইবার বেশ খাপ্ত পাইল। সে শুধুই ভাবিতেছিল এবং কালিয়া হইতে খুলনার 'ষ্টিমারে' একটা উলঙ্গ সিঁড়ির তক্তায় বসিয়া মনে মনে স্থির করিতেছিল—উপায় কি হইবে? বিমান মনে মনে বলিল—আমি না হয় মার নিকট হইতে চুপ করিয়া তিন শত টাকা লইয়া আসিয়াছি এবং আমার নিজের কাছেও না হয় দুই শত টাকা আছে, এই মোট পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া ময়নার সমস্ত জিনিষ ও বিবাহের জিনিষ-পত্র কিনিয়া লইয়া গেলাম, এ-জন্য নহে আমার আরও দুই তিন শত টাকা বাজারে ধার থাকিল, কিন্তু কাকা যে শ্রীমন্ত চাটুয্যের কবলে পড়িতে বসিয়াছেন, ইহা যে মোটেই শুভ নহে। শ্রীমন্ত চাটুয্যের মত 'সায়লক' এ-অঞ্চলে নাই। তাহার খপ্পর কিছুতেই ছাড়ান যায় না। সে এঁটেলি পোকা, আর কাকা সজ্জন, সরল, নিষ্ঠাবান। সেই পাজি সুদ-খোর বেটা কাকার 'বাথারির' জমিটুকুর উপর ব্যাঘ্রের শিকারের মত লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে প্রকাণ্ড চুম্বক-লৌহ, আর কাকা সামান্য একটি চাবি-কাঠি।

বিমান স্থির করিয়াছিল, কাকার ঐ এক শত টাকা সে ত নিজে খরচ করিবেই না, কাকাকেও উহা ধরিয়া দিবে না, কারণ তাঁহার এই খরচের হাত, টাকা পাইলেই উড়িয়া যাইবে। এই বিবাহাদির হাঙ্গামা মিটিয়া যাইবার পাঁচ সাত দিন পরে বিমানচন্দ্র কাকাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া শ্রীমন্ত চাটুযোকে এক মাসের সুদ সওয়া ছয় টাকা ও ঐ এক শত টাকা, মোট এক শত ছয় টাকা চারি আনা দিয়া দিবে। শ্রীমন্ত ঐ টাকা

না লইতে চাহিলে তাহাকে সে দেখাইয়া দিবে—বিমান কেমন ছেলে। বিমানচন্দ্র এই রূপ মনে গণিয়া ভাবিল—'বাখারির' জমি কাকীমাদের সম্বৎসরের খোরাক যোগায়। কি সর্বনাশ!

বিমান মোট-মাটালি নামাইয়া নিজেই কাকীমাকে লইয়া সমস্ত জিনিষ-পত্র একে একে খুলিতে লাগিল, আর বুঝাইয়া দিতে লাগিল, কোন জিনিষটা কি।

ইত্যবসরে শম্ভুনাথ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত।

ঘরে ঢুকিয়াই তিনি ইন্দুমতীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন—

হ্যাঁগা! বিলেত-ফেরতের গোলমাল মিটিয়েছি! মূর্খ বেটারা! কিছুতেই বুঝতে চায় না—হায়! তোদের কি দুর্দশা। সমাজ! সমাজ! সমাজ এখন মানে কে? আজ-কালকার যে ঢেউ—উল্টাও, ভাঙ, নূতন কর। এই সময়ে কি সেই মনুর শাসন, সেই যাজ্ঞবল্কের বিধি-নিষেধ, পরাশরের বচন কেউ মানতে চায়? আজ-কালকার প্রধান কথাই হচ্ছে—ছুঁৎ-মার্গ পরিহার।

শম্ভুনাথ এই বলিয়া ইন্দুমতীর কাছে প্রাধান্য লইলেন যে এ-গ্রামে এ-সব গূঢ় তথ্য বুঝিবার লোক তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই।

পত্নীও পতির গর্বে গর্ব অনুভব করিয়া বলিলেন—

এ-সব কথা বিমান যত বোঝে, এমন ছেলে আজ-কাল আর কেউ নাই। বিমান কাকীমার মুখে আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া মাথা নত করিল।

ইন্দুমতী তখন শম্ভুনাথকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—

দেখ বিমান কি করেছে!

শম্ভুনাথ কহিলেন—কি?

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি কত টাকা বিমানকে দিয়েছিলে ?

শম্ভুনাথ বলিলেন—

সেই, ঐ সেই এক শ টাকা।

তুমি বল কি ? এ যে হাজার টাকার ও বেশী টাকার জিনিষ। ময়নার গহনাই যে পাঁচ শ টাকার কম নয়।

শম্ভুনাথ এত ক্ষণ ঘরের ভিতরের একখানা চৌকির উপর বসিয়াছিলেন সহসা অবাক হইয়া নীচে বিমান ও ইন্দুমতীর মাঝখানে জিনিষ-পত্রগুলি মধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং এক একটি জিনিষ তুলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি দেখিলেন—ময়নার প্রসাধনের—তেল, সাবান, আলতা, সেন্ট, ক্রীম, পাউডার, পাফ, আয়না, চিরুণী, সোপ-কেস, নাম-লেখা সিন্দুরের কৌটা, তারপর—তোরঙ্গ, সুট-কেশ, ক্যাস-বাক্স, ফিতে, চুলের ফিতে, বেনারসী কাপড়, এক রঙ্গা ব্লাউজ, শেষে গহনা—ঝুড়ো চুড়ি, মাফ-চেন, ইত্যাদি সমস্ত, অবশেষে বিয়ের নিমন্ত্রণের জিনিষাদি সবই আনা হইয়াছে।

শম্ভুনাথ এই সমস্ত দেখিয়া কপালে হাত দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমূল্য আসিয়া সংবাদ দিল—

জেঠাইমা ! বরের নৌকা এসেছে ও-দের বাড়ীর কেষ্টা বল্লে, শীগগির উঠুন।

বিমান তখন এক লাফে উঠিয়া ডুলি-বেহারা বাদ্যকরদের প্রস্তুত হইতে বলিল। ডুলি-বেহারা বাদ্যকরের শব্দ পাইলেই হাঁক দিয়া রওনা হইবে।

শম্ভুনাথ আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া মণ্ডপে বজ্র-দগ্ধের ন্যায় নির্বাক নিশ্চল ভাবে বসিলেন—

কাজ-কর্মাদি যন্ত্রের মত চলিতে লাগিল।

ইন্দুমতী এই অবসরে এক বার চোখের জল মুছিয়া লইয়া সিপ্রাকে নিজের কাছে ডাকিয়া বলিল,—সিপ্রা! পুষ্প কোথায়? নলিনী এসেছে?

সিপ্রা উত্তর করিল—

হাঁ, তারা সবই লক্ষ্মী-ঘরে।

ইন্দুমতী বলিলেন—

ময়নার ভার তোমাদের উপর। ওকে যা কর্তে হয়, কর।

ইন্দুমতী এই বলিয়া প্রসাধনের জিনিষ-পত্র, অলঙ্কারাদি সিপ্রাকে বুঝাইয়া দিয়া নিজে অন্য সমস্ত জিনিষ দ্রুত হস্তে গোছাইয়া ফেলিলেন।

বিবাহের আর অধিক সময় বাকী নাই।

বিমান মনের মতন করিয়াই বিবাহের আসরটি সাজাইয়া ছিল। পল্লীগ্রামের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। এ সহরের মধ্যবিত্ত লোকের গলি-ঘুঁজির মধ্যের ধার-করা দাওয়া নহে।

বহির্বাটিতে বর ও বর-যাত্রীদের আবাস-স্থল নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা সেইখানে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। সে স্থানেরও যথাযোগ্য সাজ-সরঞ্জামাদি দেওয়া হইয়াছিল।

যথাবিহিত বাজনা বাজাইয়া চতুর্দোলায় করিয়া বর আনা হইলে পাড়ার মেয়েরা উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সেই-মাত্র দৃষ্টির স্থল বরকে এক চোখ দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দ লাভ করিয়াছিল। সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিল—ময়নার বর বেশ টুকটুকেই হইয়াছে। বাস্তবিক বিবাহের সাজে কার্তিককে অতি চমৎকারই দেখাইতেছিল।

বরের চেহারার প্রশংসা-বাদ প্রথম আসিয়া ইন্দুমতীকে জানাইল পুষ্প—

'কাকীমা! চমৎকার বর!'

কাকীমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুষ্প কাকীমার নিকট

বিশেষ উৎসাহ না পাইয়া অতি আহ্লাদের সহিত নলিনী ও সিপ্রাকে ডাকিয়া বলিল—

দেখ নলিনী! দেখ সিপ্রা! শালাকে আজ ত নাকের জলে চোখের জলে কর্ব। আজ ভাই! বাসরে আমরা তিন জনেই বরের সঙ্গে এক বিছানায় থাকব। ময়নাকে আমলই দেব না। সিপ্রা! তুই ছোট আছিস, তোকে কিছুতেই চিনতে পার্বে না, ঠিক ময়না ভাববে। আর শালা যেই ময়নার সঙ্গে আলাপ কর্তে যাবে, তখন আমরা ক জনেই হো হো করে হেসে উঠব, তা হলেই বেশ মজা হবে।

শুভ লগ্নে বরকে বিবাহের আসরে আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে নদের চাঁদ ছায়ার মত অনুসরণ করিল। পার্শ্বে ব্রহ্মাণ্ডনাথ।

পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় লম্বা লম্বা শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে ... পক্ষীয় পুরোহিত ঠাকুরের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন।

অদূরে বিবাহ-স্থলের দুই পার্শ্বে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, নিমন্ত্রিত-আমন্ত্রিত বিবাহের সভায় বসিয়া কলরব করিতেছেন। সকলেই যে-যাহার আলোচনা মত্ত।

শম্ভুনাথ নিজে কন্যার সম্প্রদান করিবেন না, ঐ কার্যটির ভার ময়নার দূর সম্পর্কীয় কাকার উপর। শম্ভুনাথ তাই এই কার্য হইতে রেহাই পা... উঠানের এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং মাঝে মাঝে ... ঢুকিয়া ইন্দুমতীর সাশ্রু নয়নকে সান্ত্বনা দিতেছেন, আর বলিতেছেন— কার্তিকের চেহারা বেশ সুন্দর।

বিমানচন্দ্র গলদঘর্মে পারিবারিক অন্যান্য কার্যে মনোনিবেশ করিতেছে। কেবল মাঝে মাঝে বিবাহের সভা-স্থলে আসিয়া কাহার পান, কাহার তামাক, কাহার চুরুট লাগিবে জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিছু কাল পরে বিমান একটি

গোলাপ-দানিতে কেওড়া-গোলাপের জল আনিয়া সভাস্থ সকলকে সিক্ত করিয়া দিয়া গেল এবং নিযুক্ত চাকরকে বলিল—দেখিস, 'পাঞ্চ লাইটের' 'পাম্প' কমে না যায়।

এই সময়ে কয়েক জন বলিলেন—তাঁহাদের চা চাই।

বিমান দ্রুত গিয়া 'ষ্টোভে' যে জল গরম হইতেছিল, তাহা হইতে আট দশ কাপ চা তৈয়ারী করিয়া একখানি চা-দানিতে করিয়া চা সরবরাহ করিল। সকলে পরম সন্তুষ্ট হইল।

এ-দিকে ব্রহ্মাণ্ডনাথের মন ক্রমেই কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নদের চাঁদ তাহাতে মাঝে মাঝে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল—

বড়-মামা? কি করি?

বড়-মামার ভয় ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল।

কার্তিকচন্দ্রের অবস্থা যে কি-রূপ ভীষণ হইতেছে, তাহা এক মাত্র নদের চাঁদ ও ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভিন্ন আর কেহই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। ব্রহ্মাণ্ডনাথ এক মনে মা দুর্গা মা দুর্গা করিতে লাগিল। কিন্তু কার মা দুর্গা কে শুনে?

কার্তিকচন্দ্র এ-যাবৎ মোটেই কথা-বার্তা কহিতে না পারিয়া ক্রমেই যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। সে বড়ই উস খুস করিতেছে। একটি বানরকে শৃঙ্খলিত করিলে সে যেমন পলক মাত্র বিরাম না করিয়া কেবলই বাঁধা খোঁটের চারি ধারে এ-দিক ও-দিক করিতে থাকে—এক বার এ-ধারে যায়, এক বার ও-ধারে যায়, এক বার সেই বন্ধন-শৃঙ্খল যত দূর বিস্তৃত হয়, তত দূর পর্যন্ত সেই খোঁটের কাঠটায় লাফাইয়া ওঠে, আবার ঝপ করিয়া তথা হইতে লাফাইয়া পড়ে, এবং এক বার মুখে এক হাত পুরিয়া দেয়, আবার মুখে আর এক হাত পুরিয়া দেয়, কখনও বা শিকল কামড়াইয়া ধরে,

আবার তাহা ছাড়ে—কার্তিকচন্দ্র সেই রূপ এক বার আসন-জোড়া হইয়া বসিতেছে, আর এক বার পা দুখানি ভাঙ্গিয়া তপঃ-সিদ্ধের মত উপবেশন করিতেছে। এক বার সে পা দুখানি হঠাৎ গালিচার উপর ছড়াইয়া দিল, আবার এক হাতে ভর করিয়া লম্বা হইয়া শুইয়াই পড়িল।

নন্দের চাঁদ ঠিক অনুমান করিল—কার্তিক এত কাল মৌন থাকায় তাহার গায়ে যেন রাম-বিছুটি পাতা লাগিয়াছে। সে যেই কার্তিককে সোজা হইয়া বসিতে বলে, অমনই সে লাফাইয়া ধড়াস করিয়া উঠিয়া পড়ে।

ব্রহ্মাণ্ড ত এ-যাবৎ দুর্গা কালী করিতেছেন। তাঁহার ভয় হইতেছে, পাছে কার্তিক চীৎকার করিয়া লাফাইয়া না ওঠে।

কার্তিকচন্দ্রের এ-বারে গায়ের বেশভূষা, চমৎকার সাজ-গোছ খুলিবার পালা পড়িল। সে সিল্কের চাদরটা গলা হইতে এক টানে দূরে ফেলিয়া দিল। পুনরায় তাহা কুড়াইয়া লইয়া, উহার পাটী ভাঙ্গিয়া আবার নিজেই কোঁচাইতে লাগিল। এই বার সে আরম্ভ করিল—উঁচু হইয়া বসিয়া মটকার পাঞ্জাবীটার বোতাম খুলিতে। কিন্তু দুর্ভোগ্যের বিষয়, বোতাম-গুলি তাড়াতাড়ি খুলিতে যাওয়ায় কয়েকটি বোতামের ঘাট ছিঁড়িয়া গেল এবং দুইটি বোতাম টানের জোরে ভাঙ্গিয়া গেল। এ-বার কার্তিক বড়-মাথার ভয়ে সেই সোণার বোতামের সেটের গোলাকার মাথার গুঠুনি দুইটি অতি নিবিষ্ট মনে খুঁজিতে লাগিল। প্রথমে সে গালিচাটা সপ করিয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল, শেষে নিজের হাতের সম্পূর্ণটা গালিচার নীচের সতরঞ্চির মধ্যে চালাইয়া দিল, যেন সে পল্লীগ্রামের ডোবায় নামিয়া মাছ ধরিতেছে।

নন্দের চাঁদের বিরক্তির আর সীমা নাই। সে শুধু দাঁত কিড়-মিড়

করিতেছে এবং ভাবিতেছে—ঔষধের মাত্রা অধিক দিয়া সে মোটেই ভাল করে নাই।

সে ভাবিল—যদি কার্তিককে অন্ততঃ দুই চারিটি কথা বলিবার জন্যও সে বলিয়া দিত! তাহার ওষুধ মাত্র এই ছিল—

যদি কার্তিক চুপ করিয়া, একটি মাত্র কথা না বলিয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত থাকিতে পারে, তবে সে পুনরায় বাড়ী আসিয়া তাহাকে ৩০শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিন খড় চুরি করিতে এবং দোল পূজায় 'চাঁচর, বুড়ো-বুড়ী' উৎসবের মস্ত বড় হিজল গাছ কাটিতে লইয়া যাইবে। তারপর তাহারা দু জনে টোনার চড়ে 'চাঁচর-বুড়োবুড়ী' পোড়াইবে। তাহাতে শামুকের ভিতর শুঁয়া পোকার বিষ্ঠা ভরিয়া, নারিকেলের ছোবড়া পুরিয়া বাজি পোড়ান ও ঝিঙ্গের বা তিতপোল্লার ভিতর আগুন দিয়া বাজি তৈয়ার করা—আরও অনেক কিছু থাকিবে। কার্তিকচন্দ্র তাহার এই অতি সাধের বস্তুটির লোভে নদের চাঁদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছে—সে প্রাণ গেলেও কথা বলিবে না, যত ক্ষণ পর্যন্ত না রাত্রি নয়টা বাজিবে। তাই সে রাত্রি নয়টার অপেক্ষা করিতেছে।

কার্তিকচন্দ্র সেখানে গিয়া আর যে-একটি কাণ্ড করিতেছিল, তাহা উপভোগ্য বটে। হিন্দুর বিদ্যা-দেবী মাতা সরস্বতী স্বয়ংও যদি দেবী-হস্তে দৈবী পটে লিখিতে বসেন, তবে তাহার বর্ণনা করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে বুঝাইতে পারিবেন না, বা তাহাদের ধারণা করাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন না—সে কি চমৎকার দৃশ্য।

এ-সংসারে মানুষ কাঁদে কেন? কাঁদে নিশ্চয়ই—শোকে, নিরানন্দে। অন্যের নিকট সে-কান্নার সার্থকতা কি? ক্রন্দনের কোন মূল্য বা আবশ্যকতা বা গুরুত্ব থাকিত না, যদি সেই ক্রন্দনে শ্রোতা বা দ্রষ্টা সম-বেদনা প্রকাশ না

করিত। আমি যদি কাহারও অশ্রুতে বুক আর্দ্র না করি, তাহা হইলে অন্যেরও বুক আমার গ্লানিতে ভাজিয়া যাইবে না। আমার প্রাণটা তাই শোকার্তের শোকে, দুঃখার্তের দুঃখে, নিরানন্দের নিরানন্দে, স্বতঃই দুলিয়া উঠে। মানুষের হাসির বেলাও তাই। অবশ্য জোর করিয়া কেউ হাসিতে পারে না। যে-ব্যক্তি হাসিতে ঐ রূপ চেষ্টা করে, তাহার হাসি নিশ্চয়ই কপট হাসি। অন্যকে হাসিতে দেখিলে আমি যদি হাসিয়া গড়াইয়া না পড়ি, তবে আমি যে তাহার আন্তরিক হাসি উপলব্ধি করিতেছি, ইহা সে বুঝিবে না। তাই কার্তিকচন্দ্রের সেই অদ্ভুত হাসি—যাহা তাহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি, উহা কখনই কপট নহে, জোর করিয়া ঐ হাসি রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে উহা হো-হো শব্দে দিগন্ত বিদীর্ণ করিত—মুখ টিপিয়া, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, ললাট কর্ষিত করিয়া, সমস্ত শরীর হাত ও পায়ের দুইটি অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া—যে-হাসির কসরৎ সে করিতেছিল, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ আর হাসি সম্বরণ করিতে কিছুতেই পারিতেছেন না। তিনি শুধুই বলিতেছেন—

কাজ আরম্ভ হউক, লগ্ন অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, 'শুভস্য শীঘ্রং' এবং উহা বলিয়া মনকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লইতেছেন।

যথাসময়ে কন্যা সম্প্রদান হইয়া গেল।

কার্তিকচন্দ্র বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করা কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত মনে করিল না, কারণ তাহার নিতান্ত ভয়—নদের চাঁদ যদি কোন মতে জানিতে পারে, যে সে রাত্রি নয়টার পূর্বে কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তবে নদের চাঁদ কিছুতেই তাহাকে 'চাচর-বুড়োবুড়ী' পোড়াইতে টোনার চড়ে লইয়া যাইবে না।

নদের চাঁদ ও ব্রহ্মাণ্ডনাথ বুঝিলেন, কার্তিক মনে মনেই বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিয়াছে।

বিবাহের স্ত্রী-আচারের সময় কার্তিকচন্দ্রকে যখন বাসর-ঘরে প্রথম লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার এক অপূর্ব পরিবর্তন দেখা গেল।

সে কিছুতেই বিছান কাপড়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবে না এবং সঙ্গে যে তাহার পরিণীতা ছিল, তাহার সহিত একত্র চলিবে না।

সে শুধু দুলিয়া দুলিয়া উঠে কিন্তু কথা বলে না, কারণ নদের চাঁদ তাহার সঙ্গে যাইতেছিল, আর রাত্রি তখন কেবল আটটা। ভগবান যেন সে-দিন রাত্রির ঘন্টাগুলি কিছুতেই বাজিতে দিতেছেন না।

ঘরে ঢুকিয়া কার্তিকচন্দ্র যে-মহাফাঁপরে পড়িল, তাহা অবর্ণনীয়। অন্য অবস্থা হইলে সে নিশ্চয়ই চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিয়া লইত, কিন্তু তাহার পথের কণ্টক নদের চাঁদ সঙ্গে।

কার্তিক দেখিল—তাহার এক পার্শ্বে মাথায় স্বল্প ঘোমটা টানিয়া অলঙ্কার ও সজ্জার অপূর্ব সমাবেশে ভুবন-ভুলানরূপে রহিয়াছে সাথিকা, অন্য পার্শ্বে মধুর মুরতি সিপ্রা, বেশ-বিন্যাসে অতি রূপসী। এ-দিকে পুষ্প তাহার সৌন্দর্যে ফুলের ন্যায় বিকসিত হইয়া আছে, তাহার গন্ধে গৃহ ভর-পুর, অন্য দিকে নলিনী বাস্তবিকই পদ্মের মত শান্ত, কোমল, মনোরম। ইহা ছাড়া অনেক সুন্দরী কিশোরী, তরুণী, প্রৌঢ়া ঘরের মধ্যে শুধুই কলরব করিতেছে, আর হাসি ঠাট্টা তামাসায় দিগন্ত ছাপাইয়া তুলিতেছে।

কার্তিক মনে মনে ভাবিল, কাহাকে সে দেখিবে? যে-দিকে সে তাকায়, তাহাকেই তাহার নয়ন ভরিয়া পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সে শুধু একটু চীৎকার করিয়া সাধ মিটাইতে পারিল না, ইহাই তাহার পরম ক্ষোভ। হায়! সে কি-রূপে কথা বলিবে! নদের চাঁদ যে অদূরে।

কার্তিকচন্দ্র এখন শুধু রাগে দাঁত কিড়-মিড় করিতেছে, আর মনে মনে ভাবিতেছে—কোথায় সেই রাত নটা! কি করি! কি করি!

অগত্যা কার্তিকচন্দ্র ম্লান-মুখে চুপ করিয়াই রহিল। কত যে কান-মলা, নাক-মলা তাহার সেই হস্ত-পদ-বদ্ধ দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেল, আর তাহা যে-সে-হাতের অত্যাচার নহে—সিপ্রার, পুষ্পের, নলিনীর ইত্যাদির। সে মনে করিতে লাগিল, এই নাক-কানের জন্ম সার্থক! হায়—নদে!

অনতিকাল পরে কার্তিকচন্দ্র সহসা দেখিতে পাইল—উত্তর দিগন্ত বিস্তার করিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গৃহ-মধ্যস্থ নারী-গণের চোখে তাহা পড়ে নাই, এমন কি তাহার শ্বাশুড়ী ইন্দুমতীরও নহে।

ইন্দুমতীর মন হইতে সেই গাঢ়-নিবদ্ধ মেঘখানি, যাহা স্বামীর মুখ হইতে সেই সংবাদ পাওয়া অবধি, গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল, তাহা যেন অনেকখানি অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। জামাতার আগমনের আনন্দে দুঃখ ভুলিয়া গিয়া তিনি কিছু শান্ত হইয়াছিলেন।

কার্তিকচন্দ্র দুই তিন বার ঐ ভীষণ অগ্নি-জিহ্বার প্রতি [illegible] পানে চাহিয়া হঠাৎ অসামান্য চীৎকারে গৃহ কম্পিত করিয়া তুলিল—

"নদে! ঐ যে চাঁচর-বুড়ো-বুড়ী!"

কার্তিকচন্দ্রের হঠাৎ এ-রূপ আচরণে সকলেই যে অতীব স্তব্ধ হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় অনায়াসে ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

কার্তিকচন্দ্র নদের চাঁদের প্রতি ও তাহার রাত নয়টার প্রতি কোনও ভ্রূ-ক্ষেপ না করিয়া এক লম্ফ দিয়া সাধিকার বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া সেই অগ্নির দিকে ছুটিয়া গেল, এবং সাংঘাতিক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"বুড়ো-বুড়ী বুড়ো-বুড়ী।
বুড়ো-বুড়ী স্বর্গে গেল হরি বল হরি॥"

কার্তিকের অদ্ভুত ব্যাপারে সকলেই চাহিয়া দেখিল—বাটীতে ভীষণ

আগুন লাগিয়াছে। উত্তরের ঘরে, যেখানে বিবাহের নিমন্ত্রণের লুচি ভাজা হইতেছে, সেই ঘরেই আগুন লাগিয়াছে।

বাড়ীর সকলেই তখন—আগুন—আগুন বলিয়া এক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

বিমানও চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"সবাই এস।"

সে তখন লুচির ঘরেই ছিল এবং বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িল—সে এ কি করিল!

কার্তিকচন্দ্র তখন বুঝিল, এ ত 'চাঁচর-বুড়ো-বুড়ী' নহে, এ যে প্রকৃতই আগুন লাগিয়াছে। তখন সে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—

"ঢাকনা দিয়ে আগুন ঢেকে ফেল। ঢাকনা-চাকা দাও। 'ফিল্ড কেলাসে' হরিপদ মাষ্টার যা শিখিয়েছে, তাই কর।

ইহা বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া উঠান হইতে বিবাহ-সভার একটি শতরঞ্চি এক টানে তুলিয়া লইয়া নিজেকে তাহা দিয়া জড়াইয়া সেই দাউ-দাউ করা আগুনের মধ্যে আগুন নিবাইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

—সাত—

এক দিন দুই দিন নয়, দীর্ঘ চারি বৎসর অতীত হইবার পর এক দিন মানের মনে হইল—এ জীবন কি দুর্বিবহ !

সবে মাত্র তিন মাস ছাত্র জীবন শেষ করিয়া এই এক সপ্তাহ হইল সে কলিকাতার একটি কলেজে অধ্যাপকের কাজ পাইয়াছে। বিমানচন্দ্রের পাঠ্য-জীবন সফল হইয়াছে। বাল্য-কাল হইতে সে পড়া-শুনায় খুবই ভাল ছিল। সে যতটা না পরিশ্রমী ছিল, মেধাবী ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার এক অদ্ভুত প্রকৃতি ছিল। দিনের বেলায় সে মোটেই পড়িত না, প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজব করিয়া কাটাইত। রাত্রি নটার পর আহারাদি শেষ করিয়া সে নিজের কক্ষে শুইয়া পড়িত। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টার পূর্ব পর্যন্ত সে নিয়মিত-ভাবে ঘরের বাহিরে বেড়াইত। যখন বিমান দেশের বাড়ীতে থাকিত, তখন সে, হয় বিস্তীর্ণ ফুটবল-মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিয়া, অথবা নদীর ধারে একাকী বসিয়া এই সময়টা ক্ষেপণ করিত। আর যখন বিদেশে থাকিত, তখন সে এই সময়ে রাস্তায় বা উদ্যানে বেড়াইতে ভালবাসিত। কিন্তু রাত নটার পর তাহাকে বিছানায় ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যাইত না; কারণ সে প্রতিদিন নিয়মিত রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া পড়া-শুনা করিত। বিমানচন্দ্র এই গভীর রজনীতে নিস্তব্ধতার আশ্রয়ে নিবিষ্ট মনে এক ক্রমে পাঁচ ছয় ঘণ্টায় পড়া-শুনা সমস্ত সারিয়া লইত।

এম.এ. পাশ করিয়া তাহাকে যে বেশী দিন বেকার বসিয়া থাকিতে হয় নাই, এ-জন্য সে অসন্তুষ্ট হইল। কেন সে এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া পড়া-শুনা

করিয়া কিছু দিনের জন্য সমস্ত কাজ হইতে রেহাই পাইল না। সংসারে এই রূপই হয়। যে চায় না, সে পায়, যে পায়, সে চায় না। চাকরী-গত-প্রাণ বাঙ্গালী অনেককে সে দেখিয়াছে এবং কাহাকে অনেক দুঃখ করিতে শুনিয়াছে—জীবনে চাকরি জুটাইতেই পারিল না। প্রথমে দীর্ঘ সাত আট বৎসর যাবৎ অবিরত আ-প্রাণ চেষ্টা করিয়াও চাকরীর সন্ধান পাইল না। যদি বা শেষে সন্ধান পাইল, বড় রকমের সুপারিশ যোগাড় এবং তদ্বির করিয়াও সেই সামান্য কাজ হাত করিতে পারিল না, অথচ সে বিশেষ গুণবান, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে বাঙ্গলা দেশে তিন চার লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে এবং তাহারা চাকরি চাকরি করিয়া অফিসের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বেড়াইয়া বলিতেছে—শুধু চাই একটি চাকরি, তা যে মাহিনায়ই হউক, অথবা বিনা মাহিনায় শিক্ষা-নবিশীই হউক।

বিমানচন্দ্র পরীক্ষা-পাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি অধ্যাপকত্ব পাইয়া ভাবিতে লাগিল—কত 'ইউনিভার্সিটি'র 'ফার্ষ্ট-ক্লাস-ফার্ষ্ট' চার পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও কোন চাকরি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া এক মাত্র ছেলে-পড়ান সম্বল করিয়া অনশনে বা অর্ধাশনে বিরাট কলিকাতা নগরীর উপর দিয়া চলিয়াছে, আর নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, হয় ত বা পরিবারের সকলের চোখে শেল বিঁধাইতেছে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যার্জনের নামে গালি পাড়িতেছে। সে মনে মনে বলিল—তাহাদের চাকরি না হইয়া আমার হয় কেন?

বিমান আষাঢ়ের একখানি জল ভরা কাল মেঘ সামনে রাখিয়া একটা 'পোর্টেবল ইজিচেয়ারে' নধর তনুখানি এলাইয়া শুইয়া আছে। তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ হইবে। সে দক্ষিণের দেওয়ালের মস্ত বড় জানালা দিয়া সুদূর ভাগীরথীর দিগন্তে তাকাইয়া রহিয়াছে। ইতিমধ্যে মনলা আসিয়া বলিল—

বিমান-দা! কই, আজ ত তোমার বাঁশিটি ধরলে না?

বিমান কোনও কথা কহিল না।

এই বাসাটি বিমানদের কলিকাতার। এখানে তাহার বড় ভাই বিধান সপরিবারে থাকেন। তিনি এই দুই বৎসর সিমলা হইতে বদলি হইয়া আসিয়া কাশীপুর 'গান এণ্ড সেল ফ্যাক্টরি'তে চাকরি করিতেছেন। গত তিন মাস যাবৎ তিনি স্ত্রী পুত্র ও কন্যা লইয়া পশ্চিমে বায়ু পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। তাই এখন বিমানচন্দ্র এই কলিকাতার বাসায় ঠাকুর চাকর ঝি রাখিয়া বাস করিতেছে।

বিমানের দাদা পশ্চিম হইতে বিমানকে এক মাস পূর্বে লিখিয়াছিল, যে সে পুনরায় বদলি হইবার চেষ্টা করিতেছে কারণ কলিকাতায় তাঁহার স্বাস্থ্য টেঁকে না। চির কাল শীত-প্রধান দেশে থাকার অভ্যাস, কলিকাতার গরম তাহার অসহ্য বোধ হয়, সুতরাং গঙ্গার ধারের বাসাটি অবিলম্বে ছাড়িয়া দিয়া বিমান ভাল একটা মেসে গিয়া থাকিবে। কিন্তু বিমানচন্দ্র এই চাকরিটি পাইয়া স্থির করিল—

এই বাসা সে ত্যাগ করিবে না; কারণ 'মেসে' বা 'হোটেলে' থাকিলে তাহার পড়া-শুনার ক্ষতি হইবে ও দর্শন-শাস্ত্রের চর্চা হইবে না। এই ভাগীরথীর স্রোতোধারার সঙ্গে চিন্তা-ধারা ভাসাইলে তাহার দার্শনিক গবেষণার উৎকর্ষ সাধন হইবে।

বিমানচন্দ্র এই বাসাটি বড়ই পছন্দ করিত, কারণ বাসার তে-তলায় একটি মনোরম কক্ষ ছিল। সেখানে সে বরাবরই পড়া-শুনা করিত। কক্ষটির দক্ষিণ দিকেই দো-তলার বড় ছাদ এবং উহা দক্ষিণ-মুখী। দরজাটি দক্ষিণ দিকে এবং ঐ দরজার দুই পাশে দুইটি বিস্তৃত জানালা। কামরাটি বিশেষ বড় নহে, আবার নেহাৎ পায়রার খোপরও নহে।

উহার পশ্চিম দিকে তে-তলায় উঠিবার সিঁড়ি এবং পূর্ব দিকে মস্ত বড় এক জানালা। কামরার মধ্যে চার পাঁচটা তাকে বিমানের রং-বেরংয়ের বাঁধান মোটা, পাতলা বই ঠাসা ছিল। ঘরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে একখানি মেসের সাড়ে ছয় টাকা দামের তক্তপোষ, ও তাহারই পূর্ব-পশ্চিমে জামা-কাপড় রাখিবার আলনা। জুতাগুলি সেই তক্তপোষের নীচে আলাদা একখানা তক্তার উপর থাকিত। ঐ তক্তপোষেরই ঠিক পশ্চিমে একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া অদূর-বাহিনী মাতা জাহ্নবীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিমানচন্দ্র একটি বাঁশের বাঁশী বাজাইত। তাহার কোনও সময় নির্দিষ্ট ছিল না। এই সমস্ত কার্যে বিশেষ বাধা জন্মিবে বলিয়া বিমানচন্দ্র দাদার আদেশ সত্ত্বেও কিছুতেই এই বাসাটি ছাড়িল না।

ময়না আসিয়া বিমানের পার্শ্বে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল।

ময়না পুনরায় বিমানকে বাঁশী বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিলে বিমান জিজ্ঞাসা করিল—

ময়না! কাকা কি এখনও ঘুমুচ্ছেন?

ময়না জবাব দিল—

এই ত আমি তাঁর হাতে, পায়ে হাত বুলিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম।

সে-বার সূর্য-গ্রহণ উপলক্ষে বিমান তাহার কাকাকে এক বার গঙ্গা-স্নান করাইবার জন্য কলিকাতায় আনিয়াছিল। কাকা কিছুতেই আসিবেন না, বিমান তাঁহাকে কিছুতেই না আনিয়া ছাড়িবে না।

বিমান তাহার কাকাকে বার বার বলিতে লাগিল—

তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে না। তিনি গিয়া তাহাদের গঙ্গার উপরের বাসায় থাকিয়াই গ্রহণের স্নান অতি সহজেই করিতে পারিবেন।

বিমানের কাকীমা যখন কলিকাতায় আসিতে কোনও মতে মত করিতে ছিলেন না, তখন বিমান তাহার কাকীমাকে এই বলিয়া মত করাইল, যে ময়না ত এত কাল যাত্রাপুরে যায় না, কারণ তাঁহারা কেহই ময়নাকে কার্তিকের হাতে একলা ছাড়িয়া দিতে সাহস পান না, সুতরাং কলিকাতায় গিয়া এই বাসায়ই সে কার্তিককে আনিয়া রাখিবে এবং তাঁহারা সকলেই কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় থাকিবেন। বিমান কাকীমাকে আরও বুঝাইল—প্রজাপতির নির্বন্ধে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইবার নহে, এবং জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে কাহারও হাত নাই।

কাকীমা ভাবিয়া দেখিলেন—এ-যুক্তিটা মন্দ নহে। স্বামী যে-আঘাতটা মনে পাইয়াছেন, তাহাতে যদি বিদেশে গিয়া, বিশেষতঃ কলিকাতার মত স্থানে গিয়া তিনি কিছু দিন থাকেন, আর কার্তিকের দেখা পান, তবে হয় ত তাহার মনে কতকটা শান্তি আসিতে পারে। তিনি ইহা ঠিকই জানেন—স্বামীর এই মনের ক্ষত কিছুতেই দূর হইবে না—যত চেষ্টাই না করা হউক। তথাপি তিনি ভাবিলেন—এই সাংঘাতিক চিন্তা যদি বিন্দু-মাত্রও কমে, তবে স্বামী অন্ততঃ কিছু দিন বাঁচিতে পারেন, নতুবা অবিলম্বেই তাঁহার হৃদ-রোগ ভীষণ-ভাবে বাড়িয়া উঠিবে। ইন্দুমতী তাই শম্ভুনাথকে এক রূপ জোর করিয়াই কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

গ্রহণের স্নান হইয়া গিয়াছে। শম্ভুনাথ অতি কষ্টে স্পর্শ-স্নান ও মুক্তি-স্নান করিলেন এবং একান্ত মনে মাতা ভাগীরথীর নিকট প্রার্থনা করিলেন আর কেন মা? এ-পাপীর সমস্ত পাপ তুমি ধুইয়া নাও। আর যেন মা! তোমার কোলে এ-কলুষ লেপন করিতে না আসি।

হইলও তাহাই। শম্ভুনাথ তদবধি এমন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, যে আর তিনি শয্যা হইতে উঠিতেই পারিলেন না। বিমানচন্দ্র তাঁহার

চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত করিল, কিন্তু রোগ যেন কিছুতেই কমিতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিতেছে।

ইন্দুমতী স্বামীর জীবনের বড়ই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—এ-অবস্থায় তাহার স্বামীকে লইয়া ট্রেণে, ষ্টীমারে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই কঠিন। কিন্তু তিনি নিজে বড়ই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন, আর তিনি এখানে কিছুতেই থাকিতে চান না। তিনি আশা করিয়া আছেন কার্তিককে আনিয়া শয্যা-গত স্বামীকে এক বার দেখাইবেন। ময়নার স্বামী। তাঁহার শেষ প্রদীপ ময়না—তাহার সলিতা। সে সলিতার আলো যতটুকুই মিট মিট করুক, তবু সেই বাতি সমস্ত হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবে। তাই ইন্দুমতী বিমানকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল—কার্তিককে অবিলম্বে আনিয়া তাহার কাকাকে যেন সে দেখায়। তিনি বিমানকে আরও বলিলেন—কার্তিক নিশ্চয়ই ময়নার চিঠি পাইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়াছে, হয় ত সে বাসা না চিনিতে পারিয়া এখানে আসিতে পারে নাই। বিমান ইহাতে বিশেষ উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করিল এবং 'কি জানি' বলিয়া স্থির করিল—পুনরায় সে নিজে একখানা চিঠি লিখিবে।

আজ সকাল হইতে শম্ভুনাথ ভালই আছেন। আজ তিনি ভোর হইতে বেশ কথা বলিতেছেন, আর ইন্দুমতীকে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে বেদানা, আঙ্গুর চাহিয়া খাইতেছেন। সাধিকারও মনটা বেশ ভাল। সে পিতার অপেক্ষাকৃত সুস্থতার জন্য নিজেই কত কি কাজ—সাজান, গোছান প্রভৃতি করিয়াছে। এক কাড়ি নানা রঙ্গের উল, এক বাক্স নানা-বর্ণের সূতা, কার্পেটের ছুঁচ, কুরুসি-কাঁটা প্রভৃতি লইয়া পিতার সামনে সে এত ক্ষণ কাটাইয়াছে,

এবং যখনই দেখিয়াছে পিতা নিদ্রিত-প্রায়, তখনই সে গুন-গুন করিয়া গান গাহিয়াছে।

পিতা ঘুমের ঘোরে সহসা বলিয়া উঠিলেন—

ময়না, তোর সেই পুতুলটা কোথায়?

ময়না তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া, তাহার কলিকাতা আসার পর প্রথম পিতৃ-দত্ত উপহার, মস্ত বড় আলুর পুতুলটি আনিয়া পিতার সামনে ধরিল—

বাবা—এই যে।

পিতা বলিলেন—

নিয়ে যা, খুব যত্ন করিস। বেশ লাল টুক-টুকে ছেলে হবে। বুদ্ধি হবে ত?

সাধিকা পিতার পুতুল দেখার আগ্রহ কিছুই বুঝিতে পারিল না, বরং সে বিশেষ চিন্তিতা হইল এবং কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়িল।

পিতা তাহাতে যেন কাঁপিয়া উঠিলেন এবং কিছু জোরের সহিতই বলিলেন—

না, না, বুদ্ধি হবে। তোর মার যে কথা। কেন আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে? অমন বুকের পাটা কার? হোক না শ্বশুর-বাড়ী। হোক না বিয়ের বর। কে এমন দাউ-দাউ-করা আগুনে সমস্ত লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় ত্যাগ করে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিতে পারে? থাকুক না তার কিছু সংসারী বুদ্ধি কম। তার মত প্রাণ ক জনের? কি আগুন! কি ঝা!

পিতা পুনরায় চোখ বুজিলেন।

সাধিকা নির্জন প্রকোষ্ঠে পিতার এ-রূপ অসম্বন্ধ আলাপে কিছুতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া এবং মাতাকেও না ডাকিয়া গম্ভীর মনে গুটি

গুটি করিয়া বিমানের প্রকোষ্ঠে গিয়াছিল এবং ঐ বিষয়ই ভাবিতে ভাবিতে বিমান-দার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, কিন্তু সে পিতার ঐ-রূপ তন্দ্রাচ্ছন্ন আলাপকে তাঁহার গভীর চিন্তা ও মন-ক্লেশের পরিচায়ক ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবিতে পারিতেছিল না।

বিমান বলিল—

ময়না! তুই ও-রমক দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কাকা যদি আজ ভাল থাকেন, তবে সন্ধ্যে হোক, আবার বাঁশী বাজাব, তখন শুনবি।

কিছু কাল পরে ইন্দুমতী, যিনি প্রত্যহ রাত্রি-জাগরণে ক্রমেই কাতরা হইতেছিলেন এবং স্বামীর কিঞ্চিৎ সুস্থ অবস্থা দেখিয়া পার্শ্ব-স্থিত প্রকোষ্ঠে একটু ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ ঘরের ভিতর গোঁ গোঁ শব্দে ধড়-ফড় করিয়া উঠিয়া এক লম্ফে স্বামীর তক্তপোষের নিকট আসিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা।

ইন্দুমতী স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া, ঐ শব্দ স্বামীর মুখ হইতে বাহির হইতেছে বুঝিয়া এবং ময়নাকে কাছে না দেখিয়া অতি দ্রুত তে-তলায় বিমানের ঘরে আসিলেন, কিন্তু কোনও কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না।

মায়ের এ-রূপ আকস্মিক মনোভাব দেখিয়া কন্যা ছল-ছল চোখে বলিল—

মা! কি হয়েছে? বিমান তখন ময়নার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, সেও তৎক্ষণাৎ এক লাফে উঠিয়া কোন কথা না বলিয়া অতি দ্রুত দোতলায় কাকার ঘরে গেল। মা ও মেয়ে তাহার পশ্চাৎ অনুগমন করিল। বিমান গিয়া দেখিল—কাকার আর সে-শব্দ নাই, তিনি শব্দের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন!

—আট—

সাধিকা কার্তিককে যে কয়খানা চিঠি দিয়াছিল, তাহার একখানারও জবাব সে এ-যাবৎ দেয় নাই। তাহার বিশেষ ক্রোধ এই জন্য, যে কেন সে তাহাকে অপমানিত করিতে চিঠি-পত্র লেখে? কেন সে তাহাকে প্রতি পত্রের প্রতি কথায় 'তুমি' 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে? শ্রীমান কার্তিকচন্দ্রের অভিমানটা বেজায় বড় হইল—নদের চাঁদের শ্বশুর প্রভৃতি যে-সমস্ত গণ্য মান্য ব্যক্তির সহিত এ-যাবৎ তাহার আলাপাদি হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাহাকে 'কার্তিক—তুমি' বলিতেন। তাঁহারা বয়সে বড়, এ-রূপ ব্যবহার না হয় তাঁহাদের শোভা পায়। তাহার মাতা তাহাকে 'বাবা' 'লক্ষী' 'শোন' ছাড়া কখনই বলেন না। ও-পাড়ার শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল তাহাকে বড়-বাবু বলিয়া সম্মান দেখায়, যদিও শীল-মহাশয় বয়সে অনেক বড়। এ-রূপ সম্ভ্রম সে বরাবরই পাইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, কিন্তু সাধিকা এক রত্তি মেয়ে, তাহার কত ছোট, বলিতে গেলে এক হাঁটুরও বয়সের হইবে না, সে অপমান করিবে? সে কি বাড়ীর চাকর? সে কি ভিটে-বাড়ীর প্রজা? কার্তিকচন্দ্র তাই স্থির করিল, যখন এই পত্রে সাধিকা তাহাকে বার বার মাথার দিব্যি দিয়া কলিকাতায় যাইতে লিখিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই এক বার কলিকাতা যাইবে এবং ইহার একটা মীমাংসা না করিয়া ছাড়িবে না।

আর একটা কথা কার্তিকের মনে কয়েক দিন যাবৎ জাগিতেছে—নদের চাঁদ আমার পরম বন্ধু, নদে আমাকে ভিন্ন জানেনা, কুকুর লড়াই

দিতে হলে, আমি তার সঙ্গে থাকবই, মাছ ধরতে হলে আমি তার জাল-গাছা মাথায় বয়ে নিয়ে যাবই, 'চাঁচর-বুড়ো-বুড়ীর' ঘর সাজাতে আমিই যত খড় মাথায় করে আনব, কিন্তু নদে-বেটা কখনও তার বৌকে আমার সঙ্গে আলাপ করতে দেয় না। আমি কত বলেছি—নদে! তোর বৌ আমায় প্রণাম কর্বে, না আমি তোর বউকে প্রণাম কর্ব, তাতে নদে আমায় ঝেঁকে জবাব দেয়—কেউ কাউকে প্রণাম কর্বে না; মেয়েদের পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্তে নাই, যদি সে-মেয়ে বয়সে ছোট হয়। আমি তাইতে নদের উপর ভারি চটে গেছি।—বাপু! তুই দিস না দিস আমায় তাকে দেখতে, কেন তুই বলবি না—কে কাকে প্রণাম কর্বে? আচ্ছা তাই যদি হয়, সাধিকা বিমানের সঙ্গে আলাপ কর্বে কেন?

সুতরাং সে স্থির করিয়া ফেলিল, অবিলম্বে যে-কোনও উপায়ে সে কলিকাতা যাইবেই।

সাধিকা লিখিয়াছে—তাহার বাবা মরে-মরে।

কার্তিক তাই ভাবিল—সে ত ভাল কথা। আমারও বাপ নাই, সাধিকারও বাপ কেন থাকবে? সংসারে সবার বাপ থাকে? বাপ হয়, মরে যায়। মরার জন্যই ত বাবা। এই যে আমার বাবা নাই, সাধিকারও থাকবে না, সেজ-দিরও নাই।

সে-বার শ্রাবণ মাসের ২রা তারিখ কার্তিকচন্দ্র নদের চাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানা চিঠি সাধিকার কাছে লিখিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কার্তিকচন্দ্র সাধিকার পুরা নাম না জানায় সে যে-ঠিকানাটা বিমানের নিকট হইতে আনিয়াছিল, সেই ঠিকানায় বিমানের নামে সাধিকার চিঠিখানা পাঠাইয়া দিল। পত্রখানা অবশ্য সে নদের-চাঁদকে দিয়াই লিখাইয়াছিল, কিন্তু উহার ঠিকানাটা লিখিল সে নিজে।

চিঠিখানা বিমানের ঠিকানায় আসে নাই। কার্তিক কলিকাতায় আসিবে, সে-জন্য সাধিকা বিমানকে শিয়ালদহ-ষ্টেশনে উপস্থিত রাখিবে—এমন অনুরোধ চিঠিখানায় ছিল। পত্রখানা না পাওয়ায় সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল।

শিয়ালদহে ট্রেণ আসিবার সময় বিমানও উপস্থিত হইতে পারিল না, কার্তিকও ট্রেণ হইতে নামিয়া মহাফাঁপরে পড়িল।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কলিকাতার ধারণা কমই থাকিতে পারে, সর্বোপরি কার্তিকচন্দ্রের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি। সহরের মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছে সে সেই কালিয়া, যখন সে সেখানে বিবাহ করিতে গিয়াছিল।

কার্তিকচন্দ্র অবশ্য মনে মনে ধারণা করিয়াছিল, কলিকাতা কালিয়ার মত অথবা তাহা অপেক্ষা কিছু বড় হইবে, কিন্তু শিয়ালদহ পৌঁছিয়া কার্তিক যাহা দেখিল, তাহাতে সে হত-বুদ্ধি হইয়া গেল।

সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

মশায়! ওখানে কি হয়েছে?

কার্তিকচন্দ্র স্থূল-কায় না হইলেও দেহে বিশেষ বল রাখিত। সে সহসা উঁচু হইয়া গর্জিয়া উঠিল—

নিশ্চয়ই লড়াই কর্তে পার্ব।

একটি কুলি মোট মাথায় করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কার্তিকচন্দ্রের গায়ের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিল।

এ-দোষ অবশ্য কুলিটির নহে, কারণ সে বোঝা লইয়া তড়িৎ-গতিতে ছুটিতেছিল। আর এই ব্যাপারে কার্তিকেরও যে বিশেষ দোষ ছিল তাহা নহে, যে-হেতু সে শিয়ালদহের আকাশ-ছোঁয়া টীনের চালের প্রতি না চাহিয়াও পারে না, আবার সরল-বুদ্ধি-দীপ্ত পরোপকারিতার ইচ্ছার প্রেরণায় না

দৌড়াইয়াও পারে না, তাই কুলিটির গায়ে ধাক্কা না লাগিয়া পারে নাই। কিন্তু কার্তিকচন্দ্র রাগিয়া হঠাৎ বিড়-বিড় করিয়া বলিয়া ফেলিল—

'দেখাতাম শালা! তুই যদি টোনার চরে হতিস।'

সে যাহা হউক কার্তিকচন্দ্র তবুও দৌড়াইল এবং যাঁহাকে দেখে, তাহাকেই বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করে—

মশায়! কোন্ কোন্ দলে?

একটি ভদ্র লোক কার্তিকচন্দ্রকে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া মনে করিলেন—ছেলেটির বোধ হয় কিছু হারাইয়াছে বা ষ্টেশনের গাঁট-কাটা পকেট মারিয়া লইয়াছে, অথবা ছেলেটির সঙ্গের কোনও স্ত্রীলোক দল ছাড়িয়া গিয়াছে।

সহানুভূতি-পরায়ণ ভদ্র লোকটি একটু জোরেই তাকাইয়া করিলেন—

মশায়! শুনুন।

কার্তিকচন্দ্র তাহার মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া বলিল—

আমায় ডাকছেন?

ভদ্র লোক জবাব দিলেন—হাঁ।

কার্তিকচন্দ্র ফিরিয়া বলিল—

কি মশায়! কোন্ কোন্ দলে?

ভদ্র লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—

আপনি ছুটছেন কেন?

কার্তিকচন্দ্র তবুও চলিতে চলিতে বলিল—

ওখানে কোন্ কোন্ দলে মারা-মারি?

ভদ্র লোক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোথায়?

কার্তিকচন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—

ঐ ত ওখানে।

ভদ্র লোক চারি দিক চাহিয়া কোথাও কোন রূপ কিছু না দেখিয়া বলিলেন—

কই মশায় ?

কার্তিকচন্দ্র রাগিয়া উঠিল—

মশায়! আপনি কি কাণা ?

ভদ্র লোক অবাক হইলেন। হয় ত কোনও মারা-মারি হইতে পারে, তিনি হয় ত নাও জানিতে পারেন, তাই চুপ করিয়া তিনি নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

কার্তিক আবার বলিল—

ঐ দেখুন, কত লোক।

ভদ্র লোক চারি দিকে পুনরায় চাহিলেন ও শেষে চিন্তা করিয়া বুঝিলেন—এ নিশ্চয়ই পাড়াগেঁয়ে ও এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছে। রাস্তায় বহু লোক দেখিয়া মারা-মারি বা দাঙ্গা হইতেছে মনে করিতেছে। ভদ্র লোকটি অন্য কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কার্তিকচন্দ্র ক্রমে কলিকাতায় প্রবেশ করিল। সে যে-দিকে তাকায়, সে-দিকেই শুধু জন-সঙ্ঘ দেখে ও মনে মনে বলে—

এত লোক কেন এখানে-সেখানে ? এদের কি ঘরে কাজ নাই যে রাস্তায় বেরিয়ে সমস্ত সময় হল্লা করে ? আর এত তলা বাড়ী, এ কত জন রাজ-মিস্ত্রীতে তৈরী কর্লে ?

কার্তিকচন্দ্র জোরে হাঁটিতে লাগিল এবং ভাবিল—সে দেখিয়া লইবে এ-বাড়ীগুলির শেষ কোথায়। তাহার গায়ে কি জোর কম ? সে কি হাডু-ডু খেলিতে হাঁপাইয়া পড়ে ?

কার্তিক ভাবিল—বেলা বোধ হয় অনেক হইয়া গিয়াছে। সে পথে হাঁটিতে হাঁটিতে এবং নিজের দেশের মাঠের ভিতরের ছাতি-ফাটা রৌদ্র না দেখিয়া চলিতে চলিতে বেলার অনুমান করিতে পারিতেছিল না ; কিন্তু পেটের ক্ষুধা ত বসিয়া থাকিতে পারে না। সে তাই একটা খাবারের দোকানে কিছু জল-যোগ করিতে প্রবেশ করিয়া বলিল—

ওহে! কিছু দাও ত।

দোকানী বলিল—

কি দেব বাবু ? বসুন, বসুন।

এই বলিয়া দোকানী টেবিলের সামনে লোহার চেয়ার টানিয়া দিল।

কার্তিক জবাব দিল—

যা আছে।

ময়রা মনে করিল—ভাল খরিদ-দার জুটিয়াছে। সুতরাং সে বাবুটিকে খাবার দিতে লাগিল।

কার্তিকচন্দ্র ক্ষুধার আতিশয্যে খাইতেই লাগিল এবং পেট পূর্ণ মাত্রায় না ভরা পর্যন্ত খাইয়াই চলিল।

কার্তিক তখন বলিয়া উঠিল—

আর দিও না, আর দিও না, বমি হবে।

সে মনে করিতেছিল—সে তাহার শ্বশুর-বাড়ী খাইতে বসিয়াছে, না, না—বলিলেও তাঁহারা খাবার দিতে ছাড়েন না। কিন্তু যখন দেখিল, যে দাম সাড়ে তিন টাকার উপর উঠিয়া গিয়াছে, তখন সে মুখটি মলিন করিয়া বলিল—

মাপ কর ময়রা! অত টাকা আমি খাওয়ার জন্য ব্যয় কর্তে পারি না। আমি চিড়েখানা কি দিয়ে দেখব ? শুনেছি, পরেশনাথের বাগান

খুব বড়, দেখতে অনেক টাকা লাগে। বল ত ময়রা! বায়োস্কোপ, থিয়েটার কি দিয়ে দেখি? আর সাধিকার জন্তে বা ফুল-চুড়ি কি দিয়ে কিনি?

ময়রা বিস্মিত হইয়া তুইটি কান-মলা দিয়া কার্তিকচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিল। টাকাটি অবশ্য তাহার পকেট হইতে কাড়িয়া রাখিতে সে ভুলে নাই। কার্তিকচন্দ্র ক্ষুণ্ণ মনে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিল—

এত লোকের সঙ্গে দেখা হল, বিমান-বেটার সঙ্গে দেখা হল না?

কার্তিক বিরাট কলিকাতা-সহরে একটি কক্ষ-চ্যুত নক্ষত্রের স্থায় ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত হইয়া একটি 'টেলিগ্রাফ-পোষ্টের' থাম ধরিয়া হেলিয়া দাঁড়াইল। বেলা তখন তিনটা। মুখটি তাহার শুকাইয়া গিয়াছে, সে একটা দোকানের দেওয়াল-ঘড়ি দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল— রাত্রিতে সে কোথায় যাইবে, কি করিবে! ট্রাম, মোটর, বাস, জুড়ি-গাড়ী তাহার নিকট যেন বুকের উপর দিয়া চলিতেছে বলিয়া বোধ হইল। কার্তিক একটি 'বাই-সাইকেল' যাইতে দেখিয়া ভাবিল—

এই গাড়ীই বেশ। বেশ জোরেই চলে, আর বেশ বড় গোছের। সে একটি 'বাইসাইকেল'স্থিত এক জন সম-বয়স্ক ভদ্র সন্তানকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—থামুন, থামুন।

যুবাটি বাস্তবিকই থামিল।

কার্তিকচন্দ্র মনে মনে বলিল—মতি ঘোষের গাড়ীর মত।

কার্তিক অতি আহ্লাদিত হইয়া যুবকটিকে কহিল—

একটা কথা শুনবেন?

যুবকটি জবাব দিল—

কি? বলুন।

কার্তিক সাহস পাইয়া বলিল—

আমি বড় বিপদে পড়েছি।

যুবক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কি মশাই?

কার্তিকের ক্রমেই সাহস বাড়িল, সে বলিল—

দেখুন মশাই! যদিও আমার ভরসা আছে—আমি এ-গাড়ী চালাতে পারি, তা হলেও আমার গাড়ী চড়বার সময় নাই। আমার গায়ে বেশ শক্তি আছে। কালিয়ায় যে এমন গাড়ী নাই, তা মনে কর্বেন না।

ছেলেটি কহিল—

আপনার কি বিপদ, আগে তা বলুন।

কার্তিক জবাব দিল—

হাঁ বলি, আমার কথা শেষ করতে দিন।

যুবকটি মাথা নাড়িল—

আচ্ছা করুন।

কার্তিক পুনরায় আরম্ভ করিল—

কাল আমি এক বার চড়ে দেখব—আমি চড়তে পারি কিনা।

যুবকটি বলিল—

আচ্ছা, বেশ।

কার্তিক কহিল—

আমি যার কাছে যাব, সেখানে বোধ হয় এ-গাড়ীতে গেলে ভারী শীগগির যেতে পার্ব।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—

কোথায় যাবেন?

কার্তিক উত্তর করিল—

আমার একটি বন্ধু আছে—সত্যি সে বন্ধু নয়, আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি। সে কিছুতেই আমার বন্ধু নয়, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি। ছেলেটি অবাক হইয়া বলিল—

এক বার বন্ধু বলে আবার পর-মুহূর্তেই শপথ করে বলে ফেললেন—সে আপনার বন্ধু নয়!

কার্তিক তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—

মশায়! আমাকে কথা শেষ করতে দিন।

যুবকটি কহিল—বেশ বলুন।

কার্তিক রাগিয়া উঠিল—

বন্ধু হলে ষ্টেশনে থাকে না?

যুবাটি ইহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু আগন্তুকের কথা শেষ না হইতেই কথা বলিলে আগন্তুক চটিয়া উঠে, তাই চুপ করিয়া রহিল।

কার্তিক বলিল—

আচ্ছা, বিমানের বাড়ী কোনটি? যেখানে সাধিকা থাকে, তার মা থাকে, সাধিকার বাবার অসুখ?

ছেলেটি এ-বার পরিষ্কার বুঝিল—ইহার একটু 'ছিট' আছে। সে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—

দেখুন, আমার সময় নাই, যা বলবার বলুন।

কার্তিক রাগিয়া উঠিল—

আশ্চর্য লোক বটে আপনি। একটি ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ কত্তে জানেন না? আপনার চেয়ে আমি কোন অংশে কম না। সাধিকা আমার 'ওয়াইফ'। ছি-ছি-ছি! আলাপ কর্তে জানেন না?

যুবাটি এ-বার মজা পাইল। কিন্তু ক্ষেপা বলিয়া কলিকাতার রাস্তায় দয়া করিয়া উড়াইয়া দিল না—

আহা! বেচারী তরুণ। কি-কারণে মাথাটা এর চড়ে গেছে!

বেলা তখন ডুবু-ডুবু। কার্তিকের তখন পর্যন্ত ভাত পেটে যায় নাই, মাথাটাও প্রকৃতই গরম বোধ হইতেছে। ভদ্র লোক নিরুপায়; ইহাকে ছাড়িয়াও যাইতে পারে না, নিজের কর্তব্যও গুরুতর? সে বলিল—

আপনি স্নান করেছেন কি?

কার্তিক বলিল—

কি করে করি? আপনি এ-কথা এখনও বুঝলেন না। তবে এত ক্ষণ বল্লাম কি?

যুবক কহিল—

আমাদের বাড়ী যাবেন?

কার্তিক জবাব দিল—

নিশ্চয়ই যাব। কেন যাব না?

যুবক বলিল—

তবে চলুন, এই গাড়ীটার পেছনে উঠুন।

কার্তিক চটিয়া উঠিল—

আপনি বসবেন আগে, আর আমি বসব পাছে? ছি! ছি! ছি! ভদ্রতা জানেন না?

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—

আপনি কি 'বাইক' চালাতে পার্বেন?

কার্তিক জবাব দিল—

না জানলে শিখতেও ত পারি—আমি আগেই ত তা বলেছি।

যুবকটি মনে মনে ভাবিল, এ নেহাৎ বেড়ির উপযুক্ত। সে বলিল—
এখন শিখতে গেলে মোটর চাপা পড়তে হবে যে।

কার্তিক বলিল—

মোটর-ওয়ালারা কি এতই মূর্খ ?

যুবক এ-বার হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

—নয়—

পনর দিন হইল শম্ভুনাথ ইহ-ধাম ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিমানের চোখে ঠেকিল—ময়না যেন অপরূপা সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক সাধিকার রূপের ঘটাটা যেন ঘটা-পেটা করিয়াই সাজিয়া উঠিয়াছিল। বিমান এত দিন ময়নার ক্রম-বিকাশ একে একে পরখ করিতেছিল, তাহাতে বিশেষ নূতনত্ব সে কিছু দেখে নাই। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল—সেই ক্রম-বিকাশ সহসা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গঙ্গায় প্লাবন আসে। এক দিন সন্ধ্যা-কালে দেখা গেল, জল যেন একটু বাড়িয়াছে, পর-দিন সকালে দেখা গেল, জল-রেখা সত্যই একটু উপরে উঠিয়াছে, পুনরায় সন্ধ্যায় দেখি, কাল সন্ধ্যায় যেখানে জল আসিয়া ছুঁইয়াছিল, আজ যেন তাহা ছাড়াইয়া গিয়াছে, ঢেউগুলি ঘা খাইতেছে। লোকে বুঝিতেছে—এ সাধারণ জলের কম-বেশই হইবে। কিন্তু হঠাৎ পর-দিন প্রাতে দেখা গেল, এ ত কম-বেশ-নয়, এ যে প্লাবন। মাতা ভাগীরথীর আর সে অবস্থা নাই। এ-কূল ও-কূল ভাসিয়া গিয়াছে, নিকটে দূরে সমস্তই জলময়। আর জলের কি ভীষণ মূর্তি! তখন সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। অনন্ত অবিশ্রান্ত তরঙ্গাভিঘাত সর্বদাই বুকে করিয়া নাচিতেছে। শঙ্কায় কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না। নৌকাগুলি ছোট্ট খোলার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও ভয়ে ভয়ে তীর-ঘেঁসিয়া। প্লাবনের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতের গর্ব বুকে করিয়া গঙ্গা তখন ধীর, স্থির, গম্ভীর, সুমাধির ন্যায় নিশ্চল। সামান্য বায়ু-বেগ তখন তাহাকে ঠেলিতে পারে না, তাহার ভিতরে যেন একটা অপূর্ব সম্ভ্রম।

বিমান তাই ময়নার রূপে যেন একটা ফেনিল আবর্ত দেখিল না। যে-ময়না সেই শৈশবে, সেই বাল্যে, সেই কৈশোরে একটা পাতার মত ছিল, সামান্য কথায় ঝন-ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিত, এখন সেই শীর্ণ পত্র যেন বেগে কাঁপিয়া উঠে, আর তাহার স্পন্দনে কম্পন নাই, সে যেন আজ-কাল কিছুই গ্রাহ্য করে না, নিজের মনে নিজেই থাকিতে ভালবাসে।

ময়নাকে দেখিয়া বিমান এখন যেন কেমনই ছুলিয়া উঠিত। যে-ময়না সেই আগেকার মত ঠিক-ভাবেই 'বিমান-দা—বিমান-দা' করিতে ভালবাসে এবং দেখা হইলেই পূর্বের মত অজস্র প্রশ্নে তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে, সেই ময়নাকে বিমান যেন এখন একটু দ্বিধা করে। সে চোখে চোখ দিয়া আলাপ না করিয়া চোখে-নাকে তাহার সহিত কথা বলে, ময়নার কিন্তু তাহা মোটেই ভাল লাগে না। সে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠে—

বিমান-দা! তুমি কি আমাদের পর করে দিচ্ছ?

বিমান ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দেয়—

কই? কই? কখন? কখন? কিসে? কি হয়েছে? ইত্যাদি। তাহার কিন্তু মাথা এবং চক্ষু আনত হইয়াই থাকে।

ময়না তবু বিমানকে ধরিয়া বসে—

তুমি কি চোর? তুমি কি অন্যায় করেছ? কেন এত কেঁপে কথা কইছ? আমি তোমায় কিছু বলেছি? মা কিছু বলেছেন?

বিমান অন্য-মনস্ক-ভাবে জবাব দেয়—

না, না, তা নয় ময়না!

কিন্তু যখনই ময়না অন্য দিকে মুখ ফিরায়, অমনই বিমান অতি তীক্ষ্ণ-ভাবে ময়নার প্রতি দৃষ্টি ফেলে এবং চোখে যত দূর দেখিতে পারা চলে, তাহাকে দেখিয়া লয়। ময়না তাহার দিকে ফিরিলে ব্যথিতের মত সে নয়ন ফিরাইয়া লয়।

বহু দিন হইতেই বিমানের আর বাঁশী হাতে করিতে ইচ্ছা হইত না। ময়না বরাবরই বিমানকে বলিত—

বিমান-দা, তোমার বাঁশীর সুর আমার এমন মিষ্টি লাগে, তা তোমায় কি বলব বিমান-দা!

বিমান কোনও কথা বলিত না। সে মনে ভাবিত—এই ময়নাকেই ত সে গান-বাজনা শিখাইয়াছে। তাহার তখন কি লজ্জা ছিল। ময়না কিছুতে উহা করিতে চাহিত না, কত সাধা-সাধি করিয়া, 'সোণা—লক্ষ্মী' বলিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, লজেঞ্চুস পুতুল খেলনা চুপে চুপে কিনিয়া দিয়া ময়নাকে প্রথম হা করিতে, পরে গান ধরিতে, ক্রমে সা-রে-গা-মা সাধিতে, শেষে 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' প্রভৃতি গানগুলি সে ময়নাকে শিখাইয়াছে। এখন ময়না কি সুন্দর গায়! আর বিমান নিজে সবই যেন ভুলিতে চলিয়াছে। যে-'হা' করিতে এত কাল ময়নার লজ্জা করিত, এখন সেই 'হা' বিমানের আপনিই বুজিয়াছে।

শম্ভুনাথের মুখাগ্নি বিমানই করিয়াছিল। যখন সে তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সাহায্যে শম্ভুনাথকে খাটুলিতে করিয়া কাশী মিত্রের ঘাটে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ইন্দুমতী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিমানের হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন—

বাবা! দেখো, তোমার কাকার যেন হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত কাজ হয়। তুমি তাঁর ছেলের মত, তুমিই মুখাগ্নি করো।

বিমানচন্দ্র দুই হাতে ময়নাকে ঠেকাইয়া কাকীমাকে বলিয়াছিল—

কাকীমা! আমি থাকতে কাকার সদ্গতির কোনও অ-ব্যবস্থা হবে না। কাকা বেশ গিয়েছেন। বয়স তাঁর ত কম হয় নাই, তারপর গঙ্গা-তীরে তিনি দেহ ত্যাগ করলেন, তাঁর মৃত আত্মা সুখে স্বর্গে যেতে পারবে।

বৃদ্ধা ইন্দুমতী তখন পর-লোক-গত স্বামীর উদ্দেশ্যে মাথায় হাত ঠেকাইয়াছিলেন।

শম্ভুনাথের শ্রাদ্ধাদি বিমান নিজে এই গঙ্গা-তীরেই সমাধা করিয়া পুত্রোচিত কর্ম করিয়াছে।

এক জন ভট্টপল্লীর ক্রিয়া-নিষ্ঠ পুরোহিত ডাকিয়া বিমানচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে টাকার চুক্তি করিয়া স্থির করিয়াছিল—শ্রাদ্ধাদি কার্যে যে-সমস্ত পিতল কাঁসা, কাপড় চোপড় প্রভৃতি লাগিবে, পুরোহিত-ঠাকুর নিজেই তাহা সরবরাহ করিবেন। বিমানের নিজের উপর থাকিল—মাত্র মন্ত্র পড়িবার পালা। বাড়ীতে ইন্দুমতী ও ময়না 'অন্ন-জল' প্রভৃতি করিবে। ইহারও আবশ্যক জিনিস-পত্রের জন্য বিমানচন্দ্র পুরোহিত-ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত চুক্তি করিয়াছিল। পুরোহিত-ঠাকুর-মহাশয় বিমানদের বাসায় আসিয়া তখন বলিয়াছিলেন—

বড়-বাবু! আপনার ভগিনী একটা 'ষোড়শ' করুন। তিনি ত বড় লোকের পরিবার।

সাধিকা তখন অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার হাতের 'টালি প্যাটার্ন' চুড়িগুলি ঝল-মল করিয়া উঠিল কাণের 'বল ইয়ারিং' যেন বাতাসে কাঁপিয়া উঠিল।

বিমান তখন মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া বলিয়াছিল—

ঠাকুর! এতে যা তোমার হবে, তাতে বেশ দু দিন বসে খেয়ে কাটাতে পারবে, আর কিছু দিনের জন্য ঘাটে ঘাটে মড়া খুঁজে বেড়াতে হবে না।

বিমানের এই রুক্ষ আচরণে পুরোহিত-ঠাকুর-মহাশয় কোন উচ্চ-বাচ্য করেন নাই, তবে মনে মনে অবশ্য তিনি বলিয়াছিলেন—

এমন দুর্মুখ ত দেখি নি। কারও শ্রাদ্ধ বোধ হয় কেউ করাচ্ছে, এতে প্রাণ নাই।

ময়না তখন দেয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া। তাহার মনে হইল—বিমান-বাবুর এই অ-যথা আয়োজনে কি ফল? বাবা আমার গঙ্গায় দেহ রক্ষা করিয়াছেন, এই-ই আমাদের যথেষ্ট লাভ।

বিমানচন্দ্র ময়নার বাবার শ্রাদ্ধে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এবং যাঁহারা আসিয়া জাঁক-জমক করিয়া ফুলের তোড়া প্রভৃতি দিয়া মৃত শম্ভুনাথের খাটুলি সাজাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিমানের পুরুলিয়ার বন্ধু রমেন এক জন।

রমেন বি. এ. পাশ করিয়া আর লেখা-পড়া করে নাই। সে এখন কলিকাতা কর্পোরেশনে ৭৫৲ টাকা মাহিনার কেরাণী। বাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে, সুতরাং চাকরি করিয়া যাহা পায়, বাবু-গিরিতেই তাহা ব্যয় করে।

রমেন বিমানের সকল খবরই জানিত। দুই বন্ধুতে পরস্পরের প্রাণের কথা বিনিময় করিত। রমেনও বিবাহ করে নাই। বয়স তাহার প্রায় ত্রিশের কোঠায় পড়িয়াছে।

শম্ভুনাথের শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে রমেন ভুলে নাই। সে সময়ে-অসময়ে বাসায় আসিয়া 'কাকীমা' 'কাকীমা' করিয়া গম্ভীর উপদেশে—সংসার মায়ার বন্ধন, সকলেরই এই ভাবে যাইতে হইবে, ইত্যাদি শ্মশান-বৈরাগ্যের ভূমিকায়—কাকীমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। সে অত্যন্ত চৌকস ছেলে। কথা নাই, বার্তা নাই, ময়না যেন তাহার কত আপন, তাহার সহিত যেন তাহার কত জন্মের পরিচয়। বিবাহোপলক্ষে 'ক্লিপ' উপহার দেওয়া হইতে কার্তিকের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার গল্প পর্যন্ত সমস্তই সে প্রাক্তন সংস্কারের মত মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

সে ময়নার কোমল হাত দুখানি ধরিয়া অবিলম্বে তাহাকে পিতৃ-শোক

তুলিতে আদেশ করিয়াছিল, যেন মাষ্টারের ছেলের প্রতি জ্যামিতির পড়া তৈয়ারীর হুকুম। ফাঁকি-বাজ শিক্ষক তাঁহার অকাট মূর্খ ছাত্রকে যা তা বুঝাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুঝেছিস্?' ছাত্র কিছু না বুঝিয়া অমনই মাথা নাড়িয়া বলিল—

হাঁ! মাষ্টার-মশাই, এ ত সোজা! আমি ত নিজেই এমন জ্যামিতি লিখতে পারি।

মাষ্টার-মহাশয়ও বুঝিলেন—এমন ছাত্র দুই একটি পাইলেই তিনি মাষ্টারীতে বেশ দু পয়সা রোজগার করিতে পারিবেন।

ময়না কিন্তু বিমান-দার বন্ধুর সারল্যে মোটেই খুসী হইতে পারে নাই, কারণ তাহার স্বামীর আলোচনা পিতার মৃত্যুর প্রসঙ্গে কেন উঠিবে?

রমেন সে-দিন নিমন্ত্রণ সারিয়া যাইবার সময় বিমান ও সাধিকাকে এক সিঁড়িতে দেখিয়াছিল। বিমান দো-তলা হইতে এক-তলায় কি যেন কাজে নামিতেছিল, আর ঠিক ঐ সময়ে সাধিকা এক-তলার কল-ঘর হইতে উপরে উঠিতেছিল। রমেন তখন উচ্চ কণ্ঠে দো-তলায় সিঁড়ির নিকটস্থ কামরা হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—'থ্যাঙ্ক ইউ, ধ্যানের ছবি!"

পরে স্ফূর্তি দ্রুত-পদে উঠিয়া গিয়া বিমানের বুক চাপড়াইয়া বলিয়াছিল—

আজ যাই ভাই! আবার এক দিন আসব, আমি নিজেই নিমন্ত্রণ রেখে গেলাম।

বিমান তখন তাহার নিজের জিভ কামড়াইয়া চুপি চুপি বলিয়াছিল—

চুপ, রমেন! কাকীমা ও-ঘরে।

রমেন ঝন-ঝন করিয়া পকেটের টাকা বাজাইয়া, চশমার কাচ দিয়া সাধিকার প্রতি ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া ও গুন-গুন—করিয়া 'ঝড়ের

রাতে তোমার অভিসার'—গানের সুর ধরিয়া বাটীর বাহির হইলে সাধিকা অভিভূতার মত রান্না-ঘরে গিয়া হাতের তলায় মুখ গুঁজিয়া অনেক ক্ষণ এক ভাবে বসিয়াছিল। তাহার চেহারায় পরিস্ফুট হইতেছিল, সে যেন ভারী উচাটন হইয়াছে। তাহার যেন কিছুই ভাল লাগে না, তাহার সর্বদা ইচ্ছা করে তাহার মায়ের কোলের ভিতর লুকাইয়া ঘুমাইতে। তবেই তাহার পরম শান্তি।

সাধিকা মায়ের কাছে তাহার অসুবিধার কথা কিছুতেই বলিত না। মাতা কিন্তু খোচাইয়া খোঁচাইয়া তাহার কাছে সে-দিন ঐ ব্যাপারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাধিকা তখন স্থির করিয়াছিল, সে বিমান-দার কাছে জিজ্ঞাসা করিবে—এই লোকটি কে? কে এমন হাস্য-রসিকতায়—যেন কত দিনের চেনা-জানা, কত আপন জন—নিমিষের মধ্যে ঘরটি প্লাবিত করিয়া দিয়া গেল।

সে তখন জেদ করিয়াছিল—বিমান-দার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিমান-দা যদি পুনরায় বাসায় প্রবেশ করিতে দেয়, তবে সে তাহার মায়ের হাত ধরিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইবে, ক্ষণ-কালও এই পুরীতে তাহারা থাকিবে না। তাহার মন চঞ্চল হইয়াছে। এই বিষের হাওয়া যেখানে এক বার বহিয়াছে, সেখানে উহা চির কালই থাকিতে পারে।

এই বলিয়া সে-দিন সাধিকা ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সে মুখে কাপড় গুঁজিয়া, চোখ দুইটি এক-রূপ চাপিয়া ধরিয়া, পা টিপি টিপি করিয়া তে-তলায় বিমানের ঘরে গিয়াছিল এবং তাহার বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল।

সাধিকা অনেক ক্ষণ যাবৎ সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে একাকিনী শুইয়া কাঁদিতেছিল। ইন্দুমতী দো-তলায় শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ধ্যানের ছবি

ঘড়িতে তখন রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। ঘর অন্ধকার, বাহিরে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, শ্রাবণের কাল মেঘ কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রির সঙ্গে মিশিয়া তে-তলাকে যেন ভূতের পুরীর মত সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাড়ীর ঠাকুর চাকর ঝিরা নিমন্ত্রণের কাজ-কর্ম শেষ করিয়া এবং রাত্রিতে কোনও রান্না-বান্না নাই জানিয়া সকাল-সকাল যে যাহার আবাসে চলিয়া গিয়াছে। বিমান বোধ হয় তাহার বন্ধু রমেনের পেছনে পেছনে ছুটিয়া আর আসে নাই, তাহার আহারাদিও হয় নাই।

কাঁদিতে কাঁদিতে সাধিকা সেই একলা ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের সজল হাওয়া সাধিকাকে যেন ব্যজন করিতেছিল।

রাত্রি যখন সাড়ে দশটা, তখন বিমান দুই সিঁড়ি তিন সিঁড়ি করিয়া লাফাইয়া আসিয়া একেবারে তাহার তে-তলার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জানালাগুলি দেওয়া হয় নাই—বিছানা সবই বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে হাত চাপিয়া চাপিয়া একে একে সমস্তই দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার হাত দুইখানি সাধিকার গায়ের উপর গিয়া পড়িল।

সাধিকা ঘুমের ঘোরে চেঁচাইয়া উঠিল—

বিমান-দা! বিমান-দা!

বিমানের বুকে সে-দিন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে অভিভূতের মত সেইখানেই সাধিকার গায়ে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল এবং সমস্ত জোর দিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরিল।

সাধিকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিদ্যুতালোকের 'সুইচ' টিপিয়া দিল। ঘরখানি আলোতে ভরিয়া গেল।

সাধিকা বলিল—

বিমান-দা! এত রাত্রি হল যে? উঃ! বাইরে দেখি বৃষ্টি পড়ছে। ইঃ! সব ভিজে গেছে?

বিমান-দা! খেতে চল।

বিমান তখন বলিয়াছিল—

না, আমি খাব না।

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া বিমান মুখ হাত না ধুইয়াই দো-তলায় কাকীমার ঘরে আসিয়া দেখিয়াছিল, কাকীমা তক্তপোষের পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছেন, ময়না মায়ের দিকে না ফিরিয়া পূর্ব দিকে মুখ রাখিয়া গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে। কাকীমার শরীর বিশেষ অসুস্থ। তিনি যে রাত্রিতে জ্বরে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাতরাইয়াছেন, সারা রাত্রি অপলক-নেত্রে জাগিয়া বিমান তাহা শুনিয়াছে; কিন্তু তাহার ইচ্ছা হয় নাই, যে এক বার নামিয়া আসিয়া দেখে, কাকীমার কি হইয়াছে।

সে-দিন সকালে বিমান ঘরে ঢুকিয়া কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে স্থির নিশ্চল ভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়া অদূরে দাঁড়াইল। দেখিল—ময়না ঘুমাইতেছে। পূর্ব দিকের ক্ষীণ রক্তিম সূর্যালোক আসিয়া ময়নার সমস্ত শরীর ছোপাইয়া দিয়াছে। অতি আস্তে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—

আঃ! কি সুন্দর!

বিমান দেখিতেছিল—সাধিকা ঘুমাইতেছে। অনেকেই ত ঘুমায়, কিন্তু ঘুমের মধ্যে এমন মাধুরী ফুটাইতে কে পারিয়াছে? সাধিকার চুলগুলি আলু-থালু হইয়া শুভ্র বালিশের উপর আছাড় খাইতেছে। সিঁথির সিঁদুর যেন জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বিমানকে তীব্র উপহাস করিতেছে।

তাহার কটি-বস্ত্র শিথিল হওয়ায় গায়ের পরিহিত সেমিজটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বিমান দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল। ঠিক এই সময় কাকীমা পাশ ফিরিয়া কোঁকাইয়া উঠিলেন। অমনই বিমান তক্তপোষের নিকট গিয়া ময়নার গায়ের উপর দিয়া তাহার হাতখানা বাড়াইয়া কাকীমার কপালে হাত দিয়া দেখিল—জ্বর তখনও বেশ আছে।

ময়না মায়ের কাতরানিতে জাগিয়া উঠিয়াই তাহার বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া গায়ে জড়াইল।

বিমান ময়নার পায়ের ধারেই বসিয়া পড়িল।

মা তখন মেয়েকে ঝাঁকিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

ওঠ, ওঠ, পা টান দে, তোর বিমান-দা, দেখতে পাচ্ছিস না? ওকে বসতে দে।

ময়না ইন্দুমতীর কথায় তাড়া-তাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নীচে নামিয়া সরা-সরি এক-তলায় কল-ঘরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

ইন্দুমতী বিমানকে বলিলেন—

বাবা! কার্তিকের খোঁজ হল?

বিমান ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—

না কাকীমা! এত রাস্তায় ত ঘুরছি—কই কার্তিকের সঙ্গে দেখা ত হল না।

ইন্দুমতী বলিলেন—

ময়নার কাছে শুনলাম—সে কার্তিকের কাছে কয়েকখানাই চিঠি দিয়েছে, একখানারও নাকি জবাব পায় নি। শেষ চিঠিখানায় ময়না কার্তিককে

লিখেছিল—ওঁর অসুখ বেশী, এক বার এসে ওঁকে দেখে যেতে। তা খুব দেখা হল!

এই বলিয়া ইন্দুমতীর কণ্ঠ-স্বর ভারী হইল। তিনি আর কোনও কথা বলিলেন না।

বিমান কাকীমাকে কোনও কিছু না বলিয়া তখন চুপ করিল। কিছু কাল এই ভাবে কাটিল।

বিমান পুনরায় বলিল—

কাকীমা! কাকা ভেবে শেষ হলেন, আপনিও কি নিজেকে ক্ষয় করবেন?

কাকীমা নিরুত্তর রহিলেন।

বিমান কাকীমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার মনটা ফিরাইয়া লইতে জিজ্ঞাসা করিল—

কাকীমা! আপনার কি এখানে কষ্ট হচ্ছে?

কাকীমা জবাব দিলেন—

ছি! ও-কথা বলো না বিমান! ও কথা ভাবলেও আমাদের পাপ হবে। বিমান! তোমার ঋণ আমরা জীবনেও পরিশোধ কর্তে পারব না।

বিমান অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—

কাকীমা! আপনার এই কথা শুনব, এ আমি কখনও আশা করি নি। কাকীমা! তবেই বুঝলাম—আপনি আমাকে পর ভাবেন এবং আপনি যে পরের কাছে এসে রয়েছেন, তাই মনে করেন। কাকা ত আমায় কখনও এ-চোখে দেখেন নি। কাকীমা! আপনার শরীরটা এখন কেমন বোধ হচ্ছে? আজ ডাক্তার নিয়ে আসব?

কাকীমা উত্তরে বলিলেন—

দূর ছাই ডাক্তার! বিমান! অমন কাজটি করো না, আমি ওষুধ খাব না, তাঁকে ত অনেক ওষুধ খাইয়েছিলে, কত ডাক্তার এসে টাকা লুটে নিয়ে গেল, কই, তাঁকে ধরে রাখতে পারলে? তাঁকে বাঁচাতে পারলে? যখন সময় হবে তখন যেতেই হবে, বিমান!

বিমান কাকীমার মুখে টাকার কথার উত্থাপন শুনিয়া সে-দিন পুনরায় খোঁচা খাইল। সে বলিল—

কাকীমা! টাকার কথা তুলছেন কেন? কাকীমা! আমার খুব মনে হয়, আপনি যেন আমার নিকট থেকে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছেন।

কাকীমা তখন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—

বিমান! তোমার ঐ বন্ধুটি কে?

বিমান জিজ্ঞাসা করিল—

কোন্ বন্ধুটি?

কাকীমা বলিলেন—

ঐ যে খুব আদর-আপ্যায়িত করে গেল।

বিমান ক্ষণ-কাল ভাবিয়া বলিল—

ও—রমেনের কথা বলছেন?

কাকীমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—

হাঁ, ওর নাম রমেনই বটে। খুব সোর-গোল করছিল।

বিমান মনে মনে আশঙ্কা গণিল।

সে বিশেষ ধরা না দিয়া বলিল—

কাকীমা! ও আমার বিশেষ বন্ধু, বহু দিন এক-সঙ্গে পড়েছি। বি.এ.

পাশ করে এখন চাকরি করছে, বেশ রোজগার করে। বাড়ীর অবস্থাও বেশ ভাল। বাড়ী ওর বীরভূমে।

বিমান রমেনের পরিচয় দেওয়ায় ইন্দুমতী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার বন্ধুটি বিয়ে করেছে ?

বিমান কাকীমার মুখ হইতে কথাটি ধরিয়া বলিল—না কাকীমা! বিয়ে করে নি, বড় ভাল ছেলে। বিয়ে করলে কটা বিয়ে ও করতে পারত, টাকা-কড়িও প্রচুর পেত, তা ও ঠিক করেছে—বিয়ে করবে না।

—দশ—

ইন্দুমতী সে-দিন বড়ই প্রমাদ গণিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রসঙ্গ একেবারেই চাপিয়া রাখিয়া তখন বলিয়াছিলেন—বিমান! আমার ভাবনা হচ্ছে—শ্বশুরের ভিটেটায় কেন আলো না জ্বলবে। বিমান! আমাদের দেশে পাঠিয়ে দাও।

সে-দিনের সকালের আলাপে বিমানচন্দ্রের মনটা বড় ভারী হইয়াছিল। যত সময় যাইতে লাগিল, ততই যেন ধোঁয়া ধোঁয়া কত কি তাহার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার শুধু ইহাই ভয় হইতেছিল—ময়নাও কি এ-রূপ ভাবিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে সে নিজেকে কিছুতেই অগ্নি-পরীক্ষায় যাচাই করিতে পারিবে না।

সে মনে মনে ভাবিল—

রমেনটা বাস্তবিকই হিংসুক। সে যে-রকম কার্য-কলাপের নমুনা এখানে দেখাইয়া গিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই নিন্দনীয়। কাকীমা বুদ্ধিমতী, খপ করিয়া তাহা ধরিতে পারিয়াছেন।

বিমান সেই সকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—রমেনকে এ-বাড়ীতে আর ঢুকিতে দিবে না, এবং কাকীমা যাহাতে সন্দেহ করেন বা মনে কষ্ট পান, তাহা সে কিছুতেই করিবে না। ময়না যে তার বোন। যে বোনের স্বামী এ-রূপ ক্ষেপাটে এবং যাহার পিতা ভিন্ন অন্য কেউ দেখিবার ছিলেন না, পিতাও এখন এ-জগতে নাই, সুতরাং তাহার আর কে আছে?

আজ সকালে কাকীমার অসুখ বাড়িয়াছে। বিমান তাঁহার জন্য ভাল ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, দুপুরের স্নানাদি শেষ করিয়া তে-তলায় গিয়াছে।

কাকীমা রোগিণীর ঘুম ঘুমাইতেছেন।

পাচক-ঠাকুর অভ্যাস-মত বাবুর খাবার তে-তলায় দিয়া গেল। বিমান াইতে বসিল। ময়না এ-যাবৎ প্রত্যহই বিমান-দার খাওয়ার সময় কাছে সিয়া তাহার আহারাদির তত্ত্বাবধান করিত, কিন্তু আজ সে কি-কারণ শতঃ সেখানে আসিয়া যথা-সময়ে উপস্থিত হয় নাই। বিমান মনে ়রিল—সাধিকাকে বুঝি কাকীমা কিছু বলিয়াছেন।

সাধিকা চির কালের আদরের কন্যা। শৈশব-কাল হইতেই সে বাবার ়কান্ত স্নেহের পাত্রী ছিল। শম্ভুনাথ কোন দিনই মেয়েকে কিছু বলিতেন া। যখন সাধিকা কিছু অন্যায় বা পাগলামি করিত, তখন তিনি ়হা ময়নার চঞ্চলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

সাধিকাও অতি ভাল মেয়ে ছিল। স্বভাব-চরিত্রে, কাজ-কর্মে, আলাপ-্যবহারে, পিতা-মাতাকে আদর যত্ন করিতে তাহার মত দুইটি খুঁজিয়া াওয়া যাইত না। ইন্দুমতী অবশ্য সাধিকাকে চির কালই চোখের শাসনে াখিতেন কিন্তু সে-শাসন কঠোর শাসন ছিল না, স্নেহের শাসনই ছিল।

সে দিনকার মায়ের কঠোর ইঙ্গিতে, বিশেষতঃ মায়ের কাল মুখে, াধিকা কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছিল না—মায়ের এই াসন স্নেহের। সে সেই জন্য মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

এ-সংসারে যে প্রকৃতই নির্দোষ, তাহার উপর কখনও কিছু অন্যায় মত্যাচার হইতে পারে না। অন্যায়-কারীর এমনই একটা স্বভাব সে নিজে নিজেকে ধরা না দিয়া স্বস্তি পায় না।

সাধিকা এখন আর সে-ময়না নহে। সে বড় হইয়াছে, সবই বুঝে। সুতরাং তাহার সেই ভাবেই চলা-ফেরা করা কর্তব্য।

সে ভাবিল—আর কি সেই আগের মত বিমান-দার ঘাড়ে চাপিয়া বসা

—দশ—

ইন্দুমতী সে-দিন বড়ই প্রমাদ গণিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রা একেবারেই চাপিয়া রাখিয়া তখন বলিয়াছিলেন—বিমান! আমার ভাব হচ্ছে—শ্বশুরের ভিটেটায় কেন আলো না জ্বলবে। বিমান! আমাদে দেশে পাঠিয়ে দাও।

সে-দিনের সকালের আলাপে বিমানচন্দ্রের মনটা বড় ভারী হইয়াছিল যত সময় যাইতে লাগিল, ততই যেন ধোঁয়া ধোঁয়া কত কি তাহার সম্মু দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার শুধু ইহাই ভয় হইতেছিল- ময়নাও কি এ-রূপ ভাবিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে সে নিজেবে কিছুতেই অগ্নি-পরীক্ষায় যাচাই করিতে পারিবে না।

সে মনে মনে ভাবিল—

রমেনটা বাস্তবিকই হিংসুক। সে যে-রকম কার্য-কলাপের নমুনা এখানে দেখাইয়া গিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই নিন্দনীয়। কাকীমা বুদ্ধিমতী, খ করিয়া তাহা ধরিতে পারিয়াছেন।

বিমান সেই সকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—রমেনকে এ-বাড়ীতে আর ঢুকিতে দিবে না, এবং কাকীমা যাহাতে সন্দেহ করেন বা মনে কষ্ট পান তাহা সে কিছুতেই করিবে না। ময়না যে তার বোন। যে বোনের স্বামী এ-রূপ ক্ষেপাটে এবং যাহার পিতা ভিন্ন অন্য কেউ দেখিবার ছিলেন না, পিতাও এখন এ-জগতে নাই, সুতরাং তাহার আর কে আছে?

আজ সকালে কাকীমার অসুখ বাড়িয়াছে। বিমান তাঁহার জন্য ভাল ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, দুপুরের স্নানাদি শেষ করিয়া তে-তলায় গিয়াছে।

কাকীমা রোগিণীর ঘুম ঘুমাইতেছেন।

পাচক-ঠাকুর অভ্যাস-মত বাবুর খাবার তে-তলায় দিয়া গেল। বিমান খাইতে বসিল। ময়না এ-যাবৎ প্রত্যহই বিমান-দার খাওয়ার সময় কাছে বসিয়া তাহার আহারাদির তত্ত্বাবধান করিত, কিন্তু আজ সে কি-কারণ বশতঃ সেখানে আসিয়া যথা-সময়ে উপস্থিত হয় নাই। বিমান মনে করিল—সাধিকাকে বুঝি কাকীমা কিছু বলিয়াছেন।

সাধিকা চির কালের আদরের কন্যা। শৈশব-কাল হইতেই সে বাবার একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিল। শম্ভুনাথ কোন দিনই মেয়েকে কিছু বলিতেন না। যখন সাধিকা কিছু অন্যায় বা পাগলামি করিত, তখন তিনি উহা ময়নার চঞ্চলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

সাধিকাও অতি ভাল মেয়ে ছিল। স্বভাব-চরিত্রে, কাজ-কর্মে, আলাপ-ব্যবহারে, পিতা-মাতাকে আদর যত্ন করিতে তাহার মত দুইটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ইন্দুমতী অবশ্য সাধিকাকে চির কালই চোখের শাসনে রাখিতেন কিন্তু সে-শাসন কঠোর শাসন ছিল না, স্নেহের শাসনই ছিল।

সে দিনকার মায়ের কঠোর ইঙ্গিতে, বিশেষতঃ মায়ের কাল মুখে, সাধিকা কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছিল না—মায়ের এই শাসন স্নেহের। সে সেই জন্য মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

এ-সংসারে যে প্রকৃতই নির্দোষ, তাহার উপর কখনও কিছু অন্যায় অত্যাচার হইতে পারে না। অন্যায়-কারীর এমনই একটা স্বভাব সে নিজে নিজেকে ধরা না দিয়া স্বস্তি পায় না।

সাধিকা এখন আর সে-ময়না নহে। সে বড় হইয়াছে, সবই বুঝে। সুতরাং তাহার সেই ভাবেই চলা-ফেরা করা কর্তব্য।

সে ভাবিল—আর কি সেই আগের মত বিমান-দার ঘাড়ে চাপিয়া বসা

তাহার সাজে ? মাতা বোধ হয় তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই বিমান-দা সে-দিন প্রত্যুষে যখন তাহার পায়ের কাছে বসিয়াছিল, তখন তাহার মাতা বোধ হয় তাহার প্রকৃতিতে এমন কিছু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাহা তাহার বয়সোচিত হয় নাই—হউক বিমান-দা নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের মত।

সাধিকা আজ সমস্ত দিন ইহাই ভাবিতেছে, আর মনে মনে নিজেকেই তিরস্কার করিতেছে—কেন সে তাহার কর্তব্য-চ্যুত হইয়া মায়ের চোখে হীন প্রতীয়মান হইল ?

সাধিকা তাই বৃদ্ধা মাতার শাসন উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। সে বড় অভিমানিনী। এত আদরের নিধি হইয়া সে কি-রূপে মায়ের কাল মুখ সহ্য করিবে ? তৎক্ষণাৎ তাহার মনে বাবার শোক উথলিয়া উঠিল, আর সে ঝর-ঝর করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। ইন্দুমতী যদি সাধিকার এই শোকাশ্রু দেখিতেন, তবে হয় ত তিনি কিছুতেই মেয়ের সঙ্গে কান্নার সুর না মিলাইয়া থাকিতে পারিতেন না। মেয়ে সহসা ভাবিল—এই বৃদ্ধা রুগ্না মায়ের সুমুখে যদি সে আজ কাঁদিয়া তোল-পাড় করিয়া লয়, তবে মায়ের বুকে তীক্ষ্ণ শেল ফুটিবে। এই জন্য সে আজ ভোর হইতেই সারা দিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

বেলা যখন একটা, তখন সাধিকা দুটি ভাত লইয়া খাইতে বসিল। হঠাৎ তাহার মনটা কাঁসির মত বাজিয়া উঠিল। সে এত কাল মায়ের ক্রোধের বিষয় ভাবিয়া তাহার একটা কিনারা করিয়া লইয়া মনটা একটু ফিরাইতে পারিয়াছিল। সহসা তাহার যে-বিষয়টির কথা মনে পড়িল, তাহাতে সে ভাতের থালা সামনে লইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে অনুভব করিতে লাগিল—এই বুঝি মায়ের প্রখর দৃষ্টি তাহার পশ্চাৎ দিক দিয়া আসিয়া বুকের ভিতর উঁকি মারিতেছে।

সাধিকার মন অস্থির হইয়া উঠিল! সে কিছুতেই নিজের মনের শঙ্কা বিদূরিত করিতে পারিল না।

এঁটো হাতে মুখে সে চুপি চুপি মায়ের কামরার নিকটে গিয়া কিছু কাল ওৎ পাতিয়া থাকিল, পরে কিঞ্চিৎ সাহসে ভর করিয়া মায়ের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—মা গভীর ঘুম ঘুমাইতেছেন। বিমান-দা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে।

সাধিকা পুনরায় আসিয়া খাইতে বসিল। কিন্তু এ-সময়ে সে আর কিছুতেই মায়ের ক্রোধের অসারতা মনে করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল—মাতা গভীর জলের মৎস্যের ন্যায়। তিনি বৃদ্ধা। সংসারে অনেক ব্যাপারই তিনি দেখিয়াছেন এবং সংসারের অভিজ্ঞতাও তাঁহার মস্ত বড়। তাই তাহাকে তিনি বিশেষ সাবধান করিতেই সেই দিন সকালে গালাগালি করিয়াছিলেন।

সাধিকা যে যুবতী হইয়াছে, এ-ধারণা সে আজও করিতে পারে নাই। সে জানিত—এখনও সে সেই ময়না, এখনও সে সকলের কাছে সেই রূপ ছোট্টটিই আছে। কিন্তু আজ খাইতে বসিয়া সে হঠাৎ বুঝিয়া ফেলিল—না, তাহা ত নহে।

সেই রাত্রির ব্যাপার, যাহা তাহার মাতা হয় ত জানিতে পারিয়াছেন এবং সে-জন্যই হয় ত সেই দিন সকালে তাহাকে গালাগালি করিয়াছিলেন। ইহা কি বাস্তবিকই উপেক্ষণীয়? যদি তাহাই হইবে, তবে তদবধি বিমান-দা তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে কেন?

এই কথাগুলি মনে পড়িতেই সাধিকা আর খাইল না। এ-দিকে ঠাকুর আসিয়া সাধিকাকে বলিল—

দিদি-মণি! বাবুর কি হয়েছে? বাবু যে খেলেন না।

সাধিকার ভাবনা হইল—

উঃ! বড় ভুল হয়েছে। বিমান-দার খাওয়ার সময় সেখানে যাওয়া হয় নাই, তাই বুঝি তাঁর খাওয়া হল না।

—এগার—

কার্তিকচন্দ্রের কলিকাতায় আসিয়া বেশ বন্ধুটি জুটিয়াছিল। কার্তিক বন্ধুর বাড়ীতে খায়-দায়, নিজের মনে বেড়াইয়া বেড়ায়, আর তাহার কি স্ফূর্তি!

কার্তিকের এই রূপে দিন কয়েক বেশ কাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু এক-ঘেয়ে নিয়ম-বাঁধা জীবন তাহার কোন দিনই ভাল লাগিত না।

সে যখন দেশে ছিল, তখন তাহার প্রাণের বন্ধু নন্দের চাঁদের সঙ্গে সে প্রায়ই নূতন নূতন খেলার ফন্দি আঁটিত। আজ যদি সে নন্দের সঙ্গে নদী সাঁতরাইয়া দুরন্ত বাতাসে-চলা মস্ত বড় সাত-আট-মাল্লাই নৌকার দাঁড়ের দড়ি ধরিয়া টানিত, কাল সে তাহা করিতে আর পছন্দ করিত না; কাল হয় ত সে নব-গঙ্গার ভিতর ডুবান ডাল-পালা-ভরা একখানা মস্ত ডিঙ্গি বালতি অথবা বেতের ধামার সাহায্যে জল সেঁচিয়া টানিয়া তুলিত। যদি সেই নৌকার মালিক উহা দেখিয়া নৌকা ভাঙ্গিবে বলিয়া আপত্তি বা রাগ করিত, কার্তিকচন্দ্র অমনই তাহাকে বলিয়া উঠিত—

'দেখি, ডিঙ্গিখানা টেনে তুলতে পারি কি না।'

মালিক অমনি ঝাঁকিয়া বলিত—

যদি নৌকা ভেঙ্গে যায়?

কার্তিকও তদনুরূপ ক্রোধের সুরে উত্তর করিত—

ভাঙ্গলে ত ভাঙ্গবেই, তা আমি কি কর্ব? নৌকা ত কাঠের, লোহার ত নয়, আর একখানা গড়িয়ে নিও।

মালিক রাগে আর কোনও কথা কহিত না। কোন মতে অতি কষ্টে নৌকাখানা ইহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পুনরায় উহা ডুবাইয়া রাখিত।

কার্তিকচন্দ্র তাই এই রূপ অনভ্যস্ত জীবন অধিক কাল যাপন করা বিষম ক্লেশ-দায়ক মনে করিল, যদিও হৃষীকেশ-বাবু কার্তিককে খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে আন্তরিক যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। হৃষীকেশ-বাবুর ষোড়শী স্ত্রী কার্তিকচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখিতেন এবং সর্বদা তাহার আহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন ও স্বামীর সহিত প্রায়ই আলোচনা করিতেন—বেচারীর বউয়ের কি কষ্ট!

কার্তিক এই রূপ অ-প্রত্যাশিত আদর-যত্ন সত্ত্বেও আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকিতে যেন বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বিশেষতঃ আজ-কাল তাহার অত্যন্ত আক্রোশ হইয়াছে—হৃষীকেশ-বাবুর বন্ধু-গণ তাহার সহিত শুধু আলাপ করিতেই ভালবাসে কিন্তু বিমান বাড়ুয্যের খোঁজ করিয়া দেওয়ার বেলা কেহ নয়।

সে তাই এ-বাটীর সকলের এবং এ-বাটীর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের উপর বিশেষ চটিয়া গিয়াছে।

তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—

বিমান কি করে?

সে অমনি বলিয়া ফেলিত—জানেন না মশাই! আমার বিয়েতে সে লুচি ভেজেছিল। তারপর লুচি ভাজতে ভাজতে ঘিয়ের কড়ায় ঘি চাপিয়ে দিয়ে কি ভাবছিল, আর ঘিয়ে আগুন লাগিয়ে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল। এই দেখুন তার চিহ্ন।

এই বলিয়া কার্তিক তাহার পিঠের পোড়া দাগ সেই লোককে দেখাইয়া দিত।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তখন হয় ত বলিয়া উঠিতেন—

আপনি তা হলে বীর হ-নু—।

কার্তিক তখন সে-ভদ্র লোকের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিত—

দেখাতাম আপনাকে, থাকত যদি আমার সঙ্গে নদে।

ভদ্র লোক চুপ করিয়া যাইতেন।

হৃষীকেশ-বাবুর উপর কার্তিকের ক্রমেই রাগ হইতে লাগিল। আজ সে স্থির করিয়াছে—হৃষীকেশ-বাবু আফিস হইতে ফিরিলেই তাঁহার সঙ্গে সে ঝগড়া একটা না করিয়া ছাড়িবে না।

বেলা তখন চারটা। কার্তিকচন্দ্র উদাস নয়নে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। আজ বুঝি তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িয়াছে। সে মনে করিতেছে—যদি কলিকাতায় বিমানের সহিত দেখাই না হইল, তবে দৌলতপুর হইতে বাড়ী যাওয়াই ত ভাল ছিল। কত মাছ ধরা যাইত, নদে সঙ্গে থাকিত। এ-সময় ডোবায় কত মাছ!

ভাবিতে ভাবিতে কার্তিক পরিহিত কাপড় জানুর উপর তুলিল। কাছে একটি বেতের মোড়া ছিল। উহা হাতে লইয়া সে হৃষীকেশ-বাবুর বহির্বাটীর চৌবাচ্চার মধ্যে নামিয়া পড়িল। জলের কল হইতে সোঁ সোঁ করিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া উহার মুখ সে মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। ধারে চুপড়িতে যথেষ্ট মাটি না থাকায় তাহার ভয়ানক রাগ হইল।

অ-দূরে দো-তলার বারান্দায় তখন হৃষীকেশ-বাবুর ছোট ভাই দাঁড়াইয়া-ছিল। হঠাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া সে কার্তিককে জিজ্ঞাসা করিল—

ও কি করছেন কার্তিক-বাবু?

কার্তিক উৎসাহিত হইয়া জবাব দিল—

খোকা! কতগুলি মাছ।

খোকা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল—

কোথায় ?

কার্তিক বলিল—

এই ত খোকা ! দেখবে এস।

চৌবাচ্চায় কয়েকটি মাছ জিয়ান ছিল। কার্তিকচন্দ্র মহাস্ফূর্তিতে উবু হইয়া ঝপ-ঝপ করিয়া বেতের মোড়াটি জলের মধ্যে ফেলিয়া তাহাই ধরিতে লাগিল।

হৃষীকেশ-বাবুর ছোট ভাইটি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছিল না—কার্তিক-বাবু কি করিতেছেন। সুতরাং সে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার বৌ-দিকে ডাকিয়া আনিল।

বৌ-দি ! ঐ দেখুন—কি করছে।

বৌ-দি বলিলেন—কই ? কি ?

এ-দিকে কার্তিকচন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিতেছে—

খোকা, নেমে এস, আর ভয় নাই, নল ভাল করে বন্ধ করে দিয়েছি।

কার্তিকের আস্ফালন দেখে কে ! কিন্তু কি হইল ! একটু পরেই দেখা গেল, কলের জলের বেগে নলের ভিতরে-পোরা মাটি ধুইয়া বাহির হইয়া আরও জোরে জল পড়িতে লাগিল। কার্তিক বড়ই বিরক্তি বোধ করিয়া—খোকা ! খোকা।—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এ-দিকে খোকা হাসিয়া পড়ে বৌ-দির গায়ের উপর, বৌ-দি পড়েন দো-তলার রেলিংয়ের উপর।

কার্তিকচন্দ্র এই দুই জনের হাসি দেখিয়া বিষম চটিয়া গিয়া বলিতে লাগিল—

হেসো না বৌ-দি, হৃষীকেশ-বাবু এলে বলে দেব। বৌ-দি ! এই কটা মাছ নিন, এখন আর বেশী ধরতে পারলাম না। হৃষীকেশ-বাবুকে

ভেজে দেবেন। কাল সকালে আরও ধরে দেব, তখন আপনি খাবেন, খোকা খাবে। আমার না হলেও চলবে, দেশে কত মাছ খাই, আপনারা তা চোখেও দেখেন না।

কার্তিক মাছ ধরিল বটে, কিন্তু তাহার ভাবনা হইতে লাগিল—এ কূয়ায় মাছ এল কোথা থেকে? কূয়াটি আমাদের ডোবার দশ ভাগের এক ভাগও হয় কিনা সন্দেহ।

কার্তিক তখনই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—বড়-গঙ্গা অতি নিকটে, সেখানে স্নান করবার সময় পায়ে বেশ মাছ ঠোকরায়, এ-সব মাছ ঐ নল দিয়েই আসে।

কার্তিক মাছ ধরা শেষ করিয়া যখন গা ধুইতেছিল, তখন হৃষীকেশ-বাবু বাড়ী প্রবেশ করিলেন এবং কার্তিককে ভিজা কাপড়ে দেখিয়া মনে করিলেন—কার্তিক-বাবু কাপড় কেচে দিয়েছেন। তাই কোনও কথা না বলিয়া সরা-সরি বাটীর ভিতরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

কার্তিক এত ক্ষণ হৃষীকেশ-বাবুকে দেখে নাই, সহসা তাঁহার দিকে তাহার চোখ পড়িতেই সে বলিল—

হৃষীকেশ-বাবু! শুনুন।

হৃষীকেশ-বাবু থামিলেন—

কি?

কার্তিক উত্তেজিত স্বরে বলিল—

বলুন, ব্যবস্থা করবেন কিনা?

হৃষীকেশ-বাবু কহিলেন—

কি? না শুনে কি ব্যবস্থা করব?

কার্তিক আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল—

আমায় কি এখানে অপমান কর্তে রেখেছেন ?

হৃষীকেশ-বাবু মনে করিলেন—

খোকা হয় ত পাগল পেয়ে কিছু বলেছে।

তিনি জবাব দিলেন—কেন ? কে আপনাকে অপমান করেছে ?

কার্তিক গর্জিয়া উঠিল—

অপমান—হাঁ—অপমান—নিশ্চয়ই অপমান—। ভদ্রতা জানেন না ?

হৃষীকেশ-বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

ভেঙেই বলুন না—কি। শুধুই চীৎকার করছেন কেন ?

কার্তিক তেমনই গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—

কথা শেষ করতে দিন, ভদ্রতা জানেন না ? আমার কথা ভাঙব ? তবে ভাঙ্গি। অপমান করেছে আমায় আপনার স্ত্রী। উপর থেকে আমার মাছ ধরা দেখছিলেন বৌ-দি আর খোকা। আমি মাছ ধরে সেই মাছ আপনাকে ভেজে দিতে বল্লাম, তা তিনি সে-মাছ ছুঁলেনও না, ঐ দেখুন মাছ পড়ে।

হৃষীকেশ-বাবু অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন।

দো-তলার বারান্দায় হৃষীকেশবাবুর স্ত্রী উদগ্রীব নয়নে চাহিয়াছিলেন এবং হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না।

কার্তিকচন্দ্র বৌ-দিকে দেখাইয়া বলিল—

ঐ দেখুন হৃষীকেশ-বাবু ! এ অপমান, নিশ্চয় অপমান। সাধিকা আমার 'ওয়াইফ', সেও বেজায় সুন্দরী। সে কি মাছ ছোঁবে না ? হৃষীকেশ-বাবু ! নমস্কার। বৌ-দি ! নমস্কার। খোকা ! নমস্কার। এই আমি চল্লাম। সাধিকা আমার কষ্টের জিনিষ ফেলবে কি না—তাই জিজ্ঞাসা করতে চল্লাম। সাধিকাও যদি তাইই করে, তবে বুঝব—সেও

'বৌ-দি।' সব মেয়ে-লোকই 'বৌ-দি।' মেয়ে-জাত পুরুষের কষ্ট বোঝে না।

এই বলিয়া কার্তিকচন্দ্র এক বস্ত্রেই হৃষীকেশ-বাবুর বাটী হইতে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া পড়িল।

হৃষীকেশ-বাবু বিমূঢ়ের মত কিছু না বলিয়া না কহিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে নিস্তেজের মত আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে গেলেন। একে সওদাগরী আফিসের সারা দিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, তার পর এই আকস্মিক ব্যাপার, তাঁহার যেন পা আর দো-তলার সিঁড়ির কাছে পৌঁছায় না।

ও-দিকে কার্তিক বাহির হইয়া গেল দেখিয়া হৃষীকেশ-বাবুর পত্নী অতি দ্রুতপদে নীচে সিঁড়ির দিকে আসিয়াই স্বামীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—

হ্যাঁগা! ফিরুলে যে?

স্বামী বলিলেন—

কি করব?

পত্নী উত্তর করিলেন—

বল কি?—কি কর্বে! এই ঘোর সন্ধ্যায় কার্তিক-বাবু রাগ করে বেরিয়ে গেলেন, তিনি যদি না আসেন। না, না, তুমি যাও, দেখে এস—কার্তিক-বাবু কোথায় গেলেন। যাও, ছাতাটা আমার হাতে দাও। চাদরটাও দাও। আমি এই নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কার্তিক-বাবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকবে। যাও, শীগগির যাও।

স্বামী বলিলেন—

না, এক্ষুণি আসবে কার্তিক-বাবু। ও রাগ করেছে। মাথাটা খারাপ, রাগ পড়লে আপনিই আসবে।

স্বামী এই বলিয়া পত্নীকে বুঝাইলেন, কিন্তু পত্নী না-ছোড়-বান্দা। তিনি কিছুতেই স্বামীর কথা শুনিলেন না। স্বামীকে অবিলম্বে বাড়ী হইতে দরজা পর্যন্ত আনিয়া দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া নিজে সে-স্থানেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খোকা আসিয়া বৌ-দির অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইল।

স্বামী বাহিরে যাওয়া অবধি স্ত্রী বড়ই অ-স্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—স্বামী বাড়ী আসিয়া হাত মুখ পর্যন্ত ধুইতে পারেন নাই। তারপর তাঁহার অত্যধিক ক্ষুধা লাগিয়াছে। সেই সকালে ছুইটি নাকে মুখে গুঁজিয়া তিনি আফিসে দৌড়িয়াছিলেন।

এ-দিকে কার্তিক-বাবুর জন্যও তাঁহার অত্যন্ত চিন্তা হইল—যদি তিনি না আসেন, তবে এই কলিকাতা-সহরে নির্বান্ধবের মধ্যে কোথায় তিনি থাকিবেন?

পত্নী এই রূপ ভাবিতেছেন, এই সময় হৃষীকেশ-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

না—কার্তিক-বাবুকে পেলাম না। কোন দিক দিয়ে গেছেন, কোথায় খুঁজব?

পত্নী ক্ষুণ্ণ মনে স্বামী-সহ উপরে উঠিলেন।

খোকা জিজ্ঞাসা করিল—

দাদা! কার্তিক-বাবু এলেন না?

সন্ধ্যা হইয়া গেল।

* * * * *

কার্তিক হাঁটিতে হাঁটিতে হৃষীকেশ-বাবুর বাটি হইতে অনেক দূরে আসিয়া মনে মনে ভাবিল—

এই কলিকাতা সহরে এত আলো দেয় কোথা থেকে? দৌলতপুর-ষ্টেশনে মাত্র চারটি আলো, তাতেই কত তেল খরচ। বাড়ীতে তিনটি হ্যারিকেন সমান-ভাবে জ্বললে মা কত রাগ করেন।

কার্তিক ভাবিতেছে, আর হাঁটিতেছে। ক্ষণ-পরেই সে মনে করিল—

একটা লণ্ঠন খুলব—এতে কত টুকু তেল ধরে—দেখব? তা হলেই বুঝতে পারব রোজ কত তেল এই সব আলোতে লাগে, কারণ আমি শুভঙ্করী 'ফিফথ কেলাসে' পড়েছি।

কার্তিক একটি 'লাইট-পোষ্ট' বাহিয়া 'ল্যানটার্ন' খুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আলোটি নিবিয়া গেল।

চোর চোর—বলিয়া কয়েকটি লোক চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত-মধ্যে বহু লোক জমিয়া গেল।

কার্তিক বেশ একটি লম্ফ দিয়া একটি লোকের স্কন্ধে পড়িয়া গেল। 'আমি শুপারি গাছ বাইতে জানি না?'—বলিতে বলিতে সে দৌড়াইল। অদূরে একটি 'ট্রাফিক পুলিশ' টপ করিয়া তাহার গায়ের কোটটি ধরিয়া ফেলিতেই কোটটির পিঠের দিকে ছিঁড়িয়া গেল।

কার্তিক বলিল—

মশায়! আমায় ধরবেন ধরুন, তাতে আমার একটুও আপত্তি নাই, কিন্তু আমার কোট ছিঁড়লেন কেন? জানেন—এ-কোট আমায় বৌ-দি দিয়েছেন? কিন্তু মেয়েরা পুরুষের কষ্ট বোঝে না, তাই হৃষীকেশ-বাবুকে, বৌ-দিকে, খোকাকে নমস্কার করে বেরিয়েছি। সাধিকা আমার 'ওয়াইফ', বিমান ষ্টেশনে যায় নাই, আমার শ্বশুর-মশায় মরে মরে।

'ট্রাফিক পুলিশ'টি অবাক হইল।

রাস্তার লোকেরা বলিল—

'ছোড় দাও, উসকো ক্ষেপা হায়।'

'ট্রাফিক পুলিশ' বলিল—

নেহি, থানা মে যানে হোগা।

অগত্যা কার্তিকচন্দ্র থানায়ই গেল।

থানায় ঢুকিতেই কার্তিক দারোগাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

মশায়! এখানেও কি বৌ-দি আছেন নাকি?

দারোগা-বাবু চাহিয়া রহিলেন।

কার্তিক বলিতে লাগিল—

বৌ-দি থাকলে বলবেন—তিনি যেন হাসেন না। তিনি আমায় প্রাণ-পণে আদর-যত্ন করে যেন আমায় শেষে অপমান করেন না। মেয়ে-লোক পুরুষ লোককে সম্মান করবে, যদি সে অন্ত পুরুষ হয়। নদে তার বউকে এই শিক্ষা দিয়েছে। আমি দেখে নেব—সাধিকা বিমানের সঙ্গে আলাপ করে কি না। আপনি মশায়! বলতে পারেন বিমান কোথায় থাকে?

দারোগা-বাবু এই আসামীটিকে এ-রূপ অসম্বন্ধ আলাপ করিতে শুনিয়া সিপাহীকে বলিলেন—

যানে দেও।

সিপাহী বড়-বাবুর হুকুম-মত কার্তিককে বলিল—

যাও, ভাগো।

কার্তিক জ্বলিয়া উঠিল—

ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ কর্তে জানেন না?

দারোগা-বাবু তখন বলিলেন—

আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, যান।

কার্তিক বলিল—

আমি কোথাও যাচ্ছিলেম না। রাস্তায় আলোতে কত টুকু তেল এক রাতে খরচ হয়, তাই হিসেব করছিলাম।

দারোগা-বাবু বলিলেন—

যান, যান।

কার্তিক উত্তর করিল—

ভদ্রতা জানেন না?

থানার লোকেরা যেন একটি মজা পাইল এবং কার্তিককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানা রূপ রগড় করিতে লাগিল।

বড়বাবু সেই সময় সকলকে বলিলেন—

আঃ! কি যে করছেন! যেতে দিন।

কার্তিক দারোগাবাবুর উপর চটিয়া উঠিয়া বলিল—

মশায়! অর্থ-যুক্ত কথা বলুন।

দারোগা-বাবু আর কোন কথা না বলিয়া উপরে তাঁহার 'কোয়ার্টারে' চলিয়া গেলেন।

এই সময় হঠাৎ 'টেলিফোনের' ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কার্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া এ-দিক ও-দিক চাহিতে লাগিল—কোথা হইতে এই শব্দ আসিল। শেষে যখন সে বুঝিল—ঐ একটি ছোট্ট বাক্সের মধ্যে ঘণ্টা বাজিতেছে, তখন সে দৌড়াইয়া গিয়া 'টেলিফোন মেসিনটি'র ধারে দাঁড়াইয়া বলিল—

গাঙ্গুলী-মাষ্টারের ঘড়িটায় ঘুমও ভাঙ্গায়, কটা বাজে তাও তাতে লেখা আছে, এ-ঘড়িটা শুধু দারোগা-বাবুর ঘুম ভাঙ্গানর জন্যে। সে সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিতেই লাগিল।

ইত্যবসরে ছোট-দারোগা-বাবু কঠিন স্বরে বলিলেন—

এখান থেকে সরে যান। এ-থানা বুঝেছেন?

কার্তিক টপ করিয়া জবাব দিল—

জানেন—আমি সাধিকার 'হাজবেণ্ড'? আপনি ভদ্রতা জানেন না?

এত ক্ষণে থানার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট-দারোগা সিপাহীকে হুকুম দিলেন—

এ-লোকটিকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এস। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা।

কার্তিক বলিল—

আপনি মূর্খ কেন? আমায় বাড়ী পৌঁছাবার জন্যে কি এখানে এনেছেন?

ছোট-দারোগা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—

মশায়! আপনার ঠিকানা কি?

কার্তিক জবাব দিল—

ঠিকানাটাই ত খুঁজছি। বিমান কোথায় থাকে বলতে পারেন?

ছোট-দারোগা-বাবু এ-বারে বুঝিলেন—একে এই ভদ্র লোকের ছেলেটি মাথা খারাপ, তাহাতে আপনার লোকের ঠিকানা জানে না, বা হারাইয়াছে। এখন ইহাকে কোথায় পৌঁছাইয়া দিই। [illegible]নি উহার বি[illegible] বুঝিলেন এবং কিছু চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কার্তিক তখন নিজের মনে তাহার সুর ভাজিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ কাটিয়া গেলে ছোট-দারোগা-বাবু বলিলেন—

চলুন আমার সঙ্গে।

কার্তিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—

বিমানের বাড়ী নিয়ে যাবেন?

ছোট-দারোগা-বাবু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন—

চলুন ত।

কার্তিক সোৎসাহে পথ চলিতে চলিতে ছোট-দারোগা-বাবুকে বলিলেন—

দেখুন, নদের চাঁদকে বোধ হয় নিশ্চয়ই চেনেন। তাতে আর আমাতে এক দিন টৌনার চরে বাহু-ধরা-ধরি করেছিলাম। তার সঙ্গে আমার সেই দিন থেকে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তবে নদে তার বাড়ীর সকলকে লুকিয়ে তামাক খেত, আমি তাতে তাকে বলতাম—নদে! এ তোর চুরি করা হচ্ছে না? নদে আমায় বলত—দূর বোকা! কার্তিক! এ যে গুরু জনকে মান্য করা হচ্ছে, তাদের সামনে তামাক খেতে নাই। আচ্ছা, বলুন ছোট-দারোগা-বাবু! আপনি ত বড় মামার চেয়ে বিদ্বান। তাঁর নাম ব্রহ্মাণ্ডনাথ, 'ইউনিয়ন বোর্ডের' 'প্রেসিডেন্ট'। বড়-মামা 'ফোর্থ কেলাসে' যে নিশ্চয়ই পড়েন নাই, তার আমি স-ঠিক প্রমাণ পেয়েছি। বলুন, কোনটা বেশী পাপ? চুরি করা না গুরু জনকে অমান্য করা?

ছোট-দারোগা-বাবু কার্তিকের এ-রূপ অ-সামঞ্জস্য কিন্তু যুক্তি-পূর্ণ আলাপে কান রাখিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। কার্তিকচন্দ্র হঠাৎ থামিয়া পড়িল। ছোট-দারোগা-বাবু ডাকিলেন—

'আসুন'।

কার্তিকচন্দ্র ছোট-দারোগা-বাবুর কথায় কর্ণ-পাত না করিয়া সহসা একটি দর্জির 'দোকানে ঢুকিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং চীৎকার করিতে লাগিল—

ছোট-দারোগা-বাবু! শুনুন, শুনুন, একটা ভাঙ্গা কলের গানে গান গাইছে।

সে আরও চীৎকার করিয়া দোকানদারকে বলিল—

মশায়, আপনাদের কি বিমানের চেয়ে অবস্থা খারাপ ?

দর্জি-দোকান-ওয়ালা কিছু না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। কার্তিকচন্দ্র বলিতেই লাগিল—

এত পয়সা দিয়ে মশায় দোকান করেছেন, একখানা 'রেকর্ড' কিনতে পারেন না ? একটা ভাঙ্গা 'মেসিন' ঘরে রেখে লোককে দেখাচ্ছেন— আপনার 'গ্রামোফোন' আছে।

ছোট-দারোগা-বাবু তাড়া-তাড়ি কার্তিকের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিলেন—

আসুন মশাই ! রাত অনেক হয়েছে।

কার্তিক জবাব দিল—

ছোট-দারোগা-বাবু ! ভয় দেখাচ্ছেন কি ? হৃষীকেশ-বাবুও আপনার মত আমায় তাড়া-হুড়া করেছিলেন। কিন্তু কই ? আমায় নিয়ে তার বৌকে ত না দেখিয়ে পারলেন না ! বৌ-দি আমায় কত ভালবাসেন।

কার্তিকচন্দ্র শেষে 'রেডিও মেসিনের' নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ছোট-দারোগা-বাবুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

—বার—

আজ-কাল বিমান যেন সাধিকার পায়ে-পায়ে চলে। সাধিকা যেখানে, বিমান সেখানে। আজ ঘুম হইতে উঠিয়া সাধিকা একটু ছাদে বেড়াইতে গিয়াছে, বিমানের সেখানে মহাদরকার পড়িয়াছে, সেও ছাদে উঠিয়া কত আদর-আপ্যায়িত করিয়া সাধিকাকে বলিতেছে—

ময়না! ঐ দেখ—কত নৌকা ভেসে যাচ্ছে, কত লোক 'ফেরি-ষ্টিমারে' এ-পার ও-পার হচ্ছে।

সাধিকা বিমানের কথায় বিশেষ সায় না দিয়া, চুপ করিয়া, ছাদের আলিসায় বুকের সমস্তটা ঠেকাইয়া নীচে মাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। বিমান অমনই সাধিকার পাশে গিয়া, ঠিক তাহার মত দেওয়ালে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছোট্ট মাঠটির অপর পার্শ্বস্থ 'ফুট-পাথের' উপর দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—

ময়না! দেখেছ—কত মেয়েরা আজ গঙ্গা-স্নানে যাচ্ছে, আজ কি কোন পরব?

ময়না বিমান-দার কথায় বলিয়া উঠিল—

পরব না তোমার মাথা।

বিমান তাই সাধিকার একটি কথায় উত্তর পাইয়া, তাহার মাথাটি আস্তে ধরিয়া, নীচু করিয়া, নিজের দিকে ঘুরাইয়া বলিল—

তবে অত লোক যায় কেন?

ময়না বিমান-দার প্রতি চোখ বাঁকাইয়া তাহার কথার প্রত্যুত্তর দিল—

ধ্যানের ছবি

রোজই ত গঙ্গায় অমন কত লোক সকাল বেলা স্নান কর্তে আসে। আজ নূতন কি ?

এ-বারে বিমান সাধিকার মুখটি জোরেই চাপ দিয়া বলিল—

আমার কথায় জবাব ?—না— ? বড় দুষ্ট হয়ে চলেছ।

সাধিকা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—

বিমান-দা ? ছোট-বেলা থেকেই আমি তোমার বকুনি খেয়ে আসছি, কিন্তু তা মনে থাকে না। ছাই ! তা ভুলে যাই আজ-কাল আরও বেশী। আমার মুখ যেন এখন বড্ড বেড়ে গেছে।—না— ? আমি আর ও-রূপ করব না।

এই বলিয়া সাধিকা নীচে নামিয়া গেল।

ক্ষণ-পরেই বিমান সাধিকাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল—

ময়না ! আমায় খেতে দিয়ে যাও।

বিমান আজ-কাল ময়নাকে 'তুমি' বলিয়া কথা বলে।

সাধিকা ঝিকে দিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—

দুর্গা ! যা—বিমান-দার কাছে শুনে আয়—উনি কি খাবেন ?

বিমান ঝিয়ের প্রশ্নের জবাব দিল—

কি ?—আছে কি ?

দুর্গা বলিল—

তা ত আমি জানি না বাবু !

বাবু অমনই ভীষণ চটিয়া মনের আক্রোশটা ঝির উপরই মিটাইয়া লইল।

তবে তুই এসেছিস কেন ?

ঝি ভয়ে ভয়ে গিয়া দিদি-মণিকে বলিল—

যাও দিদি-মণি ! তুমি যাও। বাবু আমার কথায় শুধু রাগ করেন।

দিদি-মণি তাই বাবুর ঘরে গেল।

ময়নাকে দেখিবা মাত্র বিমান গম্ভীর-ভাবে বলিল—

আমি পরোটা, বেগুন-ভাজা, আর শেষে এক 'কাপ' চা খাব।

সাধিকা জবাব দিল—

বিমান-দা, ঠাকুর ত এখনও আসে নি, এ-ঠাকুরটা বড় দেরী আসে।

বিমান বলিল—

বেশ। ঠাকুর আসে নি, তবে আমার খাওয়া হবে না? ঐ 'ষ্টোভ', 'স্পিরিট' ঐ বোতলে, 'কেরোসিন' ওখানে।

সাধিকা অগত্যা 'ষ্টোভ' ও তাহার সরঞ্জাম এবং আবশ্যকীয় জিনিষাদি তুলিয়া দো-তলায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিমান বলিল—

আমি 'ষ্টোভ' নিয়ে যেতে দেব না। 'ষ্টোভ' এঁটো হয়ে যাবে।

সাধিকা জবাব দিল—

তোমার কত এঁটোর বিচার!

বিমান কহিল—

তা না থাক, তুমি 'ষ্টোভ' জ্বালাতে চাও, এখানে বসে জ্বাল, নইলে খাবার তৈরীর দরকার নাই।

সাধিকা বলিল—

বিমান-দা! সত্যি বলছি—'ষ্টোভ' এঁটো হবে না।

এই বলিয়া সাধিকা 'ষ্টোভ' লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিমান তখন তক্তপোষের উপর দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল। সে এক লম্ফ দিয়া নামিয়া আসিয়া সাধিকার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—

না, আমি 'ষ্টোভ' তোমায় নিজে নিজে জ্বালতে দেব না, শেষে 'ষ্টোভ' যদি 'বার্ষ্ট' করে।

সাধিকা 'ষ্টোভ'টি হাতে করিয়াই বলিল—

না, না, পুড়ে মর্ব না। পুড়ে মরলে ত বাড়ীতে যে-দিন আগুন লেগেছিল, সেই দিনই মরতাম।

বিমান জবাব দিল—

অত বুড়োমি কর্তে হবে না, এখানে বসে 'ষ্টোভ' জ্বাল।

এ-দিকে সাধিকা 'ষ্টোভ' লইবেই, ও-দিকে বিমান তাহা দিবে না। তাই দুই জনে বেশ কাড়া-কাড়ি লাগিয়া গেল। কিন্তু সাধিকা বিমানের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন? বিমান এক টানে সাধিকার হাত হইতে 'ষ্টোভ'টি ছাড়াইয়া লইয়া তক্তপোষের উপর রাখিয়া বাম বাহুতে সাধিকার পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া ডান হাত দিয়া সাধিকার মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—

বল, বল ময়না! আর কখনও আমার কথা অমান্য করবে?

বিমান সাধিকা অপেক্ষা লম্বা, সাধিকা বিমান অপেক্ষা কিছু খাট, সাধিকার মুখখানি বিমানের কণ্ঠ-দেশের ঠিক নীচেই ছিল, এবং বিমানের মুখখানি ঝুঁকিয়া একেবারে ময়নার মুখের উপর পড়িল। ময়না তাহার দেহখানি বিমান-দার শরীরের উপর এলাইয়া দিয়া বলিল—

বিমান-দা! ছাড়, ছাড়, দুর্গা এসে পড়বে। আঃ! কি করছ!

বিমান বলিল—

না, আমি ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দিই, তুমি দিন-দিনই দুষ্টু হতে চলেছ, আজ-কাল মোটেই তুমি আমার কথা শোন না। বল, ময়না! শুনবে? বল, শুনবে? আর কথার অবাধ্য হবে না? ঠিক?—ঠিক?

সাধিকা নিরুপায় হইয়া বলিল—

বিমান-দা! তুমি তারী……। মা এসে পড়বে। মার বোধ হয় জ্বর ভেঙেছে। বিমান কিছুতেই সাধিকাকে না ছাড়িয়া ক্রমে দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

না, ময়না! মার জ্বর ছাড়ে নি, তিনি ঘুমুচ্ছেন। এখন তিনি উঠবেন না। দুর্গা নীচে বাসন মাজছে। ময়না! বল এখানে বসে পরোটা করবে? বেগুন-ভাজা, চা তৈরী করবে?

সাধিকা বলিল—

হাঁ, করব।

বিমান তখন ময়নার মুখখানি আরও দুই তিন বার হাতে টিপিয়া, স-তৃষ্ণ-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া, ময়নাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—

দাঁড়াও। এখনই ময়দা, ঘি, দুধ, সব আনিয়ে দিচ্ছি। তুমি যেতে পারবে না। বিমান তখন জোরে হাঁক দিল—

দুর্গা! শুনে যা।

দুর্গা আসিলে বিমান তাহাকে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া জিনিষের ফর্দ দিয়া দিল। দুর্গা দোকানে চলিয়া গেল। দোকানে যাইবার পথে ঝি বুড়ী দুর্গা বিড় বিড় করিতে লাগিল—

এরা বলে ভাই-বোন। দিন রাত্তির আছেই জড়াজড়ি।

দুর্গা চলিয়া গেলে বিমান সাধিকাকে তাহার কামরায় রাখিয়া নিজে বাহিরে গিয়া ঐ কক্ষের শিকলটি বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল—

যাই, কাকিমাকে দেখে আসি। দেখি তিনি ঘুমুচ্ছেন কি না?

সাধিকা তক্তপোষের উপর উত্তর মুখ করিয়া বসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে যেন তখন কি-রূপ ভাব খেলিতেছিল! সে আস্তে আস্তে তাহার জীবনের পুরাতন দিনগুলি অঙ্কের মত কষিতে লাগিল। সেই

কালিমার শৈশব অবস্থা! কতই না সে তখন আদরের পুতুলী ছিল। সেই বাল্য, তাহার মধুময় জীবন! মায়ের তাড়না তখন হইতে আরম্ভ, কিন্তু বাবার স্নেহ তখন হইতে তাহাকে আবেষ্টনীর মধ্যে রাখিয়াছিল। সেই কৈশোর—এই বিমান-দা তখন হইতে কতই না ভালবাসিয়া আসিয়াছে, কত মার-ধর তাহাকে করিয়াছে। যখনই কোনও পড়া অথবা গান গাইতে সে পারে নাই, তখনই বিমান-দা এই মুখখানি টিপিয়া আর কিছু রাখে নাই। আবার কত খাবার, কত খেলনা বিমান-দা কিনিয়া দিয়াছে।

তখন ত এ-রূপ মন খারাপ হইত না। কিন্তু এখন কেন এমন অ-স্বাভাবিক পরিবর্তন? এ-শাসনে কেন ব্রীড়া আসে। মনে ভয় হয়, পাছে কেউ দেখিয়া ফেলে। আর বিমান-দার শাসনেও আজ-কাল যেন সঙ্কোচ আসিয়াছে। আমি ত কোন দিনই বিমান-দার কথার অবাধ্য হই নাই। আমি তাহার অবাধ্য হইলে মাও ত কোন দিন আমায় ভাল বলিতেন না। বাবাও ত ভীষণ রাগ করিতেন।

সাধিকা এ-রূপ কত-কি চিন্তা করিতে লাগিল, ইত্যবসরে বিমান ঝন করিয়া ঘরের শিকল খুলিল এবং ময়দা প্রভৃতি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সাধিকা ময়দা লইয়া ছানিতে লাগিল। বিমান 'ষ্টোভ' ধরাইতে ধরাইতে বলিল—

ময়না! কাকীমা খুব ঘুমুচ্ছেন, আমি দরজার আড়াল থেকে অনেক ক্ষণ ধরে দেখলুম। জ্বর এখনও ছাড়ে নি।

সাধিকা চুপ করিয়া মাথা গুঁজিয়া তাহার কাজই করিতে লাগিল। কিন্তু অজস্র ধারে অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িয়া উত্তোলিত জানুর কাপড় ভিজাইয়া দিল।

বিমান কত ক্ষণ নিজের মনেই নাচিতেছিল। সহসা সাধিকাকে নীরবে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল—

ময়না! তোমার 'কার্পেটে'র শিবটি আজ দোকানী দেবে বলেছে। বেশ বাঁধান হয়েছে। আজ বিকেলে তাই এনে দেব।

সাধিকা বিমানের কোন কথা লক্ষ্য না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল, এবং স-জল নয়নে পরোটা ভাজিতে লাগিল।

বিমান এত ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

ময়না! তোমার কাপড়খানা আজ ছেড়ে দিও, সেমিজটাও খুলে দিও, ও-বেলা 'ডাইং-ক্লিনিং'এ দিয়ে আসব। আমার বাক্সের ভিতর এক জোড়া লাল মস্ত বড় কস্তা পেড়ে সাড়ী আছে ও ভাল ছিটের সেমিজ আছে, দুটোই দিশী—তাই পরো। নাও, ময়না! এক্ষুনি বার করে দিচ্ছি।

এই বলিয়া বিমান তাহার বাক্সের মধ্য হইতে উহা বাহির করিয়া সাধিকাকে বার বার দেখাইতে লাগিল।

সাধিকার অশ্রু যেন ক্রমেই দর-দর বেগে বাহির হইতে লাগিল। সে বলিয়া ফেলিল—

বিমানদা! তুমি মার অসুখের জন্যে যেন বেশী 'কেয়ার' করছ না। এত দিন জ্বর হয়েছে, জ্বর ছাড়ছে না। কই? তুমি ত কিছুই যেন ভাবছ না, বা তার কোনও তদ্বির করছ না। তুমি শুধু আজ-কাল দেখছ, মা ঘুমিয়ে থাকেন কি না?

বিমানচন্দ্র সাধিকার কথায় খোঁচা খাইয়া অপ্রস্তুত হইল। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—

ময়না, কাকীমা সেরে উঠবেন। ঐ ত অষুধ এনেছি। বিপিন-বাবু বড় ডাক্তার—মেডিকেল কলেজের পাশ। আজ বৈকালে গিয়ে তাঁকে আনব।

তখন তোমার কাণের 'টাব'টাও স্যাঁকরার দোকান থেকে নিয়ে আসব।

এত ক্ষণে খাবার প্রস্তুত হইয়া গেল। সাধিকা বলিল—

বিমান-দা! খেয়ে নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিমান বলিল—

তোমার চা কই? আমি এতগুলি খেতে পারব না।

সাধিকা কহিল—

না, খুব পার্বে। এই ত আমার জন্ত রইল।

বিমান একে একে তাহার পরোটাগুলি গণিয়া দেখিল—সাতখানা পরোটা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, চা ও বড় এক 'কাপ'। সে কহিল—

ময়না! আমার অনেক দূর যেতে হবে, আর ফিরতেও অনেক দেরী হবে, ও দুখানা পরোটাও আমায় দাও, চা সব টুকুই ঢেলে দাও, তুমি চা পরোটা বানিয়ে খেও। বেগুন-ভাজা দেখি মাত্র চার খানা করেছ।

ময়না অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল—

তাই নাও। বিমান-দা! আমি বানিয়েই খাব।

এই বলিয়া ময়না বিমানের থালায় ও 'কাপে' সমস্তই দিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তখনই বিমান খপ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল।

সাধিকা বলিল—

বিমান-দা! আমি দুর্গার কাছ থেকে ময়দা-টয়দাগুলি নিয়ে আসি।

বিমান বলিল—

তোমার চালাকি আমি বুঝি, তুমি কাকীমার কাছে পালাবে, আর ফিরেই আসবে না। ময়না! দুর্গা যা-যা এনেছিল, সবই এই। এই

বলিয়া বিমান ময়নাকে টানিয়া নিজের কোলের কাছে বসাইয়া তাহার দুই গালে দুইটি চড় আস্তে দিয়া—ময়না! এই থেকে খা। দুষ্টু কোথাকার! আমায় সবগুলো ধরে দেওয়া হয়েছে? আমি অতগুলি খেয়ে থাকি?—এই বলিয়া বিমান-দা ময়নাকে একেবারে সাপটিয়া জড়াইয়া ধরিল ও তাহার চিবুক দিয়া ময়নার স্কন্ধ-দেশ চাপিয়া বলিল—

ময়না! লক্ষ্মী আমার! আমায় খাইয়ে দাও।

ময়না বিশেষ ত্রস্তা হইয়া উঠিল। সে যতই জোর করিতে লাগিল, বিমান ততই তাহাকে কাছে রাখিতে চেষ্টা করিল।

ময়না বলিল—

আঃ! ছাড় বিমান-দা! তুমি বড্ড ত্যক্ত কর।

বিমান বলিল—

ময়না! তুমি আমায় খাইয়ে দাও, আমি তোমায় খাইয়ে দিই।

এই বলিয়া বিমান ময়নার মুখের ভিতর এক গোছা পরোটা গুঁজিয়া দিল। ময়না স্পষ্ট কথা বলিতে না পারিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল—

গলায় আটকে যাবে। আমি খাচ্ছি। আমি নিজেই খাচ্ছি।

বিমান তখন তাহার মুখ ছাড়িয়া দিল। পরোটার যে টুকরাগুলি তাহার মুখের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

বিমান-দা! আমায় ছাড়। ঝিটা বড্ড শেয়ানা। এসে পড়বে, আমি তোমায় খাইয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া সাধিকা নিজেকে মুক্ত করিয়া মেঝের উপর বসিয়া এক একখানা পরোটা ছিঁড়িয়া বিমান-দাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। বিমানের হাতে যে টুকরা ছিল, সে তখন আর তাহা নিজ-হাতে খাইল না।

সাধিকা নীচে গিয়া দেখিল—মা তখনও জাগে নাই। সে ধীরে ধীরে মায়ের পাশে গিয়া মাকে ডাকিল—

মা! ওঠ। এত ঘুমুলে তোমার জ্বর ছাড়বে কেন?

মা উঠিলেন। মেয়ে তখন মাকে নিজ-হাতে মুখ ধোয়াইয়া কাপড় ছাড়াইয়া তাঁহার আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিল।

মাতা আহ্নিকাদি শেষ করিয়া গোটা কতক আঙ্গুর ও বেদানার দানা খাইলেন। কিন্তু ঔষধ মুখে তুলিলেন না।

কিছু ক্ষণ পরে বিমান এক জন বৃদ্ধ কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মনে করিয়াছিল, বিপিন-ডাক্তারকে আনিবে, কিন্তু পরে ভাবিল, কাকীমা হয় ত বৈদ্যের ঔষধ অধিক পছন্দ করিবেন।

কবিরাজ-মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া ইন্দুমতী ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া বসিলেন। সাধিকা মায়ের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

কবিরাজ-মহাশয় তক্তপোষের এক ধার হইতে ইন্দুমতীর বাঁ হাতখানা চাহিলেন। রোগিনী হাত আগাইয়া দিলে তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—

হৃৎপিণ্ড অ-স্বাভাবিক দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। দুশ্চিন্তা কমাইতে হইবে এবং সুনিদ্রার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কবিরাজ-মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে ইন্দুমতী ঔষধ খাইলেন এবং তাঁহার পথ্যাদি করা শেষ হইলে বিমান কাকীমাকে নিদ্রা যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল। সে বলিল—

কাকীমা! কবিরাজ-মহাশয় বলেছেন, এই ঔষধ খেলেই ভাল হয়ে যাবেন। আপনি কোনও চিন্তা কর্বেন না।

বেলা তখন দুইটা। বিমান আহারাদি শেষ করিয়া তাহার কামরা

শুইয়া আছে। সাধিকা মায়ের কোলে শুইয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে। ইতিমধ্যে ঠাকুর গলা খাট করিয়া ডাক দিয়া বলিল—

দিদি-মণি! সব ঘর সারা হয়েছে, আপনি খেতে আসুন, কর্তা-মা এখন একটু ঘুমিয়েছেন।

দিদি-মণি ঠাকুরের ডাকে তে-তলায় রান্না-ঘরে খাইতে গেল। ঠাকুর বলিয়া গেল—যদি কিছু লাগে, ও-পাশে গামলায় আলাদা করা রইল, আপনি নেবেন, যা পড়ে থাকবে, দুর্গা খাবে।

ঠাকুর এই বলিয়া চলিয়া গেল।

রান্না-ঘরের সম্মুখের দরজাটা বিমানের প্রকোষ্ঠের ঠিক সামনা-সামনি। রান্না-ঘরটি দো-তলায় দক্ষিণ দিকে ছিল এবং তে-তলা হইতে ঐ ঘরে যাইতে একটা খাড়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যাইতে হইত। দো-তলা হইতেও রান্না-ঘরে অবশ্য যাওয়া যাইত, সে পূর্ব দিক দিয়া। ইন্দুমতীর কামরার পূর্ব দিকে অন্য একটি প্রকোষ্ঠ, তাহার পূর্বে একটা অ-প্রশস্ত বারান্দা ছিল, উহা দিয়া যাইতে হইত।

ঠাকুর দিদি-মণিকে এই সমস্ত কথা বলিয়া তে-তলায় ছাদে আসিয়া বাবুকে বলিল—বাবু! আমি যাই, সব সারা হয়েছে, দিদি-মণি খেতে বসেছে, দুর্গা-মাসি কোথায় যেন গেছে।

এই বলিয়া উৎকল পাচক উড়ে-বাংলা-বিমিশ্রিত ভাষায় মনিবের সকাশে ঝি দুর্গা-মাসিকে যথেষ্ট নিন্দা-বাদ করিয়া চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় সে পুনরায় দিদি-মণিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেল—বাইরের দরজাটা যেন তিনি নিজেই দিয়ে আসেন, দুর্গা-বেটী বড়ই অ-সাবধানী, কিছুতেই তাহার খেয়াল নাই।

আহারাদি শেষ করিয়া সাধিকা রান্না-ঘরের দরজাটায় শিকল দিতো তখন বিমান আসিয়া বলিল—

ময়না ! শোন।

ময়না বলিল—

বিমান-দা ! আমি এখন যেতে পার্ব না, মার গায়ে হাত বু দিতে হবে।

বিমান উত্তর করিল—

ময়না ! বড্ড দরকার, শোন। আমার যেন কেমন গা বমি কচ্ছে। ময়না ! একটু জল দিয়ে যাও।

সাধিকা হঠাৎ বিমানের গা বমি-বমি কর কথা শুনিয়া এবং চাওয়ায় একটি কাঁসার গেলাসে করিয়া জল আনিয়া দিল।

বিমানের মাথাটা বাস্তবিকই ঘুরিতেছিল, হঠাৎ কতকটা বমিও গেল। সে যেন অত্যধিক অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে বলিল—

ময়না ! কাকীমা ত ঘুমুচ্ছেন, তুমি এ-সময় এখানে বসে চুলটা ফেল। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

সাধিকা চুল-বাঁধার কথা শুনিয়া বলিল—

হাঁ, আমার কত আনন্দের দিন বয়ে যাচ্ছে। বাবা এক মাসও নাই, মাও যাত্রা করেছেন, আরও নানা দিক দিয়ে কত সুখ ধ এখন ত আমার চুল না বাঁধলেই নয় !

বিমান অসুস্থতার মহড়াটা আরও বেশী করিয়া বলিল—

ময়না ! আমায় চেন ত, আমি যা বলব, তা তোমার কর্তে হ তবে তা জেনে কেন আপত্তি কর ?

সাধিকা বলিল—

বিমান-দা! তোমার "পল্লী-সংস্কার" কোথায় গেল? সে বড় বড় কার্য-সূচী—পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা-বর্জন-প্রস্তাব, নারী-প্রগতি আন্দোলন, বাল্য-বিবাহ-প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-সমস্যা প্রভৃতি কি উড়ে গেল? সে লম্বা বক্তৃতা কি একটি দীন, অ-সহায়, নিরবলম্ব্য পরিবারের একটা বাড়-বাড়ন্তা বিবাহিতা মেয়ের দেহের যৌবনে ডুবে গেল? হায়! দেশের এই না অবস্থা! বিমান-দা! তোমায় আমি ক্রমেই ভাল করে চিনছি।

বিমান-দা! তুমি কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? এ-কয়েক দিন দেখছি, বাড়ী থেকে মোটেই বেরোও না। যাও, চাকরি নষ্ট করো না। তুমিও বাইরে যাও, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

বিমান কিছু কাল যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। মানুষের দেহের শিরার মধ্যে কোনও বিশেষ রোগের জীবাণু যখন বসবাস করিয়া বিশেষ প্রসার লাভ করিয়া সানন্দে রক্ত-কণিকার সহিত বিচরণ করিতে থাকে, তখন যদি ঐ রোগের প্রতিষেধক কোনও ঔষধ সূচিকা-সাহায্যে শিরা-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়, সেই মুহূর্তে ঐ ব্যাধি-জীবাণুগুলি যেমন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কতকগুলি মরিয়া যায়, সাধিকার সেই উক্তিতে সেই রূপ বিমানচন্দ্রের হৃদয়ের ভিতরের সমস্ত মোহের বীজাণুগুলিরও অকস্মাৎ কিছু ধ্বংস-সাধন হইল, কিন্তু তাহাতে ব্যাধির সম্যক্ বিনাশ হইল কি? সে মনে মনে বলিল—

চুলোয় যাক পল্লী-সংস্কার—চুলোয় যাক কলেজ, চুলোয় যাক চাকরি—

সে বলিল—

আমার অসুখ বলে এক হপ্তা ছুটি নিয়েছি। ও-সব বাজে কথা রেখে দাও। ময়না! আমি যা বলি, তুমি তাই কর।

ময়না জবাব দিল—

যদি না করি ?

বিমান কহিল—

তা হলে বুঝবে।

সাধিকা উত্তর করিল—

আমাকে ও মাকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে—এই ত ? বে[illegible] তা দাও, মাকে আমি একটা গাড়ী করে কবি[illegible]-হাঁসপাতালে নি[illegible] যাব, আমি তাঁর শুশ্রূষা কর্ব।

বিমান ময়নার কথায় খোঁচা খাইয়াও নিজের সুর বজায় রাখিল।

তখন ময়না অতি শীঘ্র নীচে দো-তলায় নামিয়া গিয়া তাহার চুল বাঁধ[illegible] সাজ-সরঞ্জাম লইয়া পুনরায় উপরে আসিল এবং তে-তলায় বিমানের ঘ[illegible] ঢুকিয়া মাঝখানে মেঝেয় বসিয়া পড়িল।

বিমান বলিল—

ময়না ! ও-ধূলায় বসো না, উপরে এস। ময়না সে-মুহূর্তে বিমা[illegible] তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিল ; বিমান তখন ময়নার পাশে কাৎ [illegible] তাহার চুল-বাঁধা দেখিতে লাগিল।

সাধিকা সাদা-সিদে রকমে চুল বাঁধিল না, কারণ [illegible] সহ্য হইবে না। সে তাই হাজার-এড়াইবার জন্য আধুনিক [illegible] বাঁধিল।

বিমান তখন তাহার বাক্স হইতে সেই নূতন [illegible] বাহির করিয়া দিল।

সাধিকা বলিল—

[illegible]গুলিও পরতে হবে নাকি ?

বিমান উত্তর করিল—

হাঁ। তখন সাধিকা পরিবার জন্ম কাপড় সেমিজ ইত্যাদি লইয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতে উপক্রম করিল। বিমান তৎক্ষণাৎ খপ করিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিয়া বাক্স হইতে আলতার শিশি খুলিয়া নিজেই তুলি দিয়া সাধিকার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতে লাগিল।

সাধিকা অ-চেতনের স্থায় নির্বাক, নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতে সেই কাপড়, সেমিজ, ও অন্ম সব। সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিল।

আলতা পরান শেষ হইলে বিমান বলিল—

ময়না! তোমার পায়ে ত ধরেছিই, তুমি একটু বসবে?

ময়না বসিল—

বিমান নিজ হাতে 'স্নো'য়ের শিশি হইতে 'স্নো' বাহির করিয়া খুশী-মত ময়নার মুখখানি সাজাইয়া দিল।

বিমানের সজ্জা শেষ হইলে সাধিকা বলিল—

বিমান-দা! দয়া কর। বাইরে থেকে কাপড়খানা ছেড়ে আসি? কিন্তু বিমান-দা! এই সাজে সেজে আমি কেমন করে মায়ের কাছে যাব?

ইতিমধ্যে কে যেন সদর দরজায় আসিয়া অতি জোরে হাঁকিতে লাগিল—

সাধিকা! সাধিকা!

সাধিকা তৎক্ষণাৎ বিমানের দৃষ্টি হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া তাড়া-তাড়ি সেই নূতন সেমিজ ও কাপড় পরিয়া রওনা হইল।

সেই ব্যস্ত মুহূর্তে বিমান খপ করিয়া ময়নাকে আগলাইয়া ধরিয়া বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চকিতে তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন বসাইয়া দিল।

সাধিকা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে তাই উহার অসহ্য দহন লইয়া তর-তর বেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া যাহাকে দেখিল, তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইল না—

এ সে কাহাকে দেখিতেছে।

—তের—

সাধিকা যে-রূপ বেগে তে-তলা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া এক-তলার সদর দরজা খুলিয়াছিল, সেই রূপ বেগেই সে আবার এক-তলা হইতে দো-তলায় গিয়া পৌঁছিল এবং থস-থস শব্দে মায়ের তক্তপোষের উপর বসিয়া নিদ্রিতা মাতার গায়ের উপর হাত তুলিয়া দিল।

মাতার সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই মেয়ের এই নব সজ্জা, এই নবীন কান্তি তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি বুঝিলেন না—ময়না কি বলিতেছে বা কি চাহিতেছে। তিনি কোন উচ্চ-বাচ্য না করিতেই ময়না বলিল—

মা! ওঠ।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেন?

মেয়ে নীরব থাকিল।

ক্ষণ-পরেই শোনা গেল—নীচের কল-ঘরে যেন ডাকাত পড়িয়াছে। তবে ডাকাতটির কণ্ঠ-স্বর যেন মধুর, অতি মধুর।

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—

নীচে চেঁচা-মেচি কচ্ছে কে?

সাধিকা বলিল—

ওঠ না—

ইন্দুমতী উঁ উঁ করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন।

সাধিকা যেন কুঞ্চিত হইতে হইতে একেবারে কুঁচকিয়া ইন্দুমতীর সম্পূর্ণ পেছনে গিয়া বসিল। তাহার বক্ষঃস্থল দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। ইত্যবসরে বিমান নীচের তলার চীৎকারে এবং সাধিকা গিয়া

আর ফিরিয়া আসে না দেখিয়া নিজেই নীচে দো-তলার সিঁড়ির দরজা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কে? কে ওখানে? কে চীৎকার কর্ছে?

কার্তিকচন্দ্র এ-বার বুঝিল—ওটা সিঁড়ি নয়, ওটা কল ঘর। সে এত ক্ষণ উপরে উঠিবার সিঁড়ি খুঁজিয়া পায় নাই। হঠাৎ বিমানের চীৎকারে মাথা উঁচু করিয়া দেখিয়া দো-তলায় টপ টপ করিয়া উঠিয়া আসিয়া বিমানকে পাইয়াই বলিল—

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, দাঁড়িয়ে থেক না।

বিমান হতভম্ব হইয়া গেল। সে কোনও কথা বলিল না। ঘরে ইন্দুমতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। ময়না ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

কার্তিকচন্দ্র বিমানকে তাড়া-হুড়া করিয়া জোরে ইন্দুমতীর কক্ষের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—

আপনারা সকলেই এখানে? থাকুন, আমিও এসেছি। তবে দাঁড়ান, আমি সেপাইটাকে বলে আসি। ছোট দারোগা-বাবুর বাড়ীতে বৌ-দি নাই, দিদি আছেন, হৃষীকেশ বাবুর বাড়ীতে দিদি নাই, বৌ-দি আছেন। দাঁড়ান, যাবেন না, আবার যেন আপনাদের খুঁজতে না হয়।

কার্তিকচন্দ্র এই বলিয়া সিপাহীর নিকট চলিয়া গেল। বিমান তখন পুনরায় তে-তলায় উঠিয়া গিয়া চুপ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া রহিল।

কার্তিককে দেখিবা মাত্র সিপাহী ভাঙ্গা-বাংলায় বলিল—

কার্তিক-বাবু! ঠিক বাসা পেয়েছেন ত?

কার্তিক উত্তর করিল—

বৌ-দি এখানে নাই, হৃষীকেশ-বাবু এখানে নাই, সাধিকা এখন অনেক বড় হয়েছে? সেপাই, আমি তাকে যে চিনতেই পারি না। বিমানকে শক্ত তাড়া দিয়েছি, এখনই এই বাড়ী থেকে বের করে দেব। বিমানই লুচি ভেজেছিল, সে কেন সাবধান হয়ে কাজ করে না? ষ্টেশনে বিমান যায় না কেন? আমি নদেকে দিয়ে সাধিকার চিঠি লিখিয়েছিলাম, বিমানের ঠিকানা লিখেছিলাম আমি নিজে, সে-চিঠি বিমান পায় না কেন? সেপাই! তুমি দিদিকে বলো—সে যেন ভাল থাকে।

সিপাহী কার্তিক-বাবুকে কহিল—

বাবু, একটা সহি দেন।

কার্তিক বলিল—

দাও, তোমার কাগজ।

এই বলিয়া সিপাহী ছোট দারোগা-বাবুর নির্দেশ-মত এক খানা কাগজ বাহির করিয়া ছিল।

উহার উদ্দেশ্য—কার্তিকচন্দ্র ঠিক-মত নিজের বাসায় পৌঁছিয়াছে কি না তাহা জানা।

ছোট দারোগা-বাবু এই কয়েক দিনে বিমানচন্দ্রের ঠিকানা বাহির করিতে বিশেষ চেষ্টাই করিতেছিলেন।

তিনি কথার ছলে কার্তিকের নিকট হইতে বুঝিয়াছিলেন—বিমানের বাড়ী কালিয়া, সেখানেই কার্তিকের শ্বশুর-বাড়ী, কার্তিকের শাশুড়ী ও স্ত্রী বিমানদের কলিকাতার বাসায় কার্তিকের শ্বশুরের চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। ছোট দারোগা-বাবু পুলিশের লোক, তাঁহাদের ঐ রূপ সন্ধান করার অভ্যাস আছে। তিনি বিমানের বাড়ী কালিয়া জানিয়া অতি সহজেই তাঁহার খোঁজ করিয়া ফেলিলেন। কারণ তাঁহার ঐ গ্রামের

অনেক লোকের সঙ্গে জানা-শুনা আছে ; অধিকন্তু তাঁহার বাড়ীও যশোহর জেলার একটি গণ্ড-গ্রামে।

সিপাহী কার্তিকের সহি লইয়া কতকটা পথ চলিয়া গেলে, কার্তিক তাহাকে ডাকিয়া বলিল—

সেপাই, আমি ছোট দারোগা-বাবুর বাড়ীর দিদিকে ভারী ভালবাসি, হৃষীকেশ-বাবুর বাড়ীর বৌ-দিকে খুব ভালবাসি ! আমি নিশ্চয়ই দেখা কর্ব, তুমি এ-কথা ঠিক জেনো। বৌ-দির মতন দিদি কিন্তু হাসে নাই।

সিপাহী এ-বার অনেক দূরে চলিয়া গেল। কার্তিক পুনরায় দৌড়াইয়া গিয়া ডাকিল—

সিপাই !

সিপাহী আবার থামিল—

কি ?

কার্তিক বলিল—

সেপাই ! তুমি চল, কিছু খেয়ে যাও। নিশ্চয়ই সাধিকা তোমার জন্য রান্না করে রেখেছে। যদি সে না রেঁধে থাকে, তবে এক্ষুণি বুঝব—সে পরের বাড়ীতে আছে, নিশ্চয়ই এ তার আপন বাড়ী নয়। বড়-মামার বাড়ীতে কেউ এলে না খেয়ে যেতে পারে না।

সিপাহী বলিল—

না, কার্তিক-বাবু ! আমি কিছু খাব না, আমি খেয়ে এসেছি।

কার্তিক কহিল—

তা কি হয় ?

সিপাহী জবাব দিল—

আর এক দিন এসে খাব।

কার্তিক মহাউৎসাহিত হইয়া বলিল—

হাঁ সেপাই! সে-দিন তা হলে তোমার সঙ্গে আমি কুস্তি লড়ব। দেখিয়ে দেব সেপাই! আমার গায়ে জোর আছে কি না! বিমান নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে পার্বে না। নদের সঙ্গে তা বলে আমি পারি না।

সিপাহী এ-বারে দ্রুতই হাঁটিতে লাগিল। কার্তিক আর তাহাকে ডাকিল না।

গ্রীস-দেশীয় ইউলিসিস দীর্ঘ দশ বৎসর পরে 'ট্রয়-যুদ্ধ' শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাহার পত্নী পেনীলপীর প্রেমিকগণ নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল—আর তাহাদের নিস্তার নাই। তাহারা তখন—সাধুভাষায় যাহাকে বলে—কিং কর্তব্য বিমূঢ়—তাহা হইয়াছিল। বিমানের মনের অবস্থা তাহা না হইলেও সে মুখ ফুটিয়া কার্তিকের এ-রূপ অদ্ভুত আচরণের প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে নীচে নামিয়া আসিয়া কাকীমাকে বলিল—

কাকীমা! ময়না কিছু রান্না করুক। কার্তিক-বাবু কি খেয়ে এসেছেন? যদি তিনি ভাত খেয়েই এসে থাকেন, তবে আর কিছু রান্না-বান্না কর্বার দরকার নাই, আমি দোকান থেকে খাবার এনে দিচ্ছি।

ইন্দুমতীর গায়ে যেন জোর আসিল। তিনি আর কোন মতে শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কার্তিকের পুনরায় আগমনের জন্য উদগ্রীব হইলেন এবং বিমানকে বলিতে লাগিলেন—

বাবা! রাগ করো না। কার্তিককে ত জান।

বিমান সরল-ভাবে বলিল—

না কাকীমা! আমি ওতে কিছু মনে করি না। কাকীমা! তা হলে

আমি খাবার আনতে যাই, এখন বেলা ৪টা, কার্তিক-বাবু নিশ্চয়ই ভাত খেয়ে এসেছেন।

কাকীমা মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

হাঁ, সম্ভব।

বিমান খাবার আনিতে বাহির হইয়া গেলে ইন্দুমতী সাধিকাকে বলিলেন—

ময়না! আমায় এক বাটী দুধ এনে দে। ঐ ত ওখানে ঢাকা আছে।

মায়ের নির্দেশ-মত মেয়ে দুধ আনিয়া দিল। ইন্দুমতী তাহা এক নিঃশ্বাসে এক চুমুকে খাইয়া ফেলিয়া একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলিয়া বলিলেন—

ময়না! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল।

ময়না মায়ের এই অভূত-পূর্ব ব্যবহারে বিশেষ সুখী হইয়া বলিল—

মা! আর কিছু খাবে?

মাতা বলিলেন—

দূর পাগলী! তোকে কে চুল বেঁধে দিলে?

ময়না মাথা নত করিয়া জবাব দিল—

নিজেই বেঁধেছি।

ইন্দুমতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

এ নূতন কাপড়, সেমিজ কোথায় পেলি? কার্তিক এনেছে? যাক।

ময়না! দেখ ত আমার জ্বরটা পড়েছে কিনা?

ময়না তাহার হাতখানি বাড়াইয়া মায়ের কপালে ঠেকাইয়া বলিল—

মা! কই তোমার জ্বর? তুমি শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জ্বর কর্বে।

ইন্দুমতী এত ক্ষণ পথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ময়না কান পাতিয়া ছিল।

কার্তিকচন্দ্র আস্তে আস্তে কোনও কাজই করিতে পারিত না। তাহার আগমন-সংবাদ সে পাড়ায় জানাইয়া আসিয়াছে। সহসা ময়না ঝপ করিয়া উঠিয়া ইন্দুমতীর কক্ষের পূর্ব দিকের কামরায় গেল। মাতাও বুঝিলেন—কার্তিক আসিয়াছে।

কার্তিকচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—

শ্বশুর-মশায় বুঝি আমার জন্য অপেক্ষা কর্তে পার্লেন না? তা কেন পার্বেন? তা কি পারেন? তা পারেনই না।

ইন্দুমতী চোখে বস্ত্রাঞ্চল দিলেন। পার্শ্ববর্তী কামরা হইতে শব্দ আসিল—ময়না বেশ জোরেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে।

কার্তিকচন্দ্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—

নদে আমায় বলেছিল—'কার্তিক! তুই তোর শাশুড়ীকে মা বলে ডাকবি।' এখন থেকে আমি আপনাকে মা বলে ডাকব। নদে তার শাশুড়ীকে ত মা বলে ডাকে। মা! তবে শুনুন। না—মা। মা! অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল, আপনাকে প্রণাম করা হয় নি। মা! প্রণাম। পায়ের ধূলা দিন। মা! আপনি ত আমার বয়সে ছোট না, পা ছুঁয়ে আপনাকে আমি প্রণাম কর্তে পারি। মা! নদের চাঁদ আমায় কতগুলি কথা বিয়ের আগে শিখিয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে এই একটা কথা—মা! গুরু মেয়ে লোক যদি বয়সে ছোট হন, তবে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর্তে নাই। তাই মা! আমি বৌ-দিকে কথনও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি নি, দিদিকেও না, যদিও তাঁরা দুই জনই আমার গুরু। তাই ঠিক কাজ করি নি মা?

এই বলিয়া কার্তিক শাশুড়ীর পদ-ধূলি হাতে লইয়া বার বার তাহা মাথায় ঠেকাইতে লাগিল।

ইন্দুমতী ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া বসিয়া রহিলেন।

কার্তিক আবার বলিতে লাগিল।

মা! অমন কাজটি করলে চলবে না। যখন আপনাকে মা-ই ডেকেছি, তখন মা! আপনি আমায় দেখে চুপ করে থাকবেন, আর আমি কথা বলব, তা হবে না। মা! বাড়ীতে আমার মা কি আমায় দেখে ঘোমটা দেয়?

ইন্দুমতীর বুকখানা আনন্দে ফুলিয়া উঠিল।

কার্তিক বলিল—

মা! আপনি শ্বশুর-মহাশয়ের কথা ত আমায় বল্লেন না। মা! তিনি আমায় কি বলে গেলেন? লোকে কোথায়ও যাবার সময় যে একটা কথা বলে যায়। ধরুন, আমি যে এখানে এসেছি, যদি আমি এখান থেকে চলে যাই মা! আমি আপনাকে কিছু না বলে চলে যেতে পারি কি? তাতে কি ভদ্রতা হয় মা? তা কখনও হয় না মা! এই ত সেপাই আমায় পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় আমার কাছ থেকে সই নিয়ে গেল। কই? না বলে যেতে পার্লে? সই অবশ্য সে না নিলে পারত, তবে আমি যে এখানে পৌঁছেছি, তা ছোট দারোগা-বাবু কি করে নিশ্চয় বুঝবে, তাই ঐ সই নেওয়ার উদ্দেশ্য।

ইন্দুমতীর চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

কার্তিক বলিতেই লাগিল—

মা! আপনি কাঁদছেন?

কার্তিক শ্বশ্রূ-মাতার অশ্রু নীরবে গণ্ড বাহিয়া পড়িতে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—

তাই ত মা! কাঁদতে যে হবেই। জানেন না মা! কাঁদতে যে আপনার হবেই। আমিও মা! না কেঁদে পারি নাই মা! সাধিকা কি

কেঁদেছিল ? সাধিকারও ত কাঁদতে হবে মা ! তবে শুনুন মা ! কান্না আসে কেন ? কেউ চলে গেলে মা ! কান্না যেন ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় না ! আপনি বলেন কি ? শ্বশুর-মশায়েরও কোন দোষ নাই মা ! আমায় না বলে-কয়ে তিনি ত যাবেনই। আমার বাবা যখন মরেন-মরেন, তখন আমি নদের সঙ্গে মধুমতীর ও-পাড়ে এক নিমন্ত্রণের কলা-পাতা কাটতে গিয়েছিলাম। বাড়ী এসে দেখি, নব-গঙ্গার চরে বাবাকে—'বল হরি'—ধ্বনি দিয়ে জালিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা মা ! শ্বশুর-মশায়ও আমার না জানিয়ে চলে গেলেন ! আমি ত চিঠি দিয়েছিলুমই। মা ! সাধিকা আমাকে দুই খানা চিঠি দিয়েছিল। মা ! সাধিকা কোথায় ? আমি তাকে বুঝিয়ে দেব—আমি কি এতই অপমানের পাত্র ? আমায় সে সামনা-সামনি অপমান না করে চিঠিতে অপমান করে ? জানেন মা ! শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল আমার চেয়ে চার গুণ বয়সে বড়, এক রকম গুরু জন বল্লেই হয়। সে নাপিত, সে আমায় 'বড়বাবু' 'আপনি' বলে। আর সাধিকা, লম্বায় আমার বুক সমান, সে আমায় 'তুমি' বলে ? ছি ! মা ! সাধিকা ভদ্রতা জানে না। আমি বাড়ী গিয়ে বোনেদের কাছে শুনব—'সাধিকা আমায়—তুমি—বলতে পারে কিনা !' তারপর সাধিকাকে ক্ষমা কর্ব, এর আগে নয়। মা ! এ আপনি ঠিক জানবেন। যাক মা ! আমি সাধিকার চিঠির জবাব দিয়েছি। নিশ্চয় জবাব দিয়েছি। গুরুর দিব্যি ! জবাব দিয়েছি। ঐ চিঠির ভিতরটা নদের হাতের লেখা, আমি লিখেছি চিঠির খামের উপরের ঠিকানা, এ বিমান-বাবুর নামের চিঠি বিমান-বাবু পায় না কেন ? বিমান-বাবু শিয়ালদহ-ষ্টেশনে থাকে না কেন ? আমি হৃষীকেশ-বাবুর বাড়ীতে যাই বা কেন ? ছোট দারোগা-বাবু আমায় বাসায় নেন কেন ? মা ! বুঝেছেন ? তা হলে বুঝুন—বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি, শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হতে পারে না। বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি, অথচ শ্বশুর-

মশায়ের সঙ্গে যদি দেখা হত, তবে বাবা কিছুতেই স্বপ্নে এসে না দেখা দিয়ে পারতেন না—আমি কেন শ্বশুর-মশায়ের সঙ্গে দেখা কর্লাম।

কার্তিক এ-যাবৎ বিড়-বিড় করিয়া বকিতেই ছিল এবং ইন্দুমতীও তাহা শুনিতেছিলেন।

পূবের দিকের কামরায় সাধিকা চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—

এ যে আমার স্বামী। বিমান-দা কি খাবার আনবেন না?

ইন্দুমতীও স-তৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া ছিলেন—বিমান আসে কি না?

কিছু ক্ষণ পরে বিমান আসিয়া পৌঁছিল। তাহার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার।

সে চুপি চুপি ময়নার দরজায় ঘা দিয়া ডাকিল—

ময়না!

ময়না কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খাবারের ঠোঙ্গাটি বিমান-দার হাত হইতে লইল, এবং রান্না-ঘরে গিয়া একখানা থালায় খাবারগুলি সাজাইয়া এক গ্লাস জল লইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

* ইন্দুমতী সমস্ত বুঝিয়া ডাক দিলেন—ময়না খাবার নিয়ে আয়।

ময়না বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বিমানের মুখখানা তখন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল—যাও, ময়না! খাবার দিয়ে এস।

ময়না ঘরে ঢুকিয়া ইন্দুমতীর তক্তপোষের পূর্ব দিকের মেঝে ঝাঁটা দিয়া আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া, হাত দিয়া মেঝে পুছিয়া, তাহারই হাতের তৈয়ারী একখানা কার্পেটের আসন পাতিয়া দিয়া সম্মুখে খাবারের থালা ধরিয়া দিল। জলের গ্লাসটি উহার দক্ষিণে রাখিয়া দিয়া পানের কৌটায় পান দিল।

কার্তিক তখন হাসিয়া অস্থির। সে টপ করিয়া বলিয়া ফেলিল—মা! হরিপদ-মাষ্টার পাখী পুষতে বড় ভালবাসত। সে এক বার গাঙের ও-পাড় থেকে একটা গাঙ-চিল ধরে নিয়ে গিয়ে বলল—কার্তিক! এই দেখ, একটা ময়না এনেছি।

আমি লাফিয়ে বলে উঠলাম—মাষ্টার-মশায়! এ নিশ্চয়ই ময়না নয়। নিশ্চয়ই নয়। যদি ময়নাই হবে, তবে এ-পাখী মাছ খাবে কেন? টি-টি করে ডাকবে কেন? ময়নায় ছাতু খায়, দুধ খায়, আর বেশ কথা কয়। মা! তাই না কি?

বিমান তখন—কার্তিক-বাবু—বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

বিমান বলিল—

কার্তিক-বাবু! খেতে বসুন।

গম্ভীর-ভাবে কার্তিক উত্তর করিল—

এ-খাবার ত সে-দিন সেই ময়রা আমায় খাইয়েছিল। এমন খাওয়ান খাইয়েছিল, শেষে আর খেতে পারি না, যেন বমি হয় হয়। তারপর কি কর্ব বিমান-বাবু! আমি ত ময়রাকে বলে ফেল্লাম—ময়রা! আর দিও না। ময়রা তবুও দেয়, আর 'খান' 'খান'—বলে। অবশেষে আমার নেকার উঠবার উপক্রম দেখে ময়রা থেমে গেল। কিন্তু খাওয়া শেষ হলে যখন বেরিয়ে আসছি, বিমান-বাবু! ময়রা তখন বলে ফেল্লে—মশায়, টাকা দিন। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম—কত? সে জবাব দিলে—সাড়ে তিন টাকা। বেটা ছোট লোক। আচ্ছা বিমান-বাবু! ও কি-বুঝে আমার কাছে এত টাকা চায়? আমি কি ওকে অত খাবার দিতে বলেছিলাম? কেন সে অমন সেধে সেধে ভীষণ দম-আটকান খাওয়ান খাইয়ে আমায় দুটো কান মলা দিয়ে আমার পকেটের টাকা কেড়ে নেয়? বিমান-বাবু! বলুন আগে, কত

আপনাকে দিতে হবে? আমি তাই বুঝে খেতে বসব। নইলে আপনি শেষে ঘাড় ধরে টাকা আদায় কর্বেন, তা পার্বেন না। বিমান-বাবু! আমি এখন চালাক হয়েছি। কাঁচা কাজ আমি এখন আর করি না।

বিমান বলিল—

না কার্তিক বাবু! বসুন, আপনাকে টাকা দিতে হবে না। আপনি খেয়ে নিন।

কার্তিক বলিল—

মা! আপনি বলুন—আমি খাব কি না। জোরে বলুন—আমি খাব কিনা?

ইন্দুমতী তখন ঘোমটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—

বাবা! খাও। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

কার্তিক বলিল—

মা! আমি এখানে একটু শুই। আমি পরে খাব।

এই বলিয়া কার্তিক ইন্দুমতীর সেই তক্তপোষেই শুইয়া পড়িল। তাহার হাতখানা সহসা শাশুড়ীর গায়ে লাগিল।

কার্তিক ক্লান্ত স্বরে বলিল—

মা!

সে যেন ক্রমেই মায়ের পাশে চক্ষু বুজিল।

ইন্দুমতী কার্তিকের হঠাৎ এরূপ বিকৃত ভাব দেখিয়া বার বার তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। দেখিলেন—কার্তিকের চোখ যেন রক্ত বর্ণ হইয়াছে।

তিনি বিমানকে বলিলেন—

বিমান! দেখ ত কার্তিকের জ্বর হয়েছে কি না?

বিমান কার্তিকের গায়ে হাত দিয়া উত্তর করিল—

তাই ত কাকীমা ! জ্বর ত কম নয়, বোধ হয় ১০১ কি ১০২ ডিগ্রী।

কার্তিক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিমান সাধিকাকে ডাক দিল। সাধিকা তে-তলায় উৎকর্ণ হইয়া ছিল। সে মুহূর্ত্ত-মধ্যে নামিয়া আসিল।

ইন্দুমতী ময়নাকে দেখিয়া বলিলেন—

ময়না ! খাবারগুলি নিয়ে যা। কার্তিকের জ্বর হয়েছে। কলকাতায় এসে এ-যাবৎ ঘোরা-ঘুরি করেছে।

চৈত্র মাস। কলিকাতায় ভীষণ গরম পড়িয়াছে। সে-বৎসর কলিকাতায় ভীষণ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব।

কার্তিকচন্দ্র ইন্দুমতীর বিছানায় নিস্তেজ হইয়া এলাইয়া পড়িলে বিমান বলিল—

কাকীমা ! এ-জ্বরটা যেন ভাল বলে মনে কচ্ছিনা, আর আজ-কাল যে দিন-কাল। কার্তিক-বাবুর মুখে যেন কি দেখছি।

ইন্দুমতী মা শীতলার উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকাইয়া একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

নাঃ—

শ্বাশুড়ী তখন নির্নিমেষ-নয়নে জামাতার মুখের পানে তাকাইয়া বিমানকে বলিলেন—

বিমান ! কার্তিককে একটু বিছানা কোথায় করে দেওয়া যায় ?

বিমান কাকীমার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—

কাকীমা ! পূবের কামরায় করে দিই ?

সে তৎক্ষণাৎ সাধিকাকে ডাক দিয়া কহিল—

ময়না! কার্তিক-বাবুকে একটা বিছানা করে দাও। ঐ ওখানে একটা তোষক আছে, বালিসও আছে।

ইন্দুমতী কহিলেন—

বিমান! তোষক কোথায়?

ঐ কড়ির সঙ্গে ঝুলান আছে। যাই, আমিই নামিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া বিমান একটি টুল টানিয়া লইয়া তাহার উপর উঠিয়া তোষক, বালিস নামাইয়া দিল। ইত্যবসরে দুর্গা আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিমান ঝিকে বলিল—

দুর্গা! একটা বিছানা পেতে দে ত। ময়না! তোমার আর পরিশ্রম কর্তে হবে না। সাধিকা বিমানের কথা না শুনিয়া, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সমস্ত বিছানা ধরিয়া নামাইতে অগ্রসর হইল।

বিমান বলিল—

না, না, তুমি ধরো না, ওতে বড্ড ধুল জমে আছে। দুর্গা বিছানা পাতুক।

দুর্গা বিছানা পাতার জিনিষগুলি বাহিরে আনিতে গেলে সাধিকা তাহার সঙ্গে জিনিষ-পত্র বহিতে লাগিল।

ইন্দুমতী এক দৃষ্টিতে কার্তিকের মুখের দিকে তাকাই[illegible] ছিলেন। তাঁহার অ-স্বাভাবিক তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। কার্তিকে[illegible]খানা তাঁহার কাছে যেন বড়ই মধুর মনে হইতেছে।

ময়নার বিছানা পাতা শেষ হইলে, সে তাহার আঁচলখানি দিয়া স্বামীর বিছানাটা ঝাড়িয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল—

'মেঝেতে শোয়া হল।'

সাধিকার ঐ উক্তি অবশ্য ইন্দুমতীর কানে গেল না, বিমান তাহা

নিশ্চয়ই শুনিল; কিন্তু সে ইহাতে খুশী হইতে পারিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

ইন্দুমতী ডাকিলেন—

বিমান! কার্তিককে কি করে শোয়ান হবে?

বিমান কার্তিক-বাবুকে ডাক দিলেন—

কার্তিক-বাবু! কার্তিক-বাবু!

কার্তিকচন্দ্র ঘুমের ঘোরে চেঁচাইয়া উঠিল—

বৌ-দি! বৌ-দি! নন্দে তার বৌয়ের সঙ্গে আমায় আলাপ কর্তে দেয় নি! আমি দেখে নেব—সাধিকা বিমানের সঙ্গে আলাপ করে কি না।

কার্তিকচন্দ্র পুনরায় চক্ষু মুদিল, কিন্তু উঠিল না। তন্দ্রার ঘোরে এই যে-কথা কয়টী তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, ইহার রেশটুকু যেন রি রি করিয়া সকলের কানে বাজিতে লাগিল। প্রত্যেকেই যেন শ্মশানের মত গম্ভীর হইয়া কালের কণিকা গণিতে লাগিল।

বিমানচন্দ্র পুনরায় কার্তিককে ডাকিল এবং তাহার গায়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া বলিল—

কার্তিক-বাবু! ওখানে বিছানা হয়েছে, চলুন, শোবেন।

কার্তিক উঠিল না দেখিয়া বিমান তাহাকে এক রূপ ধরিয়া উঁচু করিয়া বিছানায় লইয়া শোয়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুমতী তাহার অসুস্থ দেহ লইয়া জামাতার সহিত তাহার বিছানায় গেলেন এবং তাহার পাশে বসিয়া গা-হাত টিপিয়া দিতে লাগিলেন, ময়না পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। ইন্দুমতী বলিলেন—

ময়না! বস, কার্তিকের পা টিপে দে। আমি ত কার্তিকের পায় হাত দেব না।

ময়না মায়ের আদেশ কিছু ক্ষণ পালন করিল না। অবশেষে তাঁহার কড়া চোখের শাসনে চুপ করিয়া কার্তিকের পায়ের ধারে বসিয়া পড়িল এবং তাহার পা টিপিয়া দিতে লাগিল।

বিমান বলিল—

কাকীমা! আমি যাই, একখানা মশারি কিনে নিয়ে আসি। ভাল মশারি নাই। এ-সব রোগে রোগীকে সব সময় মশারির ভেতর রাখতে হয়।

ইন্দুমতী বিশেষ ভাল মন্দ কিছু বলিলেন না। তখন প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কাটিল। ইত্যবসরে কার্তিক জল জল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ইন্দুমতী বলিলেন—

ময়না! উনুনটা ধরিয়ে একটু জল গরম করে নিয়ে আয়; কার্তিককে কাঁচা জল দেব না।

ময়না তে-তলায় চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে হইল—তাহার পায়ের সঙ্গে যেন একটা মস্ত বড় ভারী জিনিষ টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে। মনটাও যেন তাহার অত্যন্ত বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সে তে-তলার ছাদে উঠিয়া খাড়া সিঁড়ি দিয়া দোতলায় রান্না-ঘরে নামিল, এবং অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে কয়লা ভাঙ্গিতে বসিল। কিন্তু কয়লা ভাঙ্গিতে কয়লা-ভাঙ্গা-মুগুর কয়লার উপর না পড়িয়া তাহার কোমল বাম হস্তের অঙ্গুলি চারিটির উপর কেবলই পড়িতে লাগিল। সে দুই এক বার অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া কালি-মাখান আঙ্গুলগুলি মুখে ভিতর পুরিয়া দিতেছিল।

সাধিকা ভাবিল—

স্বামী তাহা হইলে বিমান-দার সঙ্গে আমাকে আর আলাপ করিতে দিবে না। সে কেমন হইবে! এত-কাল বিমান-দার সঙ্গে কথা-বার্তা বলিয়া আসিয়াছি—আজ হঠাৎ আমি তাহা কি করিয়া বন্ধ করিয়া দিব? সে কেমন দেখাইবে? বিমান-দা কি তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখ হইবে না? আর এত কাল বিমান-দার সঙ্গে আমরা সকলে একত্র আছি, বিমান-দা কত অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদের জন্য কত কষ্ট করিয়াছেন! ঘর-বাড়ী তিনি এক রূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। বাড়ীর লোকের সঙ্গে তাহার যেন কোনও সম্পর্ক নাই। তিনি চাকরী করেন, টাকা পয়সা রোজগার করেন, সমস্তই এখানে আমাদের জন্য খরচ করেন। তা যাক। বিমান-দার সঙ্গে আমি কথা না বলিলে মাও কি ভাল বলিবেন?

সাধিকা এই রূপ ভাবিতেছে, আর তাহার মন অন্ধকার হইতে আরও ঘোর অন্ধকারে যাইতেছে। ইতিমধ্যে দুর্গা আসিয়া পেছন হইতে সাধিকাকে ডাকিল—

দিদি-মণি!

দিদি-মণি জবাব দিল—

কেন রে দুর্গা?

দুর্গা বলিল—

দাও, দাও, তুমি কেন কয়লা ভাঙ্গতে এসে আমাদের বকুনি খাওয়াচ্ছ? বাবু যা ভালবাসে না, তা তুমি কেন কর? দেখছ না বাবু সব সময় উগ্র-চণ্ডী?

এই বলিয়া দুর্গা রাগে বিড় বিড় করিতে লাগিল। সাধিকা দুর্গার কোন কথার জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুর্গা আরও বক বক করিয়া ছাদ মাথায় করিয়া বলিল—

দাঁড়িয়ে রইলে কেন দিদি-মণি? আমি কি উনুন ধরাতে জানি না? কে এ-বাড়ীতে বার মাস তিরিশ দিন উনুন ধরিয়ে আসছে? এই দুর্গা ঝি না হলে কারুর চলে না। ঠাকুর উড়ে-ব্যাটার সাধ্যি হবে কয়লার চোকা ধরাতে? তা হলে এ-বুড়ীর ভাত অনেক দিন এ-বাড়ী থেকে উঠে যেত। যাও দিদি-মণি! আমাকে হাতে মার খাইও না। যাও, শীগগির এখান থেকে যাও, হাতে কি নিয়ে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। আচ্ছা দিদি-মণি! আমি বলি—

এই বলিয়া দুর্গা ঝি গলা খাট করিয়া দিদি-মণির ধারে আসিয়া চুপি চুপি হাত নাড়িয়া মুখ বাঁকাইয়া বুড় আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—

দেখ, দিদি-মণি! স্বামীই সব। দাদাই বল, ভাইই বল—ধর্ম আছে। আচ্ছা দিদি-মণি! আজ জামাই-বাবু এসেছেন, আজ তোমায় না হলে বাবুর না চলবে কেন? অমন কাজও করো না দিদি-মণি! অমন কাজও করো না।

এই বলিয়া দুর্গা ঝি যেন সাধিকাকে এক রূপ ঠেলিয়া ছাদ হইতে ঘরে পাঠাইয়া দিল। সাধিকার পা কিছুতেই চলিতেছিল না।

দুর্গা ঝি এত কাল সাধিকাকে পাঠাইয়া দেয় নাই বলিয়া বিমান তর তর করিয়া তে-তলায় উঠিয়া সরা-সরি খাড়া সিঁড়ির ধারে চলিয়া আসিল এবং ঝপ করিয়া নূতন মশারিখানা উপর হইতে সাধিকার গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—

এ ভাল মশারি হয়েছে, দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

বিমান দুর্গার দিকে ফিরিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল—

দুর্গা! কাল থেকে তোর চাকরির জবাব হয়ে গেল। আমি চাই না অমন বুড়ী কালী মিত্তিরের ঘাটের মড়া! দূর হয়ে যা মাগি! পাজি! কাল সকালে যেন তোকে আর দেখি না।

দুর্গা ঝি সকলের আর সমস্ত গালাগালিই সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু মড়ার গালাগালি সে কাহারও সহিতে পারিত না, এমন কি যদি তাহার সাক্ষাৎ গুরুদেবও দিতেন, যে-গুরু পঞ্চাশ বৎসর রূপ বেচিয়া খাইয়া ঘোর নিষ্ঠাবতী শিষ্যার গুরু!—সাক্ষাৎ ভগবানের দোসর! যদি তাহার কেহ চৌদ্দ-পুরুষ অন্তভাবে বকিয়া উচ্ছন্ন দিত, তবুও সে কোনও কথা কাহারও মুখো-মুখি বলিত না, সারা দিন নিজ মনে বিড় বিড় করিত। দুর্গা তাই বাবুর বকুনি শুনিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

বাবু! তোমার ময়না যাবে না, আমি তার কি কর্ব? এমন দরদ বাবা ত দেখি নি। জামাই-বাবু এসেছেন, অসুখে পড়েছেন, আর তোমার সুখ উথলে উঠেছে! কর্ব না ঝি-গিরি তোমার। কাল কেন? এখুনি যাচ্ছি।

এই বলিয়া দুর্গা বক বক করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তার মুখে শুধু ঐ কথা—আমি কাশী মিত্তিরের ঘাটের গাদার মড়া? কি—? তুই তা হবি। তুই তা হবি। তুই তাই হবি।

বিমানচন্দ্র আঁতে ঘা খাইয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরিয়া দুর্গাকে কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু দুর্গা আর তাহার বাসার মধ্যে নাই।

সাধিকা দুর্গার বিমানের প্রতি অদ্ভুত আঘাত সত্যই অতি ভীষণ মনে অনুমান করিয়া ভীতা হইল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল—

ও বাবা! এ-যে গরুর মশারি হয়েছে, এর ভেতর ত মশা-মাছি দূরের কথা, বাতাসের বাবারও ক্ষমতা নাই, উঁকি মারে, একে ত ওঁর মাথা গরম।

বিমান অদূরেই দাঁড়াইয়াছিল।

সাধিকা কোনও কথা না বলিয়া মশারিখানা ছাদে ফেলিয়া রাখিয়াই ঘরে মায়ের কাছে প্রস্থান করিল।

বিমান অবিলম্বে হন হন করিয়া ছাদে গিয়া মশারিখানা তুলিয়া লইল এবং দ্রুত কাকীমার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

কাকীমা তখনও কার্তিকের কপালটায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন।

ময়নাকে দেখিয়া ইন্দুমতী বলিলেন—

কি গোলমাল রে ময়না ?

সাধিকা খাট ঘোমটাটা আরও একটু খাট করিয়া বলিল—

ঠাকুর গরম জল আনছে। ক্ষণ-পরেই ঠাকুর একটা 'ষ্টীলের' বাটীতে করিয়া কতকটা গরম জল আনিয়া বলিল—

দিদি-মণি! জলটা ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ঢাকা না দিয়ে রাখলে। ঐ থালাখানা দিন, জলটা ঢেকে রেখে দিই।

বিমান তখন দ্রুত সেখানে আসিয়া বলিল—

ঠাকুর! তোমাকেও আজ বিদেয় দিচ্ছি। সব তাড়াব—ঝি, ঠাকুর—সব।

ঠাকুর জড়-সড় হইয়া বলিল—বাবু! আমি কি করেছি ?

বাবু বলিলেন—কেন তুমি রোজ দেরী করে আস ?

ঠাকুর জবাব দিল—

বাবু! আমার ত কথা—দুর্গা এসে চোকা ধরাবে, তারপর আমি এসে রান্না চাপাব। মাগী বড্ড বজ্জাত। তা নইলে মনিবের কথায় জবাব দেয় ?

বাবু চুপ করিয়া গেলেন। ঠাকুর মনে করিল—চাকরি তা হলে যাবে না। সে সে-স্থান ত্যাগ করিল।

বিমান সাধিকার সেই অ-প্রীতিকর কথাগুলি—অর্থাৎ কার্তিক-বাবুর মাথা গরম, এই মশারি ভারী মোটা—কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিল না।

সে রোগীর ঘরে আসিয়া বলিল—

কাকীমা! উঠুন। ময়না! ওঠ। মশারিটা টাঙ্গিয়ে দিই। এ রোগটা বড্ড ছোঁয়াচে। সকলের সাবধানে থাকতে হবে।

কাকীমা উঠিলেন, কিন্তু ময়না স্বামীর বিছানা যেন ছাড়িতে কোনও মতে রাজী হইল না। অগত্যা ইন্দুমতী সাধিকাকে উঠিতে বলিলে সে উঠিল। মশারি খাটান হইল।

বিমান সেই রাত্রিতে কিছুতেই ময়নাকে কার্তিকের নিকট এক ঘরে থাকিতে দিবে না। তাহার ভয়—পাছে ময়নারও বসন্ত হয়। সে বার বার কাকীমাকে এই ইঙ্গিতই করিতে লাগিল—ময়না ও কার্তিক-বাবু এক ঘরে থাকিলে ময়নারও বসন্ত না হইয়া যাইবে না। ইন্দুমতী ইহাতে বিমানকে বলিল—

আমিই কার্তিকের বিছানায় থাকব'খন। ময়না ঐ পাশের ঘরে থাকবে। তুমি ত উপরেই থাকবে। তা হলেই ঠিক হবে।

বিমান এই দুশ্চিন্তাটা এই ব্যবস্থায় কোনও মতে রোধ করিয়া রাত্রিতে উপরে গিয়াছিল। কিন্তু ময়না তখন মাতাকে নাকে কাঁদিয়া বলিল—

মা! আমি একা এক ঘরে থাকতে পার্ব না।

মাতা সে কথার কোনও জবাব দিলেন না। সুতরাং রাত্রিতে ময়না মায়ের গায়ের ধারে বসিয়াই কার্তিকের পায়ে, হাঁটুতে হাত বুলাইতে লাগিল।

আট নয় দিনে কার্তিক সম্পূর্ণ নিরাময় হইল, কিন্তু তাহার গায়ের বসন্তের দাগ বোধ হয় আজও লুকায় নাই।

—চৌদ্দ—

কার্তিকচন্দ্র বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল—এ-সংবাদ অরুন্ধতী চারুর নিকট শুনিয়াছিল, কারণ নদের চাঁদ চারু-দিকে ঐ সংবাদ দিয়াছিল এবং নদের চাঁদ যে কার্তিকের সাধিকার নিকট প্রেরিত চিঠিখানা নিজেই লিখিয়া দিয়াছিল, ইহাও নদের চাঁদ চারু-দিকে বলিতে ভুলে নাই।

সাধিকা তাহার পিতা-মাতার সহিত তাহাদের গ্রামের বিশেষ আত্মীয় বিমান বাড়ুয্যের কলিকাতার বাসায় আছে এবং কার্তিকচন্দ্র সেখানে গিয়াছে—তাহা চারু-দির আর বুঝিতে বাকী রহে নাই। কিন্তু গুণ-ধর পুত্রের যে কলিকাতায় গিয়া অন্ততঃ একখানা পত্র তাহার মাতাকে লেখা উচিত, তাহা শ্রীমান কার্তিকচন্দ্রকে বুঝাইতে পারে এমন লোক যে নদের চাঁদ ভিন্ন সংসারে অন্য কেহ নাই, তাহা চারু-দি ছাড়া কে জানে ?

অরুন্ধতী তাই বিশেষ চিন্তিতা হইয়া তাঁহার দাদা ব্রহ্মাণ্ডনাথকে বলিলেন—তিনি যেন সময় করিয়া এক বার কলিকাতা যান এবং কার্তিকের খোঁজ করেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড নানা কাজের লোক, তাঁহার পক্ষে অবকাশ-মত বাড়ীর বাহির হওয়া বিশেষ কষ্ট-সাধ্য, বিশেষতঃ কলিকাতায় আসিলে তাঁহার কোনও না কোন কারণে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া পড়ে। এ-দিকে প্রতি রবিবার যে তাঁহাকে 'ইউনিয়ন বোর্ডের' 'কোর্ট' করিতেই হয়।

অনেক দিন পর ব্রহ্মাণ্ডনাথ চারি দিকের কাজ সারিয়া একটু গা হালকা করিয়া ভগিনীর সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—

অরু, আমার, 'হাই-কোর্টে' একটা মামলা পড়েছে। আমায় পরশু পর্যন্ত এক বার কলকাতা যেতে হবে। বৌ-মাকে এক বার দেখে আসব কি ?

চারু বলিয়া উঠিল—

'বৌ-মাকে এক বার দেখে আসব কি?' বড়-মামা! সাধিকাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। বয়সের মেয়ে, শ্বশুর-বাড়ী থাকাই ভাল। আমি ও-রকম থাকা ভালবাসি না। গ্রামী লোক—হক সে বড্ড আপনার, তার কাছে থাকলে আমাদের মুখখানা কত টুকু হয়ে যায়। বড়-মামা! আপনি কার্ত্তিককে নিয়ে, সাধিকাকে সঙ্গে করে আসবেন।

অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করিলেন—

দাদা! আপনি কবে ফিরবেন?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

এই পাঁচ ছয় দিন পরে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার একটি দূর আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন এবং নিজের কাজ-কর্ম দুই দিন মধ্যে অনেকটা হাল্কা করিয়া, বৈবাহিকের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া এক দিন বিকালে তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু এখানে আসিয়া উপর্যুপরি ইহাদের বিপদের কথা শুনিয়া তাহার মনটা ভারী খারাপ হইয়া গেল। তিনি বেয়ান-ঠাকরুণকে বিশেষ অনুযোগ দিলেন—

—বেয়াই এমন ভাল মানুষ ছিলেন, তাঁর গঙ্গা-লাভ হল, তাঁরা এক বার জানতে পার্ল না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ শেষে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বলিলেন—যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরাবার নয়, তবে বৌ-মাকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।

তিনি কার্ত্তিকের চেহারা দেখিয়া বলিলেন—

আর বাবা! এখানে থাকবার দরকার নাই, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। যে চেহারা হয়েছে!

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বেয়ানকে বলিলেন—

বেয়ান! ছেলেটার একটু মাথায় গোল আছে। তাতে বিশেষ কিছু আসত-যেত না, কিন্তু একটু বেশী কথা কয়। ঐ সেবার কার্তিকের 'টাইফয়েড' হয়েছিল, জ্বর থেকে কোনও মতে রেহাই পেল, কিন্তু মাথাটা যে তখন থেকে বিগড়ে গেল, তা আর সারল না। কিন্তু এর মেধা খুব বেশী। কর্তব্য-জ্ঞান, বুদ্ধি-শুদ্ধি—তলিয়ে দেখলে—বেশ আছে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখন বৈবাহিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—বেয়ান! কাল রাত্রি নয়টায় ট্রেণ; বৌ-মার জিনিস-পত্তর সব গোছ-গাছ করে রাখুন। চাকুর কড়া হুকুম—সাধিকাকে নিয়ে যাওয়া চাই-ই। তারপর কার্তিকের পানে তাকাইয়া বড়-মামা স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—তবে তৈরী হও, কালই তোমায় যেতে হবে। আর শরীরটা মাটি করা হবে না!

কার্তিক তখন বড়-মামার সুমুখে মাথা হেঁট করিয়া বলিল—না বড়-মামা! তা কি হয়? বিমান-বাবু আমার অসুখে মশারি কিনে দিয়েছিলেন, আমি তাঁর অসুখে পালাতে পারি? হৃষীকেশ-বাবু আমায় ষ্টেশন থেকে তাঁর গাড়ীতে তুলে এনেছিলেন, তাঁর উপর রাগ করে কি আমি যেতে পারি? বড়-মামা! আমি আজ-কাল ভদ্রতা শিখেছি! এ কলকাতা সহর, এখানে এলে লোক চালাক হয়। বড়-মামা! আমি সব জানি—এখন চৈত মাসের তোমার সাল-তামামি। আমাকে তুমি নালিশের তদ্বিরে রেখে নিজে রাস্তা-ঘাট, ডাক্তারখানা, 'বোর্ড' নিয়ে থাকবে। আমি বুঝি তা জানি না। তা হবে না বড়-মামা! আমার অসুখ এখন সেরেছে। ছোট-দারোগা-বাবুর

সেপাই আমাকে নেমন্তন্ন করে গেছে—তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হবে। তা বড়-মামা! এখনও যে-জোর আছে, তা সেপাইকে হার মানিয়ে ছাড়ব। আমার কুস্তির প্যাঁচ নদের কাছে শেখা।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ জানিতেন না—এ-বাড়ীতে এখনও বসন্তের রোগী আছে, তিনি বলিলেন—বেয়ান! বিমানের কি অসুখ?

বৈবাহিকা মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন—হাঁ।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখন বেয়ান-ঠাকুরাণীকে বলিলেন—বেয়ান! বৌ-মাকে ডাক দিন।

অবিলম্বে সাধিকা অতি বিনম্র-ভাবে ধীরে ধীরে গিয়া মামা-শ্বশুর-মহাশয়কে প্রণাম করিল। ব্রহ্মাণ্ডনাথের বুকের মধ্যে অজস্র অমৃত-ধারা বহিয়া গেল। তিনি বাস্তবিকই মনে করিতে লাগিলেন—

কার্তিকের জীবন সফল। ভগবান মহানুভব। সংসারে মনের মতন স্ত্রী-লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের ফলেই হইয়া থাকে। যাহার গৃহিনী অমৃতময়ী, তাহার গৃহে সর্বদা পীযুষ-ধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। গৃহিনীই গৃহের আনন্দময়ী, আনন্দের প্রতীক।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ পরিশেষে ভাবিলেন—যাক, আমাদের কার্তিককে সাধিকা বেশ চালাইয়া লইতে পারিবে। ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—বৌ-মা! বিমান কোথায়? চলুন, তাকে দেখে আসি।

ইন্দুমতী, ময়না, কার্তিক তখন তে-তলায় ব্রহ্মাণ্ডনাথকে লইয়া গেলেন, এবং কার্তিকচন্দ্রই অগ্রবর্তী হইয়া বলিল—

আসুন বড়-মামা! বিমান বলেছিল—এ-রোগটা ছোঁয়াচে। বড়-মামা! আমিই আপনাকে বিমান-বাবুকে দেখাব।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখন বৈবাহিকা ও বধু-মাতাকে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে

দিলেন না। তিনি নিজে বিমানের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। কার্তিক বলিল —এই দেখুন বড়-মামা!

এই বলিয়া কার্তিক বিমানের মশারির এক পাশ তুলিয়া ধরিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিমানের মুখখানি দেখিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে মা শীতলাকে প্রণাম করিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন— উঃ! কি সাংঘাতিক। বিমান নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। সে শব্দ পাইয়া—ওঃ!— বলিয়া উঠিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি সহসা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং এক পায়ে দুই পায়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন, বৈবাহিকাও তাঁহার অনুগমন করিলেন।

সাধিকা তখন বিমানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—তাহার স্বামী মশারির ভিতর স-তৃষ্ণ-নয়নে বিমানের প্রতি চাহিয়া আছেন। তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। তিনি বিমান-দার মুখের, কপালের অসংখ্য ফোঁড়াগুলিতে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতেছেন।

ক্ষণ-পরে বিমান অ-স্ফুট-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—ময়না! দুর্গার কথাই খেটে গেল। উঃ! ময়না! ময়না!

কার্তিক ময়নাকে হাত ইসারা করিয়া ডাকিয়া বলিল—ময়না! এই যে বিমান-দা তোমায় ডাকছেন, দুর্গা নাম কচ্ছেন! ময়না নীরব রহিল।

কার্তিক তখন ময়নাকে বলিল—

শোন ময়না! দুর্গা নাম লও।

কিন্তু ময়না মনে মনে বলিল—"এ দুর্গা কোন্ দুর্গা?"

বিমান পুনরায় রুগ্ন-স্বরে বলিল—

ময়না ! কার্তিক-বাবু অসুখের মাঝে বলেছিলেন—তিনি তোমায় আমার সঙ্গে আলাপ কর্তে দেবেন না।

কার্তিক আর তখন স্থির থাকিতে পারিল না। সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

বিমান-বাবু ! নদে আমায় তার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ কর্তে দেয় নি, কিন্তু নদে আমার খেলার সাথী, আপনার জন নয়। আপনি যে আমার ময়নার দাদা, আমারও দাদা বিমান-বাবু ! নিশ্চয়ই বলছি—আপনি আমার দাদা। শ্বশুর-মশায়ের দিব্যি ! আপনি আমার দাদা, ময়নার দাদা। ময়না আপনার সঙ্গে যেমন কথা বলছিল, তেমনই বলবে। বিমান-দাদা ! আমায় ক্ষমা করুন। নদে আমার বন্ধু, আপনি আমার আত্মীয়, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। ময়না ! আমায় কত ক্ষমা চাইতে হবে ? বৌ-দিকে কাঁদিয়ে এসেছি, তাই এত কেঁদে মরছি। অভিশাপ লেগেছে বিমান-দা ! অভিশাপ লেগেছে।

বিমান তখন নীরবে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং ময়না ! ময়না !—বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

ময়না তখন স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—

তুমি এত দিন কেন এলে না ? তা হলে বিমান-দার এত বিপদ হত না। বিমান-দা আমার বাঁচবে না। তাঁর সমস্ত গ্লানি আজ মনে ভেসে উঠে সমস্ত মনকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। বাইরেও তাঁর অ-সহ্য আগুন।

কার্তিক তখন বিমানকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল—

বিমান-দা ! তুমি আমার ময়নাকে পেলে-পুষে বড় করে কোথায় চল্লে !

দো-তলা হইতে ব্রহ্মাণ্ডনাথ দৌড়াইয়া আসিলে, ইন্দুমতী তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিলেন। কিন্তু বড়-মামা আসিয়া দেখিলেন—বিমান আর নাই।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ এক দিনের জন্য এই বাসায় আসিয়া কি-রূপ বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তিনি কার্তিককে ও বধু-মাতাকে মশারির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন এবং কিছু ক্ষণ পরে বধু-মাতাকে এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—

বিমানের টাকা পয়সা কোথায় থাকত বৌ-মা ?

বধু-মাতা মামা-শ্বশুর-মহাশয়ের নির্দেশ-মত বিমানের ঘরে ঢুকিয়া পকেট হইতে সুট-কেশের চাবি লইয়া সুট-কেশ খুলিয়া দেখিতে পাইল—একটি 'মনি-ব্যাগে' পনরখানি দশ টাকার নোট এবং খুচরা দুই টাকা ও সিকি-দুয়ানি-পয়সায় বার আনা আছে। সে 'মনি-ব্যাগ'টি লইয়া শ্বশুর-মহাশয়ের হাতে দিল।

ব্রহ্মাণ্ড যদিও সেখানে নূতন আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেই সমস্ত কাজ করিতে হইল, কারণ কার্তিক সেই সময় হইতে যে মুখ বন্ধ করিয়াছে, আর সে মুখ খুলে নাই, শুধু এক দৃষ্টিতে বিমানের দিকে চাহিয়া আছে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ ও কার্তিক অতি কষ্টে বিমানকে লইয়া গেলেন।

শ্মশানে আসিয়া কার্তিক বলিল—বৌ-দির কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি, তাঁকে অনেক রূঢ় কথা বলে বেরিয়ে এসেছিলাম কিন্তু ক্ষমা চাওয়া হয় নি বড়-মামা! বিমান-দাকেও কটু কথা বলেছিলাম, তার কাছেও ক্ষমা চাইতে পার্লাম না। পাছে বৌ-দির কাছেও যদি ক্ষমা চাওয়া না হয়।

এই বলিয়া কার্তিক দ্রুত চলিয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখন বড়ই অন্য-মনস্ক ছিলেন, তাই কার্তিকের কোনও কথা শুনিতে পান নাই কিন্তু কিছু কাল পরে দেখিলেন—কার্তিক আর আসিল না। বিমানের ছার দেহ গচ্ছিত রাখিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

* * * *

শ্মশান হইতে ব্রহ্মাণ্ডনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি এগারটা। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কাল-বৈশাখী আকাশখানা কাল করিয়া জুড়িয়া আছে।

তিনি আসিয়া টিপ করিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—'বেয়ান! কার্তিক ত ফিরে এল না'।

—শেষ—

সোনায় সোহাগা

—এক—

বিমানচন্দ্রের মৃতদেহের সৎকার শেষ করিয়া আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ—কার্তিক আসিল না—এই সংবাদ জানাইলে গৃহের সকলে যেন সহসা স্তব্ধ হইল। ক্ষণ-কাল পূর্বে অ-দূরে ব্রহ্মাণ্ডনাথকে দেখিতে পাইয়াই সকলে নূতন করিয়া কান্না আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাও যেন ঐ সংবাদে হঠাৎ থামিয়া গেল।

হিন্দু-শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী দেহীর অন্তিম বিদায়ের শেষ চিহ্নটুকুও নিভাইয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, নিংড়াইয়া আসার নামকে বলে সৎকার—সৎকার্য। হিন্দুদের মতে ইহা অপেক্ষা সত্য, শাশ্বত, শ্রেষ্ঠ, শুভ বস্তু আর নাই। এ-জীবনে বাঁচিয়া থাকাটাই কি তাহা হইলে গর্হিত কার্য? মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যে এই রক্ত-মাংসের জন্য এত যত্ন, এত আদর, এত ভাবনা, এত ঔৎসুক্য—এ-সমস্ত কি বাস্তবিকই অ-সৎকার? কিন্তু আমার ত ক্ষণ-কালের জন্যও এক বিন্দু বাসনা মনে উদিত হয় না, যে এই নেহাৎ ছেঁদো বলিয়া মনে-করা দেহ ছাড়িয়া যাই। বরং মনে হয়, বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত সাধিকা দেখিব, আরও কত রহস্যময় চরিত্র এ-জীবনে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব।

বিমানকে শ্মশানে লইয়া যাওয়ার সময় ইন্দুমতী ও সাধিকা নেহাৎ আপনার জন মায়া ত্যাগ করিয়া গেলে লোকে যেমন কাঁদে, তেমনই কাঁদিয়াছিলেন। ইন্দুমতীর শোক যেন পুত্র-শোকের মতই হইয়াছিল। সেই হাউ-হাউ করিয়া কান্না, সেই আর্ত্ত-নাদ, সেই বুকে-মুখে চাপড়ান, তাহা বাস্তবিকই অ-সামান্য হইয়াছিল। ইন্দুমতী চির-রুগ্না থাকিয়াও

সেই কান্নার জন্য যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে যেন তাঁহাকে একটুও বি-বশা হইতে হইয়াছিল না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে নিদ্রাতুরা বোধ করিতেছিলেন। সাধিকা তখন আর কি করে! সে ত বিজ্ঞের মত সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ তাহাকে ত মাতাকে ঠেকাইতে হইয়াছিল, আর দাহ করিবার যাবতীয় জিনিষ—পাঁচটা কড়ি, পিণ্ডের কিছু আতপ তণ্ডুল, একটা পৈতা, একটু তেল বাটিতে করিয়া, দুইটি সলিতাও ছেঁড়া নেকড়া ছিড়িয়া পাকাইয়া দিতে হইয়াছিল।

হায়! সেই আদরের 'ময়না'! তাহার এই জ্বালা! এত আহ্লাদ, এত চল-চল, তাই কিনা নিজ হাতে তাহার প্রিয়জনের বিদায়-উপহার সাজান! উঃ!

সাধিকা তাই ভূতের মত কাজ করিতেছিল, আর নীরবে অঞ্চলে চোখ মুছিতেছিল। সে যে কি চোখ-মোছা, তাহা কি বিমান দেখিয়াছিল? বিমানের কানে কি সেই কান্নার শব্দ পৌছিয়াছিল? না, বোধ হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে বিমান-দা কিছুতেই তাহার আদরের লুকো-চুরি-ডাক ময়নার অশ্রু মুছিয়া দিতে কত অশ্রুই না নিজে ফেলিত, আর বলিত—

ময়না! লক্ষ্মী আমার! কেঁদ না।

বিমানের এ-বাসায় এ-যাবৎ পাড়ার কেহই বিশেষ আসে নাই, কারণ বিমানচন্দ্র ঐ পাড়ার মধ্যে একটু স্বতন্ত্র ভাবেই থাকিত। সে উচ্চ শিক্ষিত ছিল, তাহার সম-কক্ষ লোক ঐ পল্লীতে বিশেষ ছিল না, সুতরাং ভাবও কাহার সঙ্গে বিশেষ হয় নাই। তবে সকলে জানিত—ঐ ছয় নম্বর বাড়ীতে এক জন বড় 'প্রোফেসার' থাকেন। সকলে তাই

বিমানকে যথোপযুক্ত সম্মান করিত। সেও কাহারও কোনও ব্যাপারে বা পাড়ার কোনও গোলমালে রহিত না। বিমানচন্দ্রের ডাক অবশ্য পড়িত তখন, যখন ঐ পল্লীতে প্রতি বৎসর বারোয়ারী পূজা হইত। বিমানচন্দ্রও নিজে উদ্যোগী হইয়া বারোয়ারী ৺শীতলা পূজার জন্য দশটি টাকার একখানি নোট পাড়ার চাঁদা-আদায়-কারী ছেলেদের ডাকিয়া দিয়া দিতেন, ইহাতে পাড়ার তরুণরা বা কিশোরেরা বৎসরের অন্য সময়েও বিমানচন্দ্রকে দেখিলেই স-সম্ভ্রম নমস্কার করিত ও অ-সাক্ষাতে বলিত—মস্ত বড় 'প্রোফেসার' ইনি।

সে-দিন কিন্তু এ-বাসায় লোক ধরিয়াছিল না। চির অ-পরিচিত ঐ বাসার সিঁড়িতে যাইবার গলিটি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে দো-তলায় ইন্দুমতীর কক্ষ পর্যন্ত নানা বর্ণের লোক নিথর প্রাণে মুহ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাহারও মুখে রা-টি ছিল না। শুধু এ ওর পানে তাকাইয়া চোখেই বলিতেছিল—সেই মস্ত বড় 'প্রোফেসরটি' 'পম্ভ্রে' মারা গেছেন। কি চমৎকার লোক ছিলেন! যেন রূপের রাজা। প্রাণটাও মস্ত বড় ছিল। পাড়ার একটা বল ছিল।

শুধু দর্শনদ্বারা সহানুভূতি দেখাইয়া অনেক লোক আসিয়াছিল, গিয়াছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ইন্দুমতীর পার্শ্বে যে কয়েক জন বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, সধবা, বিধবা স্ত্রী উবু হইয়া, মুখে হাত দিয়া, সময়ে সময়ে সম-দুঃখে দুঃখিনী সাজিয়া ইন্দুমতীর নিকট শ্মশান-বৈরাগ্যের বাঁধা-গৎ আওড়াইতেছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ঐ বাড়ী-ওয়ালার সধবা স্ত্রী এক জন ও ছয় নম্বর বাড়ীর একটি ভাড়াটিয়ার বাল-বিধবা কন্যা অন্য জন। তাঁহারা সেই যে আসিয়াছিলেন, আর যান নাই, অথবা বিশেষ কিছু কথাও এ-যাবৎ বলেন নাই।

বাড়ী-ওয়ালার বধূ হঠাৎ এই কান্না-কাটি শুনিয়া এবং তাহাদেরই এক জন ভাড়াটিয়ার বিপদ জানিয়া অ-বিলম্বে নিজেই হাটু-পাটু করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইন্দুমতীর সঙ্গে তাঁহার জানালায় জানালায়—অর্থাৎ বাড়ী-ওয়ালার বাড়ীর দ্বি-তল-স্থিত গবাক্ষের মধ্য দিয়া ও বিমানের বাড়ীর তে-তলার সিঁড়ির ফুকর দিয়া চেনা, পরিচয়, ভাব পূর্বে হইয়াছিল। উভয়ের প্রায়ই আলাপ হইত, কিন্তু একে অন্যকে কখনই সম্পূর্ণ দেখে নাই। মাত্র একে অন্যের কোমর পর্যন্ত, অন্যে একের বুক পর্যন্ত দেখিয়াছে। এই দু জনের মধ্যে এ-যাবৎ যে আলাপ হইয়াছে, তাহা সেই এক-ঘেয়ে মেয়েলি আলোচনা—কে কি রকম আছে, কি রান্না-বান্না হইল, ইত্যাদি। কিন্তু আজ দুই জনে বিশেষ পরিচিতা হইলেন এবং বাড়ী-ওয়ালার বধূ ইহাদের সম্যক পরিচয় পাইলেন।

ভাড়াটিয়ার বাল্য-বিধবা কন্যার নাম যে সুবর্ণ, তাহা জানা গেল ইহা হইতে, যে বাড়ী-ওয়ালী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে কানে কানে বলিয়াছিলেন—

যাও সুবর্ণ! তুমি—আ-হা-হা—ঐ পোড়া-কপালীর যা না করলে নয়—তাই সাজিয়ে দাও। আ-হা-হা! কাঁচা বয়স! তোমারই মতন ছাই-কপালী। এই পোড়া ছাইই ত সাজতে হবে। আ-হা-হা!

ইহা বলিয়া বাড়ী-ওয়ালী মাথার কাপড়টা একটু নামাইয়া নিজের পাকা-কাঁচায় মেশান চুলের মধ্য হইতে জাজ্জল্যমান আয়তি চিহ্ন সিঁথির সিন্দুর দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে যেন স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছিল—নারী জীবনের এক মাত্র চরম গৌরব, নিতান্ত গর্ব, অবিশ্রান্ত সৌভাগ্য—পাকা চুলে সিন্দুর পরা। এ যেন অবলার বল, স্বাধীনতা।

তখন সুবর্ণও একটু মলিন হইয়াছিল। কিন্তু সে কোনও রূপ বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া মনিবানী-নির্দিষ্ট কার্যের জন্য উঠিয়া গিয়াছিল ও সাধিকার পানে যাইতে উদ্যতা হইয়াছিল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহার পা যেন আর চলিতেছিল না।

* * * *

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বাড়ী পৌঁছিয়া কিছু ক্ষণ পরে বলিলেন—

বেয়ান! কেঁদে আর কি হবে? যা গেছে, তা গেছে।

ইন্দুমতী নীরব থাকিলেন। পাশের ঘরে তখন বধূ-মাতা যে মামা-শ্বশুরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা তাহার চুড়ির শব্দে বুঝা যাইতেছিল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ বধূ-মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

বউ-মা! মিছরি ভিজিয়েছিলেন কি?

বধূ-মাতার মনটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে অত্যন্ত ত্রস্তা হইয়া ঘর হইতে ঘোমটা দিয়া বাহির হইল, কারণ সুবর্ণের ও বাড়ী-ওয়ালীর নির্দেশ মত যে মিছরির সরবৎ ভিজান হইয়াছিল, তাহা এ-যাবৎ মামা-শ্বশুরকে দেওয়া হয় নাই।

সাধিকা অ-বিলম্বে নিজের আঁচলেই কাচের গেলাসের মিছরি-পানা ছাঁকিয়া, অন্য একটি গ্লাসে তাহা বার কতক ঢালা-উবুড় করিয়া আনিয়া অতি সম্ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সম্মুখে মেঝেয় রাখিল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা পাইয়াই এক চুমুকে তাহা পান করিলেন। ইন্দুমতী শুধু ঘোমটার ফাঁকে ব্রহ্মাণ্ডনাথের চোখ-মুখ লাল দেখিতে পাইলেন। সাধিকা আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণ-কাল এই ভাবে কাটিল।

ব্রহ্মাণ্ড বলিলেন—

এমন ক্ষেপাটে নিয়ে পড়েছি। সব গে-র।

ইন্দুমতী কথা না বলিয়া পারিলেন না। ঘোমটা মাথায় করিয়াও বেশ ধীরে ধীরে শব্দ করিয়া তিনি বলিলেন—কেন বেয়াই ?

ব্রহ্মাণ্ড ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

বেয়ান ! খাই-দাই, তার পর বলব। শ্মশান থেকে এসে ছুটি খেতে হয়।

ইন্দুমতী তখন উঠিলেন এবং অ-প্রস্তুত ভাবে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গলার শব্দ করিয়া ময়নাকে ডাকিলেন।

ময়নাও মায়ের বাহির হইবার শব্দে তাঁহার কাছে আসিয়া জানাইল—

ঠাকুর ত রান্না শেষ করে চলে গেছে।

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি রেঁধেছে ?

সাধিকা জবাব দিল—

রেঁধেছে যা, তা দিয়ে কি করে ভাত দেওয়া যাবে ?

ইন্দুমতী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

সব বে-গোছাল। কার জিনিষ কে দেখে !

সাধিকা মাতাকে বলিল—তা যাক। বল, কি করি ?

মাতা চুপ করিয়া রহিলেন।

সাধিকা পুনরায় বলিল—

বল।

মাতা বলিলেন—

একটু রাবড়ি, মিষ্টি এনে দেওয়া যাক। কাকে দিয়েই বা আনাই ?

সাধিকা বলিল—

মা ! বাড়ী-ওয়ালার ঝিটাকে পেলে ভাল হত।

মাতা সোৎসাহে বলিলেন—

চুপ চুপ করে বার-দরজায় উঁকি মেরে দেখ—সে আছে কি না। এখন পর্যন্ত সে কি আছে? না, চলে গেছে, রাত এখন বারটা।

সাধিকা মায়ের কথা-মত অতি সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল। অন্ধকারে যাইতে মেয়ের ভয় করিতে পারে, বিশেষতঃ এই দিনে, মাতা তাই মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলেন।

সাধিকা সরা-সরি হাতড়াইতে হাতড়াইতে বার-দরজায় ঠুক করিয়া ঘা খাইতেই বাহির হইতে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তখন সাধিকা বিব্রতা হইয়া পড়িল। সে মনে করিল—তাহার স্বামী বোধ হয় পিছনে আসিতেছিলেন, তাই এই বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও সাধিকার দরজা খুলিবার সাহস হইল না। সে মনে করিল—যদি তাহা না হয়, তাই কন্যা মাতার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

মা! কে যেন কড়া নাড়ছে।

মাতা তখন অন্ধকারে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মেয়ের কথায় ও নিজে ঐ কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন, সহসা তাহা বুঝিয়া পাইলেন না।

সাধিকা ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, নিজেই ঐ দরজা খুলিবে। ইন্দুমতী বলিল—

জোর কড়া-নাড়া—কার্তিক বুঝি এসেছে।

সাধিকা যেন জোর পাইল কিন্তু মাতার সম্মুখে স্বামীকে কি করিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, তাই সঙ্কুচিতা হইতেছিল। ইন্দুমতী বলিল—

দাঁড়া, আমিই খুলে দিচ্ছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা মাতা গুঁটি গুঁটি করিয়া বার-দরজা খুলিতেই দেখিতে পাইল—এ ত কার্তিক নহে।

সাত্বিকা উদগ্রীব নয়নে দরজার বাহিরের আলোর প্রত্যাশা করিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, তাহার স্বামী আসিবে, কিন্তু দেখিল—কই স্বামী! এ যে তাহার নব পরিচিতা সুবর্ণ। পরিধানে একখানি ধব-ধবে থানের কাপড়। আঁচলে এক ছড়া চাবি। আঁচলখানি মাথার উপরে ঈষৎ ঘোমটার মত। গায়ে একটি ফর্সা সেমিজ, ফুট-ফুটে রংয়ে বেশ মানাইয়াছে। হাতে একটা বড় গামলা, থালা দিয়ে ঢাকনা-দেওয়া। ইন্দুমতীকে দরজায় দেখিয়া সুবর্ণ বলিল—

ও কি কাকী-মা! আপনি নিজেই সদর দরজা খুলতে এসেছেন?

ইন্দুমতী বলিলেন—

কি করি মা? মেয়ের ত ভয় বেশী। এখানে ত বেশী দিন নামে নি। তবে দু এক দিন যে থিয়েটার-বায়স্কোপে যেতে নেমেছিল, সে ত বিমানের সাথেই। আজ বাছাকে বিদায় দিয়েছি, আজই দেখ বার-দরজায় এসেছি। এর পরে কি অদেষ্টে আছে, তা ভগবান জানেন। কি মা! তোমার হাতে কি? এত রাত্রে?

সুবর্ণ বামুনের মেয়ে। তাহার পিতার ভট্টাচার্য উপাধি। সে বলিল—কাকী-মা! তখন আমি আমাদের ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই মা আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে—খুকি! ভাল মানষেরা শ্মশান থেকে ফিরে এসে কি খাবেন, তা তুই জেনে এসেছিস? আমি বল্লাম—মা! তা ত জানি না। মা তখন আমায় বললেন—আহা! তা হলে তাদের খাওয়া হবে না? আজ কি ও-বাড়ীর ঠাকুর আসবে? তা আসে আসুক, না আসে না আসুক, তুই নিজে গিয়ে কাপড় ছেড়ে রান্না করে ওঁদের দিয়ে আয়,

নইলে কারুরও খাওয়া হবে না। কাকী-মা! আমি তাই অতি শীগগির কাপড় ছেড়ে রান্না করেছি। মা আমাদের ছাদ থেকে এই দরজা-পানে চেয়েছিলেন—ওঁরা আসেন কি না। তা শেষে ওঁদের বাসায় ঢুকতে দেখে মা আমায় বল্লেন—যা খুকি! তুই এখন ভাত বেড়ে নিয়ে যা। কাকী-মা! আমি তাই নিয়ে এসেছি; চলুন, উপরে যাই।

এই বলিয়া তাঁহারা তিন জনে উপরে গেলেন। ইন্দুমতীর নির্দেশ মত সুবর্ণও পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যেখানে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, সেখানেই শ্রমের ঘুম ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অভ্যাস মত তারস্বরে নাক ডাকিতেছিলেন।

ভাত বাড়া হইবার পর সুবর্ণ বলিল—কাকী-মা! তাঐ-মশায় ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে কে ডাকবে? সুবর্ণ কাকী-মার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অতি যত্নে ঠাঁই করিয়া দিয়া বলিল—কাকী-মা! আমিই ডাক দিচ্ছি।

এই বলিয়া সুবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডনাথের কাছে গিয়া 'তাঐ-মশায়, তাঐ-মশায়' বলিয়া ডাক দিল।

তাঐ-মশায় ধড়-ফড় করিয়া উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া আহারের আসনে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং খাইতে খাইতে বলিলেন—

বেয়ান! কার্তিকটা ত আর এল না। ঘাটে গিয়ে পৌছুলে সে এই বলে চলে গেল যে সে তার বৌ-দি আর দিদির কাছে ক্ষমা চাইতে চলল, তাঁরাও যদি বিমানের মত চলে যায়।............মহামুস্কিল!

ব্রহ্মাণ্ডনাথ এই বলিয়া নীরব হইলেন। ইন্দুমতীর দৃষ্টিতে আবার ঘনায়মান অন্ধকার ভাসিয়া উঠিল। তিনি শুধু এই মাত্র বলিলেন—কোথায় গেল কার্তিক? সে কি শব দাহ করার সময় ছিল না? পরে আসে নাই? আর আজ আসবে না?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—আর কখন আসবে? এখন যে রাত্রি প্রায় একটা, আর গিয়েছে কখন—সেই ৭।৮ ঘণ্টা আগে। ওটাকে আবার খুঁজতে হবে।

প্রত্যূষে উঠিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ শৌচাদি শেষ করিয়া বলিলেন—

বউ-মা! আজ আমার 'হাই-কোর্টে' মামলা। আমি এখন উকীলের বাড়ী যাব। সেখানে থেকে কার্তিকের খোঁজ করে বাড়ী যাব। যাত্রাটা পরিবর্ত্তনের দরকার পড়েছে। মামলায় ত হারব নিশ্চয়ই। মামলায় হারলে এ-মুখ এখানেও দেখান যাবে না, আর দেশেও নেওয়া চলবে না। যে গে-রতে পড়েছি। আমাকে একটা পান দিন।

বধূ-মাতা পান সাজিয়া আনিয়া মামা-শ্বশুরকে পানের ডিবাটি হাতে দিয়া গল-বস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিল। নিকটেই বৈবাহিকা ছিলেন, তিনি মেয়ের কান্নায় সুর মিশাইলেন। সাধিকা বলিল—

বড়-মামা!

সাধিকা জীবনে এই প্রথম ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত কথা বলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

বড়-মামা! দিন ভালই থাক, আর মন্দই থাক, আপনার যে-যাত্রাই হোক, আমাকে যাত্রাপুরে নিয়ে যেতেই হবে।

বড়-মামা বলিলেন—

বেয়ান কোথায় যাবেন?

সাধিকা জবাব দিল—

মাকে দিদি-মার কাছে কাশীতে আপনি পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

সে ত এখন হবে না।

সাধিকা উত্তর করিল—

তবে কখন ?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

মামলাটা হয়ে যাক।

সাধিকা জবাব দিল—

তবে আমরা নিরাশ্রয় থাকব ? এই ভাড়াটে বাড়ী। কে দেখে-শোনে ?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ স্বর পরিবর্তন করিয়া বলিলেন—

যিনি এনেছেন, তিনিই দেখবেন। যাই, আমার দেরী হয়ে গেল।

এই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড বৈবাহিকার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—

আমি তবে আসি বেয়ান ?

বৈবাহিক চলিয়া গেলেন।

এই এখন এ-বাড়ীর প্রকৃত স্ব-রূপ বাহির হইল। বিমান যে সত্যই নাই, এই অনুভূতি এ-যাবৎ ভাল করিয়া কেহ বুঝিতে পারে নাই। কারণ বিমানের বিয়োগের পরে এ-যাবৎ ইঁহারা পদস্থ আত্মীয়ের, যিনি ইঁহাদের সম্বল হইবেন, তাঁহারই যত্ন-আত্মি যাহাতে ত্রুটি-বিহীন হয়, এ-জন্য চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এখন সেই সহায় সরিয়া গেলেন। হয় ত পরে আসিবেন, কিন্তু এই পরের মধ্যে কে এখন এই দুইটি প্রাণীর তত্ত্বাবধান করে ? একটি বৃদ্ধা, একটি যুবতী, উভয়ই পরমুখাপেক্ষিণী। কে কাহাকে দেখে ? যদি এই ইটের পাঁজাটা মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে এই দুই জনের যে রাস্তাও সম্বল নাই, ঐ ইট-কাঠের নীচে পড়িয়াই যে তাহাদিগকে মরিতে হইবে, কেহ তাঁহাদের টানিয়াও ফেলিবে না।

সাধিকার সেই বিবাহ-রাত্রির গৃহ-দাহের কথা মনে পড়িল। সে দিনটা তাহার যে-রূপ ভয়াবহ মনে হইয়াছিল, আজিও সে-রূপ হইল।

বাস্তবিকই এই দুইটি বস্তু সমানই মনের উপর ছাপ মারিয়া দেয়। গৃহ-দাহ আর দেহ-দাহ। দেহটাও ত একটা গৃহের ন্যায় আধার মাত্র। আজ বিমানের দেহ দাহ হইয়াছে। তারপর স্বামী! তাহারও নাকি খোঁজ নাই।

সাধিকা আর ভাবিতে ভয় পাইল। সে দ্রুত কাপড় চোপড় সংযত করিয়া গৃহ-কার্যে মন দিল। ইন্দুমতীও কল-তলা গেলেন। দিন যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিল। ঠাকুর আসিয়া বলিল—

দিদি-মণি! আপনি কেন কাজ কর্ছেন?

—দুই—

সে-দিন শনিবার। কলিকাতার চাকুরেদের আনন্দের দিন, স্কুল কলেজের ছাত্রদেরও বটে। সারা সপ্তাহে ছয়টি দিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া শনিবারের বৈকাল, রাত্রি ও রবিবারের পূরা দিনটি ছুটি পাইয়া সকলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। তবে রবিবার সম্পূর্ণ ছুটি থাকিলেও দিনটি বিশেষ আরাম-প্রদ নহে, কারণ চিন্তা—রাত্রি প্রভাত হইলেই আবার 'ছোট'। আর গোটা সপ্তাহের পুঞ্জীভূত কাজ—যেমন, এর-তার সঙ্গে দেখা করা ইত্যাদি, ঐ রবিবারের জন্ত জমিয়া থাকে, তাই কেহ রবিবারে তেমন অবসর পায় না। শনিবারেই সকলে আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে।

রমেন বহু দিন হইতেই ভাবিতেছে—বিমানের সঙ্গে এক বার দেখা করিবে। ঐ সে-দিন সে বিমানের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। আর সেখানে সে যায় নাই, কারণ বিশেষ অবসর পায় নাই। বিমান যদিও বলিয়াছিল, সে তাহাদের হেদুয়ার সন্নিহিত মাণিকতলার মেসে এক বার আসিবে, তথাপি সে আসে নাই।

রমেন তাই শনিবার সকাল হইতে স্থির করিয়াছে, আজ বৈকালে সে বিমানচন্দ্রের বন্ধুত্ব এক বার অবশ্য ঝালাইতে আসিবে; বিশেষতঃ "ধ্যানের ছবি"র সঙ্গে 'সেকেণ্ড টাইম' একটু 'ইণ্টারভিউ' করিবে।

সে মনে করিল—বেড়ে আছে বিমান! এমন হলে ত সংসারে আমি আর কিছু চাইতাম না। কিসের শালার ঘর, বাড়ী, আত্মীয়, স্ব-জন? 'রোমাঞ্চ' না থাকলে কি জীবন? ও ত শেয়াল কুকুরের মত কাল কাটান। টাকা রোজগার কর, খাও-দাও আর স্ফূর্তি কর।

সে মনে মনে বলিল—

বিয়ে করার মত এক-ঘেঁয়ে, গতানুগতিক জীবন আর নাই। হাতে-পায়ে শেকল সেধে পরা। শেষে জড়িয়ে লোটা-পুটি। এ বলে ওরে দেখ, ও বলে এরে দেখ। অশান্তি, অশান্তি, চির অশান্তি। আর এ-ফুলে ও-ফুলে মধু খেলাম, জঞ্জাল পোয়াতে হল না। সর্বোপরি চির কাল এক জনকে নিয়ে থাকাটা কি 'ভ্রাজারি' নয়? থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। বিমান! তুমিই বুদ্ধিমান ছেলে বাবা! তবে ও-সব বুজরুকি রেখে দাও। 'প্লেটনিক লভ'! হ্যাঁ! ঢের দেখেছি। বাবা! ও-সব ডুবে ডুবে জল খাওয়া কি আমরা বুঝি না? হও বাছা! তুমি লেখা-পড়ায় বিদ্বান। কালিদাস কি করেছিল?

রমেন সে-দিন আফিস হইতে খুবই সকালে 'মেসে' পৌঁছিয়াছিল এবং আসিয়াই হাত-মুখ ধুইয়া, 'সেভ'-করা মুখখানা সাবান দিয়া বেশ করিয়া ঘষিয়া আসিয়া চুলগুলি ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরিয়া মনের মতন করিয়া পাটি করিল, যেন কিছুতেই সাজান হয় না।—এক বার মোটা চিরুণী, এক বার সরু চিরুণী, এক বার 'ব্রুস' দিয়া চুল বেচারীর প্রাণান্ত করিল। শেষে কোনও মতে মাথাকে রেহাই দিয়া হাড়-জাগান, ভিতর-ঢুকান, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মুখখানি লইয়া ব্যস্ত হইল। ঐ সেই কথা-শিল্পীর ভাষায় যাহাকে বলে—অন্ধকার গর্তের মধ্যের অন্ধকারে মেশা ইন্দুরের চক্ষু দুইটি যে-রূপ বাহির হইতে দেখায়। সেই রূপ চোখ দুইটা লইয়া রমেন আয়নার পানে বার-বারই তাকাইয়া নিজের রূপের রং স্নো দিয়া মন-ভুলান করিতে বসিল, কিন্তু তাহার বেয়াদব দাঁত চারিটি তাহার মুখে যে বিদ্যমান আছে, তাহা প্রমাণ না করিয়াই পারিল না। তারপর রমেনের ভদ্র লোক রজকের কাচা জড়ি পেড়ে কাপড়, ড্রয়ার, ফতুয়া, শালকর-পরিষ্কৃত মটকার পাঞ্জাবী

গোছ-গাছ করিয়া পরিবার পালা পড়িল। চক-চকে জড়ির জুতা যাহাকে 'নাগরাই' বলে, তাহা সে পায়ে ঢুকাইল। সর্ব-শেষে আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চশমা জোড়া পরিতে লাগিল, যেন নাকটি ও চশমাটি ভাসুর-ভাদ্র-বধূ—এ ওকে ছুঁইতে চাহে না।

রমেন যখন বিমানের বাসার সদর দরজায় আসিল, তখন সে নিজ হাতের সোণার কব্জি-ঘড়ির পানে তাকাইয়া দেখিল—সাড়ে পাঁচটা।

রমেন মনে মনে বলিল—

ওঃ! এত দেরি হয়ে গেছে? হয় ত বিমান বেরিয়ে গেছে।

সে তবুও বাহির দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। কিন্তু বহু কাল কড়া নাড়া হইলেও ভিতর হইতে কোনও শব্দ হইল না, যে দরজা খোলা হইতেছে।

রমেন আবার ডাকা-ডাকি হাকা-হাকি করিতে লাগিল, এবং শেষে বিশেষ মন খারাপ করিয়া ভাবিল—

ওঃ! কার মুখ দেখে মেস থেকে রওনা হয়েছিলাম? হ্যাঁ, সেই অসিতটার শাপ ফলে গেছে। 'ষ্টুপীড' বলেছিল তাকে নিয়ে আসতে। সে বেটাচ্ছেলে তা হলে দীর্ঘ নিঃশ্বেস ফেলেছে।

রমেন ইহা বলিয়া পুনরায় আরও জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল।

ও বাবা! কড়া নাড়ার এমন শব্দ হইল, যে ছোট্ট গলিটার এ-পার হইতে ও-পার পর্যন্ত যত বাড়ী আছে, তাহার প্রায় প্রতি বাড়ীরই মেয়েরা ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, যে কে এমন সর্বনেশে ডাক ডাকিতেছে।

তাহারা বলিল—

ও মিনসে কি রাত দুপুর ভেবেছে, না ইতর মেয়েদের বাড়ী পেয়েছে, যে এত হাঁকা-হাঁকি কচ্ছে?

অনতিকাল-মধ্যে পার্শ্ব-স্থিত বাড়ী হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া পাথরে বাঁধান গলি দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

আপনি কে?

রমেন অবাক হইয়া জবাব দিল—

আমায় ক্ষমা করবেন, এ-বাড়ীর লোকেরা দিন-দুপুরে ঘুমুচ্ছে না মরে আছে? নৈলে ভেতর থেকে খিল দেওয়া আছে কিন্তু ভেতরের লোকে সাড়া দেয় না কেউ আছে বলে।

তরুণী আগন্তুকটিকে জিজ্ঞাসা করিল।

আপনি কাকে চান?

রমেন উত্তর করিল—

চাই 'প্রোফেসার' সাহেবকে। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর বাড়ীর লোকের সঙ্গে আমার বিশেষ জানা-শুনা আছে—এক রকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

মহিলা ভদ্র লোকটির মুখে 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়' বলিয়া শুনিয়া কহিল—

অপেক্ষা করুন, আমি ডেকে দিচ্ছি, আপনি একটু সরে দাঁড়ান।

তরুণীর কথায় রমেন সহসা ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল। তখন মহিলাটি ঐ দরজায় আস্তে আস্তে টোঁকা দিয়া বলিল—

কাকী-মা! দরজাটা খুলুন ত।

কাকী-মা ও সাধিকা, যাঁহারা বহু কালই নীচে নামিয়া সদর দরজার গায়ে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ফাঁক দিয়া রমেনকে চিনিয়া দরজা না খুলিবারই মতলব করিয়াছিলেন ও ভাবিয়াছিলেন বিমানের বন্ধুটি কিছু কাল ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি করিয়া কোনও সাড়া শব্দ না পাইয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু শেষে সুবর্ণের আস্তে কথা তাঁহারা শুনিতে পাইয়া ঠুক করিয়া দরজা খুলিলেন এবং সুবর্ণ তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

আসুন।

ভদ্র লোক ভিতরে আসিলেন এবং সম্মুখেই কাকীমাকে দেখিয়া লোটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—

কাকী-মা! এত সকালেই ঘুম? পাড়ার লোকে এসে দরজা খোলালে, নলে ত আমি ফিরেই যেতাম। রমেন স্থবর্ণের দিকে তাকাইয়া বলিল—

মাপ কর্বেন, আপনাকে কষ্ট দিইছি, আপনার দয়ায় আশ্রয় পেয়েছি।

রমেন পুনরায় কাকীমার দিকে ফিরিয়া এক নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিল এবং পরিশেষে সে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিল—কাকী-মার শরীর এই কয়েক মাসে অর্ধেকও নাই। কাকী-মা এ-সমস্ত সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

রমেন জিজ্ঞাসা করিল—

কাকী-মা? বিমান বেরিয়ে গিয়েছে?

সে কাকী-মার জবাব না শুনিয়াই বলিল—

তা যাক, 'ওয়েট' করি, চলুন, উপরে চলুন।

এই বলিয়া সে যেন নিজেই কাকীমাকে এক রূপ টানিয়া লইয়া উপরে গেল, আর বলিতে লাগিল—

কাকী-মা! বড় দুঃখ মনে রয়ে গেছে—কাকার ছি-চরণ দেখা বরাতে জোটে নাই। অদেষ্ট! অদেষ্ট!

ইন্দুমতী এ-যাবৎ মোটেই কথা বলেন নাই, শুধু রমেনের কথাই শুনিয়া যাইতেছিলেন।

স্থবর্ণ আগন্তুককে আত্মীয়দের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে আসিয়াছিল এবং এক পায়ে দুই পায়ে যেমন আসিয়াছিল, তেমন চলিয়া গেল।

মাতা ও রমেন-বাবু ঘরে ঢুকিয়াছে এবং রমেন-বাবু মায়ের বিছানায় একেবারে স-টান শুইয়া পড়িয়াছে, মাত্র জুতা-পরা পা দুখানি তক্তপোষের নীচে আছে—ইহা উঁকি মারিয়া দেখিয়া সাধিকা নিজে গিয়া সদর দরজার খিল দিয়া আসিল, কারণ কিছু দিন ধরিয়া এ-রূপই স্বভাব তাহাদের হইয়াছিল। বাহিরের দরজা কখনই তাহারা খোলা রাখিত না।

রমেন শুইয়া পড়িয়া কাকীমাকে বলিল—কাকী-মা! আজ আমাদের 'মেস' বন্ধ। ঠাকুর বেটাচ্ছেলের অসুখ করেছে, আজ আসবে না, রান্না-বান্নাও হবে না। আজ আমি এখানে খাব।

এই বলিয়া সে ঝপ করিয়া উঠিয়া নিজের বুক-পকেটে হাত দিল এবং চমকিয়া বলিল—য়্যাঃ! কেটে নিয়েছে নাকি? তিনখানা দশ টাকার নোট যে পকেটে রেখেছিলাম—তাই ত!

কাকী-মা পকেট-কাটার কথায় একটু চকিতা হইলেও এ-দিক ও-দিক চাহিয়া তক্তপোষের নীচে তাকাইতেই তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল—রমেন-কথিত তিনখানা নোট মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—

এই যে তোমার টাকা রমেন!

রমেন বলিল—

কাকী-মা! পেয়েছেন? তাই ত এখানে শুতে গিয়ে পড়ে গেছে। কাকী-মা! আপনার কাছে ও এখন রেখে দিন, যাবার সময় দেবেন, নৈলে আবার যদি পড়ে যায়। কাকী-মা! ময়না কোথায়? ঐ যে দুষ্টু বুড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে। এস ময়না! এ-দিকে এস। বিমান এলে বলে দেব—তুমি আমার দেখে লুকোচ্ছ। এস। ও কি? আমি কি এ-বাড়ীর অ-চেনা? কাকী-মা কি আমার পর? কাকী-মা! ময়না ওরূপ কর্লে রমেন আর এ-বাড়ী মাড়াচ্ছে না, তা জানবেন। এস ময়না! এস, নৈলে নিশ্চয়ই বিমানকে বলে দেব।

ময়না তখন ঘরে ঢুকিয়া রমেন-বাবুকে বলিল—

হাঁ, তাই-ই বলে দেবেন, বিমান-দাকে বলে দেবেন—ময়না কাছে আসে না।

এই বলিয়া সাধিকা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ইন্দুমতীও ফোঁপাইয়া উঠিলেন।

রমেন তখনও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—কেন ইঁহারা কাঁদিয়া আকুল। সে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কি ময়না? ও কি কাকী-মা?

মাতা ও কন্যা উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন, তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়াছে। ইন্দুমতী সাধিকাকে বলিল—ময়না! সন্ধ্যে বাতি জ্বাল।

সাধিকা আর কাঁদিল না। সে উঠিল ও লক্ষ্মীর আসনের তেলের প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল। ধুনচিতে যে কয়েকখানা কাঠ-কয়লা ছিল, তাহা দেশলাইয়ের কাটিতে ধরাইয়া ফুঁ ফুঁ করিতে লাগিল এবং কয়লাগুলি ধরিয়া গেলে কিছু ধূপ তাহাতে ছড়াইয়া দিল। ধূপের গন্ধে ঘর আমোদিত হইল। তখন সাধিকা শাঁখটি দরজার আড়ালে লইয়া গিয়া বাজাইল।

রমেন অ-পলক-নেত্রে ঐ লক্ষ্মীর আসনের পটের দিকে এক ভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার এত কথা ধূপ-ধূনার গন্ধে মিলাইয়া গেল।

কিছু ক্ষণ পরে রমেন বলিল—

কাকী-মা! আপনি বুদ্ধিমতী হয়ে এত অবুঝ হন কেন? ছি! ময়না! ও-রূপ কর্তে নাই। কাকা গিয়েছেন, বেশ গিয়েছেন। বুড়া মানুষ, গঙ্গা-লাভ হয়েছে। এ-জন্য কেঁদে কেন তার মৃত আত্মাকে ব্যাকুল করা? কাঁদলে কি তিনি আসবেন? তা যদি হত, আমরা সবাই মিলে নয় কেঁদে দেখতুম—কাকা আসেন কি না। আমার মতে, কাঁদাটা লোক-দেখান।

দুঃখ থাকবে মনে মনে। তবে কাকী-মা! কাঁদাটা 'ফর্মালিটি' বটে। যেমন শুনেছি, আগেকার দিনে গ্রীস-দেশে যদি কেউ মরত, তবে সেই মৃতের আত্মীয়েরা লোক ভাড়া করে এনে নাকি এক পসলা কাঁদিয়ে নিত। কাকী-মা! আমার ছাঁকা কথা, কেউ মলে যদি প্রকৃত দুঃখই হয়, তবে লোক দেখিয়ে কেঁদে কেঁদে দুঃখ না করে, সম্রাট সাহজাহানের মত দুঃখ কর, যেমন সম্রাট সাহজাহান মমতাজের শোকে চুল দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিল আর জগৎ-গৌরব তাজমহল রচনা করিয়েছিল। তাই ত গল্প শুনি। আমার কিন্তু তা বিশ্বেস হয় না। যাক। আমার মোট সাফ কথা—দুঃখু থাকবে মনে মনে। কই কাকী-মা! বিমান যখন আসে আসুক, আমায় কিছু খেতে দিন, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ইন্দুমতী ও সাধিকা কোনও বিশেষ উচ্চ-বাচ্য না করাতে রমেন নিজেই বলিল—

দাঁড়ান কাকী-মা! আমি নীচে থেকে একটু আসি। দেখবেন, যেন আবার ঘুমিয়ে না পড়েন, তা হলে আমার আবার সেই ঠাকরুণকে ডাকতে হবে।

রমেন এই বলিয়া দৌড়াইয়া নীচে নামিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিল, এবং এক লাফে গলিটা পার হইয়া চিৎপুরের রাস্তায় পড়িয়া একটা খাবারের দোকান হইতে মস্ত বড় একটা চুপড়িতে করিয়া অনেক খাবার—টাকা তিনেকের মত—কিনিয়া আনিল এবং তর তর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া উপরে আসিল।

ইন্দুমতী ও সাধিকা আলো বেড়িয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

রমেন বলিল—

ময়না! এস, খাই। কাকী-মা! আমায় আগে কিছু দিন। ময়না!

এক গ্লাস জল আন ত। গরমও বড্ড পড়েছে। উঃ! ঘেমে গেছি এটুকু আসতে।

কাকী-মার হাত হইতে খাবার দুই একটি খাইয়া রমেন বলিল—

নাঃ, আর না। নাড়ী ত এই কলকাতার জলে একেবারে মরে গেছে। বাড়ী থেকে বেরুলে আর কি খাওয়া থাকে? বা গুচ্ছের খেয়ে হজম কর্তে পারি? ক্ষিদে ত না একটা উপসর্গ। খাই ও তাই ক্ষিদের অসুদ—হোমিওপ্যাথিক ডোজে। কাকী-মা! 'মেসে' উড়ে বিপ্রর হাতে খেয়ে খেয়ে এখন আর বাড়ী গিয়ে বা আপনাদের হাতে খেতে পারি না। কাকী-মা! সব ইন্দ্রিয়ই জয় করে এনেছি, সব ইন্দ্রিয়ই বশ মেনেছে—এই কেরাণী-জীবনে, আর 'মেস-হোষ্টেলে'র কল্যাণে। এক পারি নি চক্ষুরিন্দ্রিয়কে, সেইটা বশ মানে নাই কর্ণ এক ইন্দ্রিয়, তা অফিসে বড়-বাবুর বকুনি শুনতে শুনতে এখন ইচ্ছা হয় না, যে একটু ভাল কথা, কি ভাল গান-বাজনা শুনি। জিহ্বা এক ইন্দ্রিয়, তা উৎকল পাচকের পঞ্চকোল পাচন খেতে খেতে সাধ হয় না, একটু ভাল জিনিস মুখে দিই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু কাকী-মা! চোখ দুট বড় বেয়াদব, কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। তাকানই একটা রোগ। ভাল একখানা কাঁচা মুখ চোখে পড়লে, তার পানে না তাকিয়ে পারি না। আমি কাকী-মা! বড় সরল। সব স্বীকার করি। তাতে আপনি যা-ই বলুন না কেন।

রমেন সেই রাত্রিতে আর 'মেসে' ফিরিতে চাহিল না। কাকী-মা ত অবাক হইলেন। কিন্তু কোনও উপায় যে তাঁহার নাই। কাহাকে কি বলেন, তাহাই তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। এক সহায়ের মধ্যে সুবর্ণ। তাহার কাছেও কি এখন সমস্ত কথা বলা চলে? আর সমস্ত কথায় মেয়েকে টানিয়া আনা—না তাহাকে বিপদে ফেলা। তিনি সাধিকার বুদ্ধিও সমস্ত সময় লইতেন না।

সাধিকা অতি যত্নে রমেন-বাবুকে ছুটি রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিল। রমেন-বাবুও বিশেষ তৃপ্তির ভোজন করিয়া বলিয়াছিল—

ময়না! তোমার রান্না দু দিন পেটে গেলে এ-শুকন ডালেও ফুল গজাবে।

ময়না ইহাতে সন্তুষ্টই হইয়াছিল।

ইন্দুমতী এক বার ভাবিলেন—

এই ত সেই রমেন, যাহার পরিচয় তিনি বহু পূর্ব হইতেই পাইতেছেন। তাহা জানিয়া-শুনিয়া এই পুরীতে তিনি ইহাকে লইয়া কি রূপে রাত্রি বাস করিবেন? তাঁহার যে প্রথমেই ইচ্ছা ছিল রমেনকে বাড়ীতে না ঢুকিতে দেওয়া কিন্তু শেষে তাহাকে পাইয়া তাঁহার পূর্ব চরিত্র তিনি ত ভুলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কারণ সে বিমানের বন্ধু, অন্তরঙ্গ জন। তাহা হইলেও এখন যে তাঁহার মন মোটেই সরে না—এক বাড়ীতে বয়স্থা মেয়ের গৃহে ইহাকে রাখা। তিনি বড়ই চিন্তাকুলা হইলেন।

ইত্যবসরে সুবর্ণ আসিয়া কাকী-মা বলিয়া ডাক দিল এবং অন্য দিনের তুলনায় অধিক লজ্জিতা হইয়া বলিল—

কাকী-মা! উনি খেয়েছেন?

কাকী-মা জবাব দিলেন—

হ্যাঁ, খেয়েছেন। তবে সুবর্ণ! তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে আমি মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি আজ আসবে না। আমি তাই [illegible]ছিলাম—তোমায় ডাকাব।

সুবর্ণ বলিল—

না, কাকী-মা! একটা সংবাদ না নিয়ে কি ঘুমুতে পারি?

কাকী-মা চুপ করিলেন।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—

কাকী-মা! তবে আজ কি আমার এখানে থাকতে হবে?

কাকী-মা বলিলেন—

হাঁ। থাকতে ত হবেই। এ কয়েক দিনে এমন অভ্যাস হয়েছে, তুমি না-আসা পর্যন্ত যেন ছট-ফট করি, আর হারিকেনটি জ্বেলে দু জনায় মুখো-মুখি হয়ে তোমার আসার অপেক্ষা করি।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—

কাকী-মা উনি আপনাদের কি রকম আত্মীয়?

ইন্দুমতী বলিলেন—

বিমানের আপনার জন, তাইতে আমাদেরও বটে।

সুবর্ণ কহিল—

তা হলে আমার ত ভারি লজ্জা করছে। তবে ভদ্র লোক বেশ ভাল। আলাপ-ব্যবহার বেশ চমৎকার। আদব-কায়দাও বেশ জানেন। হবে না কেন? যে লোকের চেনা? হাঁঃ!

সুবর্ণ ইহা বলিয়া একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছু ক্ষণ পরে বলিল—

উনি কি শুনেছেন খবরটা?

ইন্দুমতী বলিলেন—

হাঁ, শুনেছে। তাই রাতে আমাদের ফেলে যেতে চাইছিল না। কিন্তু এক রাত আমাদের আগলিয়ে রাখলে কি হবে? বরং তাতে ভয় আরও বেড়ে যাবে। যাতে অভ্যস্ত হচ্ছি, তাই ভাল। আমি সে-জন্যই একে এখানে রাখতেই ইচ্ছে কর্ছি না। কিন্তু ঐ কি তাই শুনবে?

রমেন নৈশভোজনের পর প্রায় এক মাইল পাদ-চারণা করিত। তাই সে অভ্যাস মত তে-তলার ছাদে পায়ে চলিতেছিল। এক মাইলের সমান

সমান হাটিতে ছাদে অনেক বার তাহাকে এ-দিক ও-দিক যাইতে আসিতে হইয়াছিল।

ঐ কাজ শেষ করিয়া রমেন নীচে আসিয়া কাকী-মাকে বলিল—

কাকী-মা! আমি আপনার কোলের মধ্যেই শুয়ে থাকব। ময়না পাশের ঘরে থাকবে।

সহসা রমেনের দৃষ্টি সুবর্ণের দিকে পড়াতেই রমেন বলিয়া উঠিল—

এই যে আপনি এখানে? আপনি বিমানের জায়গা অধিকার করেছেন না কি? বেশ, থাকুন। রেতের বেলা শুয়ে শুয়ে শোনা যাবে—বিমানটা কি করে মল। আমার বিশ্বাস—ওর বুক খেয়ে গেছল। দেখছিলেন না ভাবনায় ভাবনায় ওর শরীরটা ইদানীং কেমন প্যা-কাঠি হয়ে যাচ্ছিল? তারপর হয়েছিল 'পক্স'। দুর্বল শরীরে সমস্ত রোগেই পেয়ে বসে। তবে দুঃখ—আমার তার সঙ্গে দেখাটা হল না। অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

রমেনের ইহা বলিতে বলিতে যেন মুখ জড়াইয়া আসিতেছিল।

সুবর্ণ বলিল—

কাকী-মা! উনি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ছেন। ওঁর বিছানা কোথায়?

ইন্দুমতী বলিলেন—

রমেন আমার কোলের কাছেই শুতে চেয়েছে। ঐ এক পাশে আমার বিছানা, আর এক পাশে রমেনের বিছানা।

ইহা বলিয়া তিনি 'রমেন—রমেন' বলিয়া ডাকিলেন ও ভাল হইয়া শুইতে তাহাকে বলিলেন।

রমেন আর উঠিল না। এক রূপ গড়াইয়াই ইন্দুমতীর খাটের সন্নিহিত জায়গায় শুইয়া পড়িল। তখনই তাহার গাঢ় ঘুম আসিল।

ইন্দুমতী তৎক্ষণাৎ হারিকেনটি ঐ ঘরের মধ্য হইতে লইয়া গেলেন,

সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণও বাহির হইল। তাহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া তে-তলায় উঠিয়া দেখিলেন—অ-দূরে রান্না-ঘরে সাধিকা খাইতে বসিয়াছে। একটি কেরোসিনের 'ল্যাম্প' তাহার থালার পার্শ্ব-স্থিত উবুড়-করা গেলাসের উপর। তাহার সাহস যেন আজ একটু বাড়িয়াছে।

মাতা সাধিকার কাছে পৌঁছিয়া চুপি চুপি বলিলেন—

ময়না! তুই আর তোর সুবর্ণ-দিদি তে-তলায় ঘরে শুবি। আমি আর রমেন দো-তলায় থাকব। কিছু ভয় নাই মা! ভয় করে আর কি হবে?

সাধিকা যন্ত্র-চালিতার মত মায়ের কথায় সায় দিল। সে সুবর্ণের পানে তাকাইয়া বলিল—

দিদি! আমি কি আজ-কাল ভয়ের কথা কিছু বলি? মা শুধু দিন-রাত আমায় সাহস দেন। হাঁ! ভয়!

ইন্দুমতী সাধিকার আশ্বাস-বাণীতে ভরষান্বিতা না হইয়াও বলিলেন—

বেশ, বেশ।

সুবর্ণ তখন বলিল—

কাকী-মা! তা হলে আপনি কিছু মুখে দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবর্ণ কাকী-মাকে এক বাটি দুধ ও দুইটা বরফি সন্দেশ দিল। কাকী-মা 'খাব না—খাব না' বলিয়া ভান করিলেন। কিন্তু সুবর্ণ তাঁহাকে ধমক দিল—

বুড়ী! না খেয়ে মর্বে?

অতঃপর কাকী-মা তাহা মুখে দিয়া এক ঘটি জল পান করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সাধিকা আহারান্তে সকড়ি বাসনগুলি জড় করিয়া মুখ ধুইয়া তে-তলায় আসিল। সুবর্ণের হাতে তাহার সাজা-পান ছিল। সে সাধিকাকে উহা

—তিন—

কুল গাছের কুল ফুরাইবার সময় হইল, আমের গুঁটি বেশ বড় হইতে চলিয়াছে, শিব-রাত্রির পরব কাটিয়া গেল, কিন্তু কার্তিকের দেখা নাই। নদের চাঁদের তাই বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। সে যেন মন-মরা হইয়া গুমট হইয়া বসিয়া থাকে; আর কোনও কাজ তাহার ভাল লাগে না। কার্তিক ছিল নদের চাঁদের, নদের চাঁদও ত কার্তিকের বটে। তাই সে চেলা হারাইয়া বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছিল।

তাহার বাপ উদ্ধবচন্দ্র তাহাকে যে-কোনও কাজে বলিতেন, সে যেন চড়া-চড়া কথা বলিয়া দুম-দুম করিয়া বাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া খেজুর-তলা অথবা খড়ের পালার আড়ালে গিয়া বসিয়া থাকিত। আর তাহার মা কোনও কাজের ফরমাস করিলে 'পার্ব না' বলিয়া ঝাঁকিয়া উঠিত। মাতা পুত্রকে বকিয়া উচ্ছন্ন দিতেন, আর বলিতেন—

হারাম-জাদ! খাওয়া আসে কোথা থেকে? রাশ রাশ খাবি, আর কুঁদে বেড়াবি? লক্ষ্মী-ছাড়া! মর, মর।

পুত্র মাতার কর্কশ স্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিত—এমন গলা শুনি নি। কথাগুলা যেন এক একটা বঁড়া বাঁশের ওপর কুড়ুলের ঘা। ভগবান তোমাকে মাগী করেছিল কেন? মেয়ে জাতের মতন ত কিছু দেখি না।

মা ছেলের এমন অপমানী কথায় আরও জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতেন—

শূয়োর! বয়াড়! নিয়ে যা তোর বউ-মাগীকে, আর বাচ্চাগুলিকে, পার্ব না খেতে দিতে। বছর-বছর মাগী আবার একটা করে বিয়োচ্ছে।

এই বলিয়া নদের চাঁদের মাতা যেমন কুরুক্ষেত্র করিতেন, নদেও তাহাতে নিরস্ত্র সৈনিক হইত না। কিন্তু নদের চাঁদের পিতা পুত্রের ভয়ে জড়-সড় হইয়া নদের চাঁদের মাতাকে, হয় ঠেঙ্গা লইয়া তাড়া করিতেন, আর না হয় ভাঙ্গা একখানা প্র-পিতামহের আমলের পিঁড়ি ছুঁড়িয়া মারিতেন।

পত্নী ঐ সময় স্বামীকে আনিয়া ঘাড় ধরিয়া ঘরের হাতিনায় বসাইয়া দিতেন। তখন স্বামী নিরুপায় হইয়া বলিতেন—

মর খুনো-খুনি করে দু জনে। ও দবীর মা! তোরা একটু এ-বাড়ী আয়। এ-গুলো ত খুনো-খুনি করে মল, একটু ঠেকা, আমি ত মহামুস্কিলে পড়লাম।

তখন দবীর মা, চিন্তার বউ, রমার বোন প্রভৃতি স্ত্রী-সেনানী আসিয়া নদেকেই বকিত। নদের চাঁদ কিন্তু তাহাদের কথা বেশ শুনিত। তাহার পাড়ার লোকের সঙ্গে ভাব রাখা যে অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহার কারণ অবশ্য বড়ই সুস্পষ্ট ছিল—দিনের মধ্যে তেষট্টি বার তামাক টানিয়া কলিকা ফাঁটাইতে আর কোথায় সে পারিবে? বাড়ীতে অত তামাক কিনিবার পয়সা যে বড়ই অ-প্রতুল। মালসায় আগুন রাখিবার জন্ত মাতা যে পুত্রকে এক মুঠ তুষ দিতে গালাগালি করিয়া ভুত ছাড়াইতেন।

এমন পরিবারে নদের চাঁদের জন্ম, বৃদ্ধি, শিক্ষা।

বাল্য-কাল হইতেই নদের চাঁদের পড়ার প্রতি বিশেষ অ-রুচি ছিল মাতা পড়ার কথা বলিলেই সে গিয়া পিতার কার্যে সাহায্য করিতে লাগিয়া যাইত, যথা, পাটের দড়ির লেছি তৈয়ারী করিয়া দিতে, অথবা হোগলার বেড়ার চটা চাঁছিতে, অথবা যজমানী করিতে যাইবার সময় গামলাটা বহিয়া লইয়া যাইতে।

যদি এমন কোনও না-কাজের সময়—যেমন ঠিক বেলা দুইটা-আড়াইটার কালে তাহাকে পড়িতে বসিতে তাড়া দেওয়া হইত, তবে হয় ত সে বেত-বাগানে লুকাইয়া বেত-ফল খাইত, না হয় ঝোঁপের ভিতর কাদা-খোঁচা ডাহুক-ডাহুকীর প্রেম-বিরহ লক্ষ্য করিত, অথবা তেপান্তরের মাঠে গিয়া এ-গরুকে খোঁচা মারিত, ও-গরুর লেজ ধরিয়া মোচড়াইয়া তাহার সঙ্গে ছুটিত।

শেষে বেলাটি বৃথা কাটাইয়া সন্ধ্যা ঘোর হইলে সুন্দর বাড়ী ফিরিত। তখন হয়, পিতা তাহাকে খড়ম-পেটা করিতেন, না হয়, মাতা থুন্তী পোড়াইয়া দাগ দিতেন। সে আর তখন কি করিবে? ষ্যাঁ ষ্যোঁ করিয়া কাঁদিয়া এক থালা ভাত গিলিয়া ঘুমাইয়া পড়িত।

এই রূপে তাহার শিশু-শিক্ষা হইয়াছিল।

এখন তাহার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি সমদ্দার, শুদ্ধ শ্রোত্রীয়। বিবাহে নাকি পণ বাবদ এক শত এক টাকা নগদ পাইয়াছিল।

তাহার বধূটি যে নেহাৎ কুৎসিত ছিল, তাহা নহে। কলিকাতার রাস্তায় কাবলী সু পায়ে দিয়া, সায়া-সেমিজ পরিয়া, গাউন-শাড়ী গুঁজিয়া (চোখে চশমা হইলে ত ভালই হয়) হাতে মাত্র কয়েকটি চুড়ি ও কব্জি-ঘড়ি পরিয়া, মাফ-চেন ঝুলাইয়া-হাটিয়া গেলে কে না তাকাইবে এমন তরুণ, যাহারা কলেজে পড়ে বা হালী কলেজ-ছাড়া 'ক্রসড-ইন-লভ'?

কিন্তু সেই বধূই এখন শাশুড়ীর গালাগালি খায়, আর চোখের জলে ভাসিয়া নির্দয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ছেলে-মেয়ের মা সে না হইয়া কোথায় যাইবে?

নদের চাঁদ কার্তিকের সহ-পাঠী ছিল না, প্রায় সম-বয়সী ছিল। হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যায়, অথবা পাড়ার বিন্দুর মাকে জিজ্ঞাসা

করিলে তিনি (অবশ্য তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে) বলিয়া দিবেন—ও-পাড়ার হরবিলাস আর চক্কোত্তিদের পদি দু মাসের ছোট-বড়। হরবিলাস হয় এক অঘ্রাণে, পদি হয় শ্রীপঞ্চমীর দিনে, তা হলে কার্তিক আর নদে দু বছরের ছোট-বড়। অর্থাৎ এমন হিসাব যাহাতে 'ইউক্লিড'ও হার মানিয়া যাইবে—দুই বাহু পরস্পর অ-সমান হইলেও একেবারে মিলিয়া যাইবে।

যাহা হউক কার্তিক নদের চাঁদের বোধ হয় বছর দুয়েকের ছোট। সে নদের চাঁদের এক পাড়ার না হইলেও, এক ক্লাসে না পড়িলেও জহুরী হইয়া জহর চিনিয়াছিল।

সেই কার্তিক বিহনে আজি নদের চাঁদ মণি-হারা ফণী। সংসারে তাহার কিছু ভাল লাগিত না। তবুও নির্দয়া মাতা তাহাকে ও তাহার পত্নীকে ছেলে-পিলে লইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

হায়! এই নদের চাঁদই যে কার্তিক বাড়ী থাকিতে মাতাকে কত সময় কত হিঞ্চার ডগা, কলমী শাক জল সাঁতরাইয়া তুলিয়া দিয়াছে। অ-কৃতজ্ঞা মাতা কি তাহা এখন এক বার ভাবিয়া দেখে? সে-বার দীঘলিয়ার মিত্তির বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড নিমন্ত্রণ ছিল। সারদাচরণ মিত্রের ৺গঙ্গা প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্রেরা মহাঘটা করিয়া দান-সাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিল। কত দিগ্দেশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ টিকিধারী নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণিক, তার্কিক, স্মার্ত, বৈদান্তিক পণ্ডিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন।

নদের চাঁদ ইঁহাদের এক জন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কত বড় একটা পিতলের বালতি আদায় করিয়া, শেষে উহা বিক্রয় করিয়া, পরিশেষে একটা বকনা বাছুর অগ্র-দানীর নিকট হইতে পাঁচ সিকি পয়সা দিয়া কিনিয়া আনিয়া মাতাকে দিয়াছিলেন। মাতা কি সেই বকনার দুধের আস্বাদ আজও পাইতেছেন না? কিন্তু সেই গাভীর দুগ্ধের এক চুমুক

তুখও আজ নদের চাঁদের মাতা নদের চাঁদের তৃতীয়া কন্তাকে দিতে গর-রাজী। ইহা তাঁহার মাতৃ-ধর্ম্মের কলঙ্ক নহে কি ?

নদের চাঁদ এই সব ভাবিয়া আরও মর্মাহত হইয়াছিল। সে তাই এক মনে কামনা করিত—মা মরুক।

কাতিকচন্দ্র বাড়ী হইতে যাইবার পরও নদের চাঁদ দিন কতক ঠিক পূর্বকার জীবন যাপন করিয়াছিল। অর্থাৎ মায়ের সহিত ভাব রাখিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে-দিন কি হইল!

এক দিন ঘুম থেকে উঠিয়া হাত মুথ ধুইয়া আসিয়া সে মাকে বলিয়াছিল—

মা, ছুট মুড়ি নামিয়ে দাও ত। ক্ষেতে বেশ মোটা মূল হয়েছে, তাই দিয়ে থাব।

মাতা ইহা শুনিয়া অগ্নি-শর্মা হইয়া বলিয়াছিলেন—

ও বাবা! তুই হলি কি! তিন-চারটে ছেলে-মেয়ের বাপ হতে চল্লি, এথনও সকালে থাওয়া ? আর কাপড়-ছাড়া, সন্ধ্যো-আহ্নিক কি তুই চুলোয় দিইছিস ?

এই দিন হইতেই মায়ের সঙ্গে নদের চাঁদের তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হইল।

মাতা যেন পুত্রের চোথের বিষ হইল।

হায়! সে ভাবিয়াছিল—ঐ মুড়ি থাইয়া সে পূর্ব দিকের বাড়ী-ঘেঁষান বিষ-কাঁটালিগুলি তুলিয়া ফেলিবে। সকাল হইতে উহা তুলিতে আরম্ভ করিলে বেলা দুপুরের আগে সব তোলা হইবে। দিনের রৌদ্র পাইলে সেগুলি শুকাইয়া যাইবে। আর তারপর আহারাদি শেষ করিয়া একটু ঘুমাইয়া বৈকালে তিনটা-চারটার সময় সে বাড়ীর দক্ষিণের পুকুর হইতে জলে ভেজান বাঁশ তুলিয়া, কাটিয়া গোঁজা বানাইয়া ও বাথারি

তৈয়ার করিয়া লাউ গাছের জাঙ্গালাটা বাঁধিয়া ফেলিবে। কিন্তু বাঙাই অতি প্রত্যূষে সে-দিনকার জঙ্গাল বাঁধাইলেন, আর তাহার কিছুই ভাল লাগিল না।

সে তদবধি মায়ের সঙ্গে আড়া-আড়ি দিয়া চলিল। মাতাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। কেন তিনি ছাড়িবার পাত্রী থাকিবেন?

শুনিয়াছি—নদের চাঁদের পিতা যখন তৃতীয় বার বিবাহ করেন, তখন ও-পাড়ার অক্ষয় বাড়ুয্যে কাঁচা নয় শত টাকা মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়া নদের চাঁদের পিতাকে বিবাহ দেওয়াইয়া আনিয়াছিলেন। নদের চাঁদের মাতার বয়স তখন নয় বৎসর ছিল। বৎসর প্রতি তাঁহার এক শত টাকা দাম পড়িয়াছিল। অবশ্য নদের চাঁদের দাদা-মহাশয় নদের চাঁদের মায়ের প্রতি বৎসরে দেড় শত টাকা অর্থাৎ নয় বৎসরে মোট সাড়ে তের শত টাকা দাবী করিয়াছিলেন।

নদের চাঁদের এত দামী মায়ের দাপট কি তাই কোনও মতে কম হইতে পারে? ছেলের তিনি কেন তোয়াক্কা রাখিবেন? হক না তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশের ঘেঁষাঘেঁষি? দাঁত ত একটিও পড়ে নাই? হক চুল একটি-আধটি বর্ণ-চোরা? উহাতে শীঘ্রই রং ফলিলে ত ভালই হইবে; গায়ের রংকে বেশ চিনাইয়া দিবে—আমি তোমা অপেক্ষা ফর্সা হইয়াছি। হাতে-পায়ে তাঁহার এখনও বেশ জোর নাই কি? নেহাৎ দুই ক্রোশ না হাঁটিলে তাঁহাকে বসিতে হয় কি?

মাতার চক্ষু-শূল হইয়া নদের চাঁদ প্রায়ই বাড়ী থাকিত না। তাহার মনে কার্তিকের অভাব জাগিত। সে এর বাড়ী, তার বাড়ী করিয়া বেড়াইত, আর খাওয়ার সময় আসিয়া ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া খাইত। তাহার চেষ্টা ছিল,—কোনও মতে দুইটা নাকে মুখে দিয়া বাটীর বাহির হইতে

পারিলে হয়। তারপর ঐ বুড়ী যাহা ইচ্ছা, তাহা করুক। কিন্তু এ-রকম করিয়া কত দিন চলে?

এক দিন বাড়ীতে রান্না করিবার তরকারী-পত্র বিশেষ কিছু ছিল না। নদের চাঁদের বউ তাই রান্না করিবার জিনিষের অভাব বোধ করিল, শুধু চারটি ডাল তাহাকে সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে সে মহাবিপদ গণিল, কারণ তাহার স্বামী ডাল স্পর্শ করে না, ও খাওয়ার তরকারী না থাকিলে বিশেষ কলহ করে। অবশ্য বধূ-মাতা ঠিকই বুঝিয়াছিল, তাহার শ্বশ্রূ-মাতার একান্ত ইচ্ছা, যে তাহার স্বামীর সঙ্গে ঐ ছুঁতায় তিনি গোলমাল করেন—কেন সে জাল ফেলিয়া পুকুর হইতে মাছ ধরে নাই, যদিও তাহাকে এ-কয়েক দিন ঐ রূপই ইঙ্গিত করা হইতেছিল, নতুবা এত তরকারি ক্ষেতে থাকিতে শাশুড়ী বৃথা অজুহাতে সেগুলি তুলিতে দিবেন না কেন? লাউ গাছে যে কয়েকটি লাউ ফলিয়াছিল, তাহার সবগুলিই মাতা 'বশ' করিবার জন্য পাকাইয়া বুড়া করিতেছিলেন। বেগুন গাছে এত বেগুন আছে, তাহার একটিও তিনি তুলিবেন না, সেগুলি বীজের জন্য থাকিবে। কুমড়া বসিয়া বসিয়া পাকিতেছে, উহা দ্বারা ভরা-বর্ষার সময় চলিবে। অন্যান্য শাক-পাতা তিনি ছিঁড়িবেন না, তাহাতে গাছ মরিয়া যায়। ক্ষেতে কড়াই শুঁটি ফুরাইয়া গিয়াছে।

বধূ-মাতা তাই স্পষ্ট অনুমান করিল, আজ দ্বি-প্রহরে না জানি কি প্রমাদই ঘটে! সে নিজ মনে নিজেকে বলিল—

যদি এক বার দাদা আসত, তবে গিয়ে পার হতাম, আর এই খেঁচা-খেঁচির সংসারে পা দিতুম না। নিত্য, ত্রিশ দিন কি আর এ-ধাতে সয়? কেন মাছ ধরে নি, তাই শুধু ভাত খাবে, যদিও যথেষ্ট তরকারি পুঁজি আছে। এ জেদ নয়?

বধূ-মাতা এ-জন্য বিশেষ ভীতা হইয়া শাশুড়ীর নির্দেশ মত ডাল, ভাত রাঁধিয়া রাখিল।

বেলা প্রায় বারটা বাজে কিন্তু স্বামীর দেখা নাই। শ্বশুর-মহাশয় নীরবে ছুটি ডাল, ভাত খাইয়া উঠিয়া আস্তে ঠুক-ঠুক করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্বশ্রূ-মাতা মুখখানা হাঁড়ি করিয়া গিয়া পা ছড়াইয়া বাস্তু-ঘরের দরজায় বসিয়া রহিলেন। বধূ-মাতাও রান্না-বান্না শেষ করিয়া রান্না-ঘরেই মেয়েটিকে বুকের দুধ টানাইতে টানাইতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে একটা বাজিয়া গেল। তবুও নদের চাঁদ আসিল না। শেষে নদের চাঁদের মাতা দুপ-দাপ করিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গিয়া পার্শ্ব-স্থিত বাড়ীর ভোম্বলকে গলা ছাড়িয়া ডাক দিলেন, যে নদে কোথায় গেল, হারাম-জাদা কি মল ?

ভোম্বল বামুন-দির প্রশ্নোত্তরে বলিল—

নদে-দা এ-বেলায় আসবে না। আমি ও নদে-দা ও-গ্রামে চৌধুরী-বাড়ী যাত্রা-গান শুনতে গেছলাম, আমি চলে এসেছি, নদে-দার পালাটা খুব ভাল লেগেছে বলে ওর শেষ না শুনে সে ফিরবে না। যাত্রার দল বরিশালের ঝালকাঠি থেকে এসেছে, বেশ ভাল গায়। বিশেষতঃ 'ঘোরা-সুর-বধ' পালাটায় তাদের খুব নাম।

বামুন-দি ভোম্বলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

যাত্রা কখন ভাঙ্গবে ?

ভোম্বল কহিল—

সাড়ে চারটা-পাঁচটা হবে।

বামুন-দির ক্রোধের যেন পরিসীমা থাকিল না। একে ত তিনি নদের-চাঁদের উপর চটিয়াই আছেন, তাহাতে এই সংবাদ।

চৌধুরীদের বাড়ী ঐ গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। সেই দূরতর স্থানে পুত্র যাত্রা-গান শুনিতে গিয়াছে, ইহাতে বাড়ীতে কিছু বলিয়া যায় নাই, ইহা কি কম ক্রোধের বিষয় ?

বামুন-দি সাঁই সাঁই করিয়া বধূ-মাতার কাছে গেলেন এবং রান্না-ঘরের মেঝের-শোয়া বধূ-মাতাকে ক্রুদ্ধ-স্বরে ডাকিয়া তুলিয়া বলিলেন—

বউ-মা ! নদে কি খেয়েছে ?

বধূ-মাতা জবাব দিল—না, মা !

শাশুড়ী বলিলেন—

খায় নি ? ও-সব ন্যাকামি রেখে দাও। জান, ধাঁড়ী, বাচ্চা এ-বাড়ী থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় দোব। দাঁড়াও। আসুক। ঠিক বিদেয় দেব। যদি না দিই, তবে আমার নাম বেহ্ম নয়।

বধূ-মাতা শ্বশ্রূ-মাতা-ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া চোখে বস্ত্রাঞ্চল দিল, কারণ এ-যাবৎ সে দূর করিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়াছে, কিন্তু 'ঝেঁটিয়ে বিদেয়ের' কথা শোনে নাই। সে ক্রোড়স্থিত কন্যাটিকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। মাতৃ-ক্রোড়ের অর্ধ-সুপ্ত কন্যা-রত্ন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বধূ-মাতা তাহার প্রতি ভ্রূ-ক্ষেপ না করিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেই লাগিল।

ব্রহ্মময়ী ইত্যবসরে বাস্তু-গৃহ-মধ্যে অতি দ্রুত প্রবেশ করিয়া এক লাফে মাচার উপর উঠিয়া সমস্ত হাতখানি মুড়ির কলসির ভিতর ঢুকাইয়া দিলেন এবং দেখিলেন—মুড়ির ভিতর লুকান পাটালি গুড়ের অর্ধেকও নাই, মুড়িও অর্ধ কলসি হইয়া গিয়াছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবিয়া ফেলিলেন—

নদে নিশ্চয়ই মুড়ি, গুড় কাপড়ে বাঁধিয়া অতি ভোর বেলা যাত্রা শুনিতে বাহির হইয়াছে। নতুবা এত বেলা না খাইয়া সে কিছুতেই রহে নাই।

ব্রহ্মময়ীর পুত্রের উপর যে কি-ক্রোধের উদ্রেক হইল, তাহা আর কেহ না বুঝিলেও ঐ ঘরে যে-বৃদ্ধ খাইয়া শুইয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন।

পত্নী এক দৌড়ে স্বামীর ঘরে গিয়া স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীকে এত জোরে ধাক্কা দিলেন, যে তাহার ঘাড়ের বেদনা সারিতে রীতি মত মালিস দিতে হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধের ঘাড়ের বেদনা আজ পর্যন্ত সারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

স্বামী গৃহিণীর গায়ের বল দেখিয়া হিন্দু-শাস্ত্র-কারদের তখন বাস্তবিকই নিন্দা করিয়াছিলেন এই বলিয়া, যে এ-জাতিকে যাঁহারা অ-বলা বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এমন স্ত্রী-রত্ন-লাভের সৌভাগ্য হয় নাই।

নদের চাঁদ সে-দিন যাত্রা শুনিয়া যখন বাড়ী পৌঁছিয়াছিল, তখন বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। ব্রহ্মময়ী মন ভারী করিয়া পার্শ্ব-স্থিত দবীর মার বাটী গিয়া গল্পের আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন এবং দবীর মার নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছিলেন, যে বড় বৌ বড়ই মুখরা, মিথ্যা-বাদিনী, দজ্জালা। তাহার বাপের কুলে কেহ নাই, যে এক বার এ-বাড়ী হইতে তাহাকে লইয়া গিয়া নদেটাকে রক্ষা দেয়। নদেকে পরামর্শ দিয়া বড় বৌই এমন খারাপ করিয়াছে।

দবীর মাও ব্রহ্মময়ীর কথায় পূর্ণ সায় দিয়া ফিস ফিস গলায় চোখ মুখ ভেংচাইয়া কত-কি কহিল। সে জাতিতে নাপিত ছিল এবং জাত্যনু-যায়ী শঠতা তাহার যথেষ্ট ছিল।

সে চুপি চুপি বলিল—

তা নৈলে মাসি! নদের চাঁদ এমন সোনার ছেলে, বয়সও তার কম হয় নাই, সে কিনা মাকে বলে—হারাম-জাদি, তুই কেন আমায় জন্ম দিয়েছিলি? তোর গর্ভে জন্মে আমার এমন খোঁয়াড়, দুগগতি। ও-পাড়ার

কার্তিক কেমন বউ নিয়ে বাসায় থাকে, আর আমার বৌ এখানে বসে ধান ভানছে, বিষ-কাঁটালি পুড়িয়ে ভাত রাঁধছে, আর উঠন ঝেঁটোতে ঝেঁটোতে তার কোমরটা মোটা হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা মাসি! এ-সব বৌয়ের শেখান-কথা না? কার্তিক কালিয়ায় বিয়ে করেছে, তাদের একটা শিক্ষিত জায়গা, সেখানকার মেয়েরা কেমন চলে-ফেরে, আমাদের দেশের মেয়েরা কি ও-রকম পারে? ঐ বৌ-মাগীর ইচ্ছে, কার্তিকের বৌয়ের মত সে বাসায়-বাসায় থাকে, আর সোয়ামীকে করে রাখে হাতের পায়রা। ঐ বৌ-ই তোমার হচ্ছে খারাপ। আর দেখ—নদের চাঁদের বুদ্ধি আজ-কাল কেমন হয়ে গেছে, সংসারে যেন তার মনই লাগে না। মাসি, সে আমার কাছে চুপি চুপি গেছে-বিষ্যুদবার বলেছে—শীগগিরই সে কলকাতা চলে যাবে, মাত্র তার পথ খরচাটা জোগাড় হলেই হয়। শেষে কলকাতা গিয়ে আর কিছু না পারে, মুটে-গিরি করে খাবে, ফিরিওয়ালা-গিরি করে পেট চালাবে, তবু আর এ-সংসারে থাকবে না।

ব্রহ্মময়ী দবীর মাঁর কথায় একটু চিন্তিত হইলেন, আর ভাবিয়া দেখিলেন—নদের চাঁদ হয় ত রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মাথায় ইহা কখনও ঢোকে নাই, ঐ দবীর মা-ই নদের চাঁদকে এই পরামর্শ দিয়াছে—কেন সে বাড়ী থাকিয়া দিন-রাত এত ক্যাট-ক্যাটানি সহ্য করে? কেন সে বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা গিয়া যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া বউ ছেলে-মেয়ে লইয়া বাসা করিয়া সুখে না থাকে?

যাহা হউক ব্রহ্মময়ী ওখানে আর অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এক পায়ে দুই পায়ে বাড়ী আসিলেন।

এ-দিকে নদের চাঁদ বাড়ী পৌছিয়াই দেখিয়াছিল—তাহার ছেলে-

মেয়েগুলা এখানে-ওখানে ধুলায় গড়াইয়া কাঁদিতেছে, কাহারও নাক দিয়া বিশ্রী বাহির হইতেছে ও চোখ মুখ ফুলাইয়াছে।

সে এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া বাড়ীতে কাহাকেও না দেখিয়া সরা-সরি রান্না-ঘরে গিয়া এক ফোঁটা তেল লইয়া স্নান করিতে যাইবে—ভাবিল। মাতা যে বাড়ী নাই, সে-জন্য সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস যে না ফেলিল, তাহা নহে।

কিন্তু রান্না-ঘরে তেলের ভাঁড় ঝুঁকিয়া আনিতে গিয়া তাহার চোখে যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার সারা দিন না-খাওয়ার ও না-স্নান করিবার জন্য যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা অপেক্ষা বহু শত গুণ কষ্ট হইল। সে দেখিল—

তাহার বধূ কাদা, জলের মধ্যে পড়িয়া লুটাইতেছে। মুখে যেন কত অশান্তি, কত উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছেলে, মেয়ে, বিশেষতঃ কোলের মেয়েটা যে কোথায়, তাহাও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। শিশুটির মাথায়, গায়ে কাদা শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে গিয়া পাস্থার বেড়ার ধারে শীর্ণ হইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছে।

বাস্তবিক নদের চাঁদ এ-সংসারে অত দুঃখের মধ্যে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাহার মুগ্ধা বধূকে। অমন লক্ষ্মী বউ বোধ হয় আর দুটি পাওয়া যাইবে না, ইহা পর-শ্রী-কাতরা দবীর মাও মনে মনে না স্বীকার করিত, তাহা নহে।

নদের চাঁদ আস্তে আস্তে তাহার পত্নীকে ডাকিল। পত্নীও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল—প্রায় অন্ধকার হইয়াছে, কিন্তু যাঁহার জন্য চিন্তা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই চিন্তার সুখ, আঁধারে-আলো তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া। তাঁহার আহার হয় নাই, স্নানও হয় নাই, শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ।

বধূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—

একেবারে সন্ধ্যে করে এসেছ। কখন নাইবে? কখন খাবে? যাও, যাও, দেরী করো না। মা যেন কি কাণ্ড বাঁধান। লক্ষ্মী প্রাণ আমার! তুমি মায়ের কথায় কোনও জবাব দিও না, তোমার পায়ে পড়ি। যাও, ওঠ। ঐ যে তেলের ভাঁড় তোমার সামনে। আর স্নান না কর্লে, বেলা গেছে, হাত-পা ধুয়ে এস। আমি ভাত বাড়ি।

নদের চাঁদ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—

দেখ কমলা! 'ঘোরাসুর' যে বিক্রম দেখিয়েছে, তা আমার মাও সে-দিন আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার সময় দেখাতে পারে নি।

কমলা স্বামীর এই কথায় জিহ্বা দাঁতে কাটিয়া বলিল—

ছিঃ! তুমি হলে কি? চির কালই তোমার এক ভাবে যাবে? ওঃ! বুঝেছি, কার্তিক ঠাকুরপোর দোসর তুমি হয়েছ। ঠিক তার মত যা না-বলার, তাই বল। মা যে পরম গুরু। কথায় বলে—কু-পুত্র অনেক হয়, কু-মাতা কখনও নয়। তুমি লক্ষ্মী। বুদ্ধি ঘরে নাও। কার্তিক ঠাকুর-পো ও-রূপ হলেও, তিনি এখানে থাকতে ত তুমি এতখানি ছিলে না। তিনি গেছেন, আর তোমার বুদ্ধি গেছে। তিনি কি তোমায় তার বিদ্যের বরাত দিয়ে গেছেন?

নদের চাঁদ একটু তেল মাথায় ঘষিতেছিল, আর যাত্রা-গানের সহস্র-মুখী প্রশংসা-বাদ করিতেছিল, ইত্যবসরে মাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

বেশ ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বৌ নিয়ে পালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। বেশ, তাই হোক। আমি এ-সব অন্যায় চোখে দেখতে পার্ব না—যে দিন-রাত বৌয়ের সাথে ফুসুর-ফাসুর, আর আমার নিন্দে আপনি কচ্ছেন এক বার, উনি কচ্ছেন এক বার। যান, পালান, এ-বাড়ীতে আর ভাত নাই।

এই বলিয়া মাতা পুত্রকে উঠান ঝাড় দিবার ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিলেন।

কমলা এক নয়নে তাকাইয়া রহিল। সন্তানগণ ঠাকুর-মার চীৎকারে চেঁচাইয়া উঠিল।

নদের চাঁদ কিছু কাল এক ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে ঘাটের দিক চলিয়া গেল।

কমলা মনে করিল—স্বামী স্নান করিতে গিয়াছে।

বাড়ী হইতে নীচে মাঠে নামিয়া নদের চাঁদ আর পুকুরের দিকে গেল না। সে এক মনে মাঠের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া একটা ডোবা হইতে একটু জল হাতে তুলিয়া মাথায় চাপড়াইয়া মাথাটা ঈষৎ ধুইয়া ফেলিয়া বরাবর চারু-দির কাছে গেল।

চারু-দি নদের চাঁদকে বাড়ীতে পৌঁছিতে দেখিয়া বলিলেন—

ও কি নদের চাঁদ? ও কি ভাই! তোমার কি হয়েছে? কত দিন যে তোমায় দেখি না? তোমার শরীর দেখি অর্ধেকও নাই। মুখখানা যে বড্ড শুকন। খাওয়া-দাওয়া হয় নাই নাকি?

নদের চাঁদ হাসিয়া বলিল—

দিদি! রাগ কর্বে না ত? বল, তা হলে বলি।

চারু-দি বলিলেন—

না, রাগ কর্ব না।

নদের চাঁদ বলিতে লাগিল—

চারু-দি! আজ সকালে চৌধুরী-বাড়ী যাত্রা শুনতে গেছলাম, আর এখন এই পথে ফিরছি। অনেক দিন তোমার সাথে দেখা হয় না, এখন এক রকম তোমাদের থলট দিয়ে যাচ্ছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখাটা করে গেলাম।

চারু-দি অবাক হইয়া বলিলেন—

ও বাবা! এখন বেলা দেখি ডুবু-ডুবু। এখন যাত্রা শুনে ফিরছ? হ্যাঁরে! ভাল সখ। তা যাক, বাড়ী এখন যেতে পার্বে না। যাত্রা শুনে মাথাটা গরম হয়েছিল, তাই বুঝি মাথায় জল দিয়েছ? তা বেশ। ছুট চিড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে, কাঁচা দই দিয়ে দিচ্ছি, তাই খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা কর। এখন কিছুতেই না খেয়ে বাড়ী যেতে পার্বে না। বস, তোমার সাথে অনেক কথাও আছে!

চারু-দির কথা মত নদে-ভাই খাইতে বসিল। এবং একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

চারু-দি! তুমি আমার দিদি না হয়ে যদি মা হতে!

এই সময় অরুন্ধতী আসিয়া বলিলেন—

ও কি নদের চাঁদ! আমার সোনার চাঁদ! তুমি কি বাছা ডুমুরের ফুল হয়েছ? কার্তিক বাড়ী নাই, আর নদের চাঁদ-কার্তিকের দেখা নাই।

চারু-দি হাসিয়া মায়ের কাছে বলিলেন—

মা! শোন, কি বিদ্ঘুটে কথা! এই এখন যাত্রা-দলের গান শুনে ফিরছে। শুনতে গিয়েছিল—সেই ভোর পাঁচটায়।

অরুন্ধতী এই সংবাদে মাথায় হাত দিলেন এবং নদের চাঁদকে ঐ ভাজা-পোড়ার সাথে ও-বেলার ঠাণ্ডা ভাত ও মাছের ঝোল দিতে কন্তা চারুবালাকে বলিলেন।

নদের চাঁদ ভাত খাইতেছে, আর মাতা-কন্তা নদেরচাঁদের চরিত্রের অমায়িকতার প্রশংসা করিতেছেন। ইত্যবসরে পোষ্টাফিসের পিওন মতি একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আনিয়া বলিল—

মা-ঠান! একটা টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামের শব্দে সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন, কারণ এ-বাঙ্গালীর —বিশেষতঃ পল্লী-গ্রামের বাঙ্গালীর ঘরের টেলিগ্রাম—হয় ইহাতে মৃত্যু-সংবাদ অথবা ঐ রূপ কিছু সাংঘাতিক খবর থাকে। ইহা বিদেশীয় রীতির নহে, যে কথায়-কথায় 'ওয়্যার' কর। এত পয়সা এ-দেশীয়েরা কোথায় পাইবে?

নন্দের চাঁদের আর খাওয়া হইল না। সে এক দৌড়ে ঘাটে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া বরাবর গাঙ্গুলি মাষ্টারের বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাঁহাকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—

মাষ্টার-মশায়! শীগগির চলুন, চারু-দিদির একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

নন্দের চাঁদের যে টেলিগ্রাম পড়িবার বিদ্যা ছিল না এবং পল্লী-গ্রামের যে অনেকেরই তাহা থাকে না, এ-জন্য গাঙ্গুলি-মাষ্টার নিজেকে গর্বিত মনে করিত। পাড়ার লোকেও এ-জন্য তাহাকে যত শ্রদ্ধা করিত, তত শ্রদ্ধা বোধ হয় সেক্সপীয়র তাঁহার 'ষ্ট্রাড-ফোর্ড-অন-এভনে' পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি মন্থর-গতিতে আসিয়া গম্ভীর ভঙ্গিমায় টেলিগ্রামটি খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন—

ব্রহ্মাণ্ডনাথ টেলিগ্রাম করিয়াছেন :—

তাঁহার 'পক্স' অর্থাৎ 'মায়ের দয়া' হইয়াছে। তিনি এ-জন্য ভাবনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

—চার—

সুবর্ণ অনেক দিন হইতেই ভাবিতেছিল—সাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিবে, বিমান-বাবুদের সঙ্গে তাহাদের কি-রূপ সম্পর্ক ছিল। সাধিকাও তেমনই মনে করিতেছিল শুনিবে—সুবর্ণের এই মন্দ ভাগ্য কত দিন হইল হইয়াছে। কিন্তু বান্ধবী-দ্বয়ের ভিতর এই দুইটি বিষয় জানিয়া লইবার পথে যেন লজ্জা আসিয়া প্রতিরোধ করিতে বসিয়াছিল। এক জনে লজ্জাটা ভাঙ্গিয়া দিলে অন্যে বেশ বলিতে পারে; কিন্তু কে প্রথম আরম্ভ করিবে, তাহাই মুস্কিল এবং তাহা লইয়া কত দিন কাটিল।

অবশ্য দুই জনের এ-সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর ছিল, কারণ দুই জনে দিবসের অধিকাংশ সময় একত্র অতিবাহিত করিত এবং প্রতি রাত্রিতে দুই বন্ধুতে এক বিছানায় শয়ন করিত। তাহারা কথা বার্তা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িত।—সে যে কত রাজ্যের কত খবর, কত সময় ভূত-প্রেতের আজগুবি গল্প, কত দুঃখ, কত হা-হুতাশ, কত কান্নার বৃত্তান্ত; তাহা পার্শ্বের শয্যাস্থিতা ইন্দুমতী শুনিয়া না বলিয়া পারিতেন না—

বাবা! তোরা এত কথাও জানিস? তোদের চোখে কি ঘুম আসে না?

ইন্দুমতী ইহা বলিতেন বটে, কিন্তু তিনিও মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিতেন না—

'এক ভস্ম আর ছার, দোষ-গুণ কব কার!'

সুবর্ণ অবশ্য কাকী-মার ঐ কথায় জবাব দিত—

কাকী-মা! আমরা নয় না ঘুমিয়ে গল্প করি, কিন্তু বলুন ত—আপনি

জেগে জেগে কি করেন? আমাদের নয় গল্প করে ঘুম আসে না, কিন্তু আপনাকে ত চোখ বুজতে আমরা কখনই দেখি না। আমাদের গল্প শোনার শ্রোতা ত আপনিই এক মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সাধিকা-স্থবর্ণের মনের কথা বলা-বলি করা অবশ্য রাত্রি-কালে চলিত না, কারণ ইন্দুমতী কাছে থাকিতে তাহা কি করিয়া চলে? তাই উভয়েই দিনের বেলা সু-যোগ খুঁজিতেছিল।

একদিন বেলা দ্বি-প্রহরের সময় সাধিকা আহারান্তে ছাদে গিয়া উত্তরের দিকের আলসের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নের ছোট মাঠ খানিতে দুইটি ছাগ-শিশুর ছাগ-মাতার স্তন্য পান করা দেখিতেছিল, আর মনে বড়ই আনন্দ পাইতেছিল। ছাগীটা কিছুতেই বাচ্চা দুইটাকে দুধ খাইতে দিবে না, বাচ্চা দুইটা ত দুধ খাইবেই। তাহারা যেন মায়ের দুইখানা পেছনের পায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল, আর সুবিধা মত জোর করিয়া জিভ দিয়া মাইয়ের গায়ে একটি করিয়া চাটা দিতেছিল; ছাগ-মাতা ত রাগিয়াই অস্থির। শেষে বিশেষ ক্রুদ্ধা হইয়া সে সন্তান দুইটিকে শিং নাড়িয়া তাড়া করিল। তখন তাহারা বুঝিল—মাতা তাহাদের বাস্তবিকই রাগ করিতেছে। তাই দুগ্ধ-পানে তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই শুষ্ক একগাছি তৃণ মুখে লইয়া টানা-টানি করিতে লাগিল।

সাধিকা ঐ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যেন তন্ময়া হইয়া কাতরা হইয়াছিল, পরিশেষে ক্ষুণ্ণ-মনে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেই সে বোধ করিল,—তাহার দক্ষিণ চিবুকখানা যেন জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছে। সে সহসা উহাতে হাত দিয়া উহা রগড়াইতে রগড়াইতে ভাবিতে লাগিল—এত তাত কোথা হইতে লাগিল।

সে চকিত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোনও

কারণ বাহির করিতে পারিল না। শেষে দেখিল, যে একটা চলমান ছোট রৌদ্র-ফলক যেন তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

সাধিকা তখন চমকিতা হইল, ও বুঝিল—কে যেন দূরস্থ বাটীর ছাদ হইতে আয়না সূর্য-মুখী ধরিয়া উহারই আলোকের প্রতিবিম্ব তাহার মুখে গালে চোখে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে।

সে তখন ভীতা হইয়া দ্রুত নীচের তলায় মায়ের কাছে চলিয়া গিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন-ভাবে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ক্রমে বেলা সাড়ে তিনটা-চারিটা হইল। সাধিকার কয়েক দিনের অভ্যাস মত ঘুমটি কিন্তু সে-দিন আসিল না। সে শুধু মায়ের বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে-লাগিল, ইত্যবসরে সুবর্ণ আসিয়া ডাক দিল—

ময়না! কি কচ্ছ?

ময়না জবাব দিল—

এই ত শুয়ে আছি।

সুবর্ণ বলিল—

এখন আর ঘুমিয়ে কর্বে কি? চল, ছাদে যাই।

এই বলিয়া সুবর্ণ সাধিকাকে এক রূপ টানিয়াই লইয়া গেল। কিন্তু সাধিকার যেন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

সুবর্ণ উহা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

ভাই! একটা কথা বলবে?

ময়না জবাব দিল—

কি বলব সুবর্ণ-দি?

সুবর্ণ-দি বলিল—

ভাই! তোমার মনটা ত আজ তেমন ভাল দেখছি না।

ময়না উত্তর করিল—

স্বর্ণ-দি! রোজ কি মন এক রূপ থাকে?

স্বর্ণ-দি কহিল—

কেন? আজ আবার নতুন করে কিছু আসল নাকি?

ময়না জবাব দিল—

এলে ত ভাল হত।

দুই জনে এই রূপ কথা কাটা-কাটি করিতেছিল, ইতিমধ্যে স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—

ময়না! ইচ্ছা করে—নির্জনে বসে আমরা দু-জনায় মিলে সব সময় গল্প করি। ভাই! তোমাকে দেখা অবধি আমার প্রাণটা তোমায় মনের মত করে ভালবাসতে ইচ্ছে করে আসছে, কিন্তু ভাই! মনে হচ্ছে, তুমি বুঝি আমায় পর মনে কর, বা ঘৃণা কর। তা নইলে ভাই! তুমি কেন আজ তোমার মনটি খারাপ করে গুমরে আমার কাছে বসে আছ? কিন্তু ময়না! আমি তোমায় যে অত্যন্ত ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তার প্রমাণ এখনই তোমায় আমি দিতে পারি, কিন্তু তুমি তা পার না।

এই বলিয়া স্বর্ণ গায়ের সেমিজের নিম্নের উন্নত বক্ষের ক্রোড়ে লুক্কায়িত লাল, গোলাপী, সবুজ কতগুলি খাম তথা হইতে বাহির করিল। তাহার উপর কেমন চমৎকার আঁকা-বাঁকা ফুল লতা-পাতা সাজান বা রাধা-কৃষ্ণ-মূর্ত্তি বা 'মনে রেখো' বা 'আমি তোমারি' ইত্যাদি সুন্দর ছাপা ছিল। ঐ খাম-গুলির ভিতর যেন দিস্তায় দিস্তায় সুগন্ধ কাগজে লেখা চিঠি।

স্বর্ণ উহা বাহির করিতেই সহাস-মূর্তিতে সাধিকা বলিল—

ও কি দিদি! কার প্রাণের ডালা উবুড় করে তোমার কাছে দিয়েছে? এ কার গচ্ছিত ঐশ্বর্য?

সুবর্ণ বলিল—

আগে বল ভাই! তুমি আজ মন খারাপ করেছিলে কেন?

সাধিকা তখন অন্ধকার দ্বি-প্রহরের সেই আয়নার প্রতিবিম্বের আনুপূর্বিক সমস্ত বৃতান্ত সুবর্ণের নিকট বলিল।

সুবর্ণ উহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—

পাড়ার লোকে তা হলে টের পেয়েছে—এ-বাড়ীতে বেটা-ছেলে কেউ থাকে না। তবে ত মুস্কিল। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বদমায়েস, গুণ্ডার প্রকোপ। দেখো ভাই! সাবধানে থাকতে হবে। নৈলে ত মহাবিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। আচ্ছা, রমেন-বাবু বেশ ভাল লোক না? তাকে এনে এখানে রাখা চলে না? তিনি থাকলে এখানে কোনও ভয় থাকবে না।

রমেনের নামোচ্চারণে সাধিকার মন বিকৃত হইল। সে বিশেষ কিছু বলিল না।

সুবর্ণ আবার বলিল—

আমার ত ভদ্র-লোককে বেশ ভাল লাগে। ভদ্র-লোকের কেমন ব্যভার, কেমন আলাপ। বেশ রগড়ে লোক কিন্তু তিনি। ভাই! এ তুমি বুঝে দেখ, নইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে।

দুই জনে এ-রূপ ছাদের মেঝেতে লুটাইয়া বসিয়া কথা-বার্তা বলিতেছিল এবং একে অন্যের চোখে চোখ রাখিয়া কত কি ভাবিতেছিল, ইত্যবসরে দেখিল, যে সেই ছাদের উপরে তাহাদেরই অতি সন্নিকটে একখানা কাগজের ঘুড়ি ঠক করিয়া পড়িল।

সাধিকার ঘুড়ি ধরিবার বেজায় নেশা এই কলিকাতার এই বাসায় আসা অবধি হইয়াছিল। অনেক দিন সে অনেক ঘুড়ি নিজে ধরিয়াছে,

আর বিমান-দাও বহু দিন বহু ঘুড়ি নিজে ধরিয়া তাহার আদরের ময়নাকে দিয়াছে। বৈকাল বেলা হইলেই বিমান-ময়নার এই এক আনন্দের খেলা ছিল।

সেই পুরাতন অভ্যস্ত আনন্দ-লাভের বশবর্ত্তিনী হইয়া সাধিকা নিজেই গিয়া ঘুড়িখানা ধরিল ও টপ্ করিয়া ঘুড়ির সুতাটা কাটিয়া দিল। তাহার বোধ হয় মনে ছিল না, আজ আর তাহার বিমান-দা নাই। ময়না তৎক্ষনাৎ ঘুড়িখানা হাতে লইয়া পরম উল্লসিত হইয়া বলিল—

সুবর্ণ-দি! এ 'মুখ-পুড়ী'খানা কেমন নতুন দেখছ?

সুবর্ণ-দি তাহার হাতের চিঠিগুলি উহা যে-স্থানে, ও যে-নিভৃত-স্থানে লুকাইবার, সেই জায়গায় রাখিয়া দিয়া বলিল—

কই দেখি?

সাধিকা ঘুড়িখানা সুবর্ণ-দিকে দেখিতে বলিয়া হঠাৎ ঘুড়িখানার দুই দিক ভাল করিয়া তাকাইয়াই দেখিল—উহার এক পৃষ্ঠের মাঝখানে লেখা আছে:—

বলো ঘুড়ি! বলো তারে—
সে যেন চিনিতে পারে॥

এবং অন্য পৃষ্ঠার মধ্য-স্থলে লেখা আছে—

ঘুড়ি! তুমি আমার-ই,
যে ধরে, তুমি হও তার-ই,
তবে সেও হবে আমার-ই॥

সাধিকা এই বিশ্রী ছড়া দুইটি পড়িয়া আর যেন স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার হাত হইতে ঘুড়িখানা ঝুপ করিয়া ছাদে পড়িয়া গেল। সে তখন আর অধিক কাল তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে ভরষা পাইল না।

সুবর্ণ সাধিকার হঠাৎ এ-রূপ পরিবর্তনে কোনও কথা না বলিয়া ঘুড়িখানা ছাদ হইতে কুড়াইয়া লইয়া নিজে উহার এ-দিক ও-দিক দেখিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া বলিল—

ময়না, বড়ই বিপদে পড়েছি। চল, দো-তলায় যাই। কাকীমার কাছে আজ দুপুরের কাণ্ড, আর বিকেলের ব্যাপার বলি। দেখি—তিনি কি বলেন।

সুবর্ণ অতি দ্রুত-গতিতে নামিয়া গেল। সাধিকা যন্ত্র-চালিতার মত ভয়ে ভয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

সুবর্ণ নীচে আসিয়া কাকীমাকে এক এক করিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল, কিন্তু তিনি তখনই সুবর্ণকে একটি ছোট্ট কথা যাহা বলিলেন, তাহাতে সুবর্ণের সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

সাধিকা অ-দূরে থাকিয়াও তাহা শুনিয়াছিল না বলিয়া রক্ষা, নতুবা সেই মুহূর্তে যে দ্বিতীয় 'স্নেহলতা' না হইত, তাহা বলা যায় না। কেরোসিন তেল এক বোতল ঘরে ত ছিলই, দেশলাইও যে ঘরে না ছিল, তাহা নহে, আর উপরের তেতলার ঘর ও নিভৃত ছিল, রাত্রি হইতেও মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী ছিল। কিন্তু সাধিকাকে সে কথা ভগবান শুনাইবেন কেন? তাহা হইলে যে এই "সপ্ত-কাণ্ড নব-রামায়ণ" শেষ হইবে না, আজন্ম-দুঃখিনী সাধ্বী সীতার দুঃখ সংক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, রক্ত-মাংসের বাল্মীকি মুনি হইবার সাধও যে রচয়িতার অ-পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাক।

ইন্দুমতী ঐ কথাটি বলিলে সুবর্ণ মনে করিয়াছিল—

কাকী-মা আমাকে নেহাৎ আপনার জন মনে করিয়াই ইহা বলিয়াছেন, আমি যদি উহা সাধিকাকে বলিয়া দিই, তবে আমার বিশ্বাস-ঘাতকতার

পাপে ডুবিতে হইবে, আর বলিলে বিপরীত ফলও হইতে পারে—সাধিকার স্নেহানুবর্তিনী হইতে গিয়া আমি কাকী-মার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া আমার স্নেহের সাধিকার দর্শন পাইব না।

সুবর্ণ তাই সাধিকাকে বলিল—

ময়না! আমার বড্ড পিপাসা পেয়েছে, এক ঘটি জল দেবে?

সাধিকা জিজ্ঞাসা করিল—

সুবর্ণ-দি! সূর্য ডোবে ডোবে, এখন জল খাবে? দাঁড়াও, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যেটা লাগিয়ে তোমায় জল দি।

এই বলিয়া সাধিকা ঘর ঝাঁটাইতে ব্যাপৃত হইল।

সুবর্ণ কাকী-মাকে আস্তে আস্তে বলিল—

কাকী-মা! আপনি বৃথা ময়নার উপর রাগ কচ্ছেন। ছিঃ! ও কথা বলতে আছে—ময়না সে-দিন চুপ চাপ করে দরজা খুলে রমেনের জন্ম এসেছিল!

কাকী-মা উত্তর করিলেন—

সুবর্ণ! তুই ত কিছু জানিস না, ও-মাগী এখন জ্বালায় ছট ফট করে বেড়াচ্ছে। বিমানটাকে খেয়েছে, এখন ত আর এক জনকে চাই। ওর জন্যে উনি গেলেন, ওর জন্যে আমি যেতে বসেছি। ওটার কথা আর কি বলব!

সুবর্ণ বলিল—

কেন? কাকী-মা! আমি সব শুনেছি, আপনি যা তা বলবেন না।

সুবর্ণ অবশ্য ইহাদের কিছুই ইতি-বৃত্তান্ত এ-যাবৎ জানিত না, কিন্তু পাক-চক্রে তাহাকে ত উহা শুনিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া সে বলিল—

না কাকী-মা! আপনি বৃথা ও হত-ভাগিনীকে দোষী কর্বেন না। আপনি স্থির হউন। রাগ কর্বেন না!

কাকী-মা যেন রাগের আরও ইন্ধন পাইলেন। তিনি বলিলেন—

আচ্ছা সুবর্ণ! তুমি যেমন সাজে সেজেছ, আমার যেমন সাজ, ঐ হারাম-জাদীকেও ত সেই সাজ পরান উচিত ছিল। এক দিকে মন রইল, আর একটি ঢাকের বায়া থাকল, তা কি চলে? ঐ বিমানটাকে ও-ই খারাপ করেছিল। কেন বাপু অত মেশা-মেশি? তিনি পুণ্যবান ছিলেন, তাই রক্ষে পেয়েছেন। তিনি কি কিছু বুঝতেন না, যে ঐ মাগীতে আর বিমানেতে খারাপ হতে পারে? তাই তিনি শীগগির শীগগির ওটাকে বিয়ে দিয়ে ফেললেন, কিন্তু ওটা ঐ বিমানের সঙ্গে দিন-রাত মাথামাথি কর্ত, আর আমার চোখে ধূল দিত। কার্তিক কি আমার মন্দ জামাই? কেমন মায়া! কেমন বুদ্ধি! কেবল একটু পাগলা ছাঁট তার ছিল। কিন্তু ঐ মাগী তাকে মোটেই দেখতে পার্ত না। এখন বোঝ—কেমন সুখ। বিমানটা মরে গেছে, তার পাপের বোঝা শেষ হয়ে গেছে, এখন যদি বেয়াই ওকে নিয়ে না যায়, তবে দেখ দেখি—ওটাকে নিয়ে আমি কি কর্ব? সুবর্ণ! ময়না যে আমার গলার কাঁটা হয়েছে। তার যন্ত্রনায় যে আমার প্রাণ বেরুবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু তা বের করে ফেলাও যে মস্ত দায়। আমি যে শুধু ডাকের দিকে চাইছি, আর পথের পানে তাকিয়ে আছি—দেখি নি—বেয়াই কোনও খবর দেন। যাক। তা আর চাইব না। আমি কিছু বলব না। হারাম-জাদী যা খুসী তা করুক, দুটো খেতে পেলেই হয়। রমেনটাকে খবর দিয়ে এ-বাসায় এনে রাখি, অথবা এটাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। তাও যদি না হয়, ওটা বেশ্যা-গিরি করে থাক, আর আমি গঙ্গায় ডুবি।

সুবর্ণ! ঐ রাতের দুপ-দাপ শব্দ আর কিছু নয়। তোমার চোখে ধূলা দেওয়া, পাছে তুমি কিছু বল—কেন সে আগে দরজা খুলেছিল। তাই ঐ মাগী সাফাই কর্ছে। সুবর্ণ! ঐ বিছানার নীচে একখানা 'পোষ্টকার্ড' আছে, তাতে লিখে দাও—রমেন যেন পত্র-পাঠ এখানে চলে আসে, মহাবিপদ।

সুবর্ণ কাকী-মার ক্রোধের ব্যপ-দেশে যে-সংবাদ ও হুকুম পাইল, তাহা তাহার অনুকূল ও মনোরম বোধ হইল। সে স্বীকার করিল—

কাকী-মা! তাই-ই কর্ব।

সাধিকা তাহার সায়ং-কৃত্য শেষ করিয়া আসিয়া মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল—

মা! চল, আমরা এ-বাসা ছেড়ে চলে যাই।

মাতা উত্তর করিল—

কোথায় যাব?

সাধিকা বলিল—

কেন কালিয়ায়?

মাতা হুঁ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জবাব দিলেন—

সেখানে গিয়ে কি খাব?

সাধিকা প্রশ্ন করিল—

এখানেই বা কি খাবে?

মাতা উত্তর করিলেন—

এখানে তবু ভিক্ষে মিলবে। দেশে যে তাও জুটবে না। আজ-কাল দেশের যে অবস্থা। দেশে ক-জন লোক আছে? যারা আছে, তারাও ত ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে অস্থি-চর্ম্ম-সার হয়ে রয়েছে। তাদের পেটে পিলে-যকৃৎ, হাত-পা লাঠির মত, চোখ দুটো মস্ত বড়, চক-চক করে, রক্তের

লেশও নাই শরীরে। দেশে না আছে ডাক্তার, না আছে কবিরাজ, না আছে কেউ দেখবার-শুনবার। দেশে যারা একটু ভাল অবস্থার হয় তারাই সহরে চলে আসে, আর দেশটাকে করে রেখে আসে শ্মশান, প্রেত-ভূমি। কিন্তু এই দেশই যে এক দিন ছিল শান্তির উৎস। সুখী-দুঃখী উভয়ের স্থান। এখন আর সেখানে গিয়ে কি ফল হবে? কলকাতা যেমন বড় লোকের, তেমনই গরীবের। আর এখানে মান-অপমান বলে জিনিষ নাই। তুমি ভিক্ষেই কর, আর জজিয়তীই কর, তুমি এখানকার লোককে যেমন চেনাবে, এখানকার লোকে তেমন চিনবে।

সুবর্ণ ইন্দুমতীর পার্শ্বে তখনও বসিয়াছিল। সে কাকী-মার কথার কিছু মাত্র বুঝিতেছিল না। যে-কাকী-মা, কিছু কাল পূর্বে মেয়ের বিরুদ্ধে অত বড় সাংঘাতিক দুর্নাম দিয়াছিলেন, তিনি যে ও-রূপ সরল ভাবে আলাপ করিবেন, ইহা তাহার ধারণার অতীত।

তখন সেও সুর পাল্টাইয়া বলিল—

কাকী-মা! জানবেন—আমাদের দেশের অবনতি হচ্ছে, দেশ ছেড়ে, যদিও দেশ না ছেড়ে উপায় নাই। বাল্মীকি মুনি জননী আর জন্ম-ভূমিকে স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন। সে-জন্ম-ভূমি আর নাই। যখন তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, তখন সে স্বর্গ ছিল। আবার যদি তা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আবার তা স্বর্গ হবে। তাকে স্বর্গ বলে বোঝাবার মত লোক আজ-কাল থাকলেও কেউ দয়া করে তা বুঝতে চায় না। ঐ পাথরগুলি গুঁড়িয়ে যে কৃত্রিম পাথরের সৃষ্টি হয়, লোকে আজ-কাল তাই-ই কেনে, কিন্তু পর্বত থেকে তোলা আসল পাথর কেউ কষ্ট করে ব্যবহার কর্তে চায় না। নকলের আজ-কাল আদর বেশী। প্রকৃতির নগ্ন-সৌন্দর্য কি এখন লোকের অনুভব কর্বার শক্তি আছে? এখন চাই ছাঁকা বাহার। লোকের তাই সহরের উপর

ঝোঁকে। বাংলার পল্লী-গ্রামের সেই অন্ন-সত্র, কাঙ্গালী-ভোজন, দরিদ্র নারায়ণ-সেবা—সব গেছে। কেউ কাউকে দুট চাল দেবে, সে-প্রবৃত্তি কারুর এখন নাই। এর মূল কারণ অর্থের অনটনও বটে, অপ-ব্যবহারও বটে। প্রত্যেকের ভিতর আজ-কাল বিলাসিতার ছড়া-ছড়ি। পল্লী-গ্রামে থেকে ত কেউ সে-রূপ আপাত-রম্য সৌখীনতায় ডুবতে পারে না, তাই প্রত্যেকে সহরে চলে আসতে চায়। আর সেখানে দাঙ্গা, মারামারি লেগেই আছে, তেমন কেউ দেখবার নাই। সহরে এখন এত জন-সংখ্যা বেড়েছে, যে এখানকার বায়ু রুদ্ধ হয়েছে। ফলে নানা কঠিন পীড়ার সৃষ্টি এখানে হচ্ছে, যেমন, যক্ষা, বেরি-বেরি ইত্যাদি। কাকী-মা! এখন আমাদের বিশেষ মঙ্গল হবে—যদি আমরা এই নাগরিক জীবন উপেক্ষা করে পল্লী-জীবনের আশ্রয় লই, আর বাংলা মায়ের সেবা করি। কিন্তু আমাদের নিজেদের এখন সে-উপায় নাই। যেখানে ভিক্ষা পাওয়া যায়, চাকরি পাওয়া যায়, সেইখানেই আমাদের থাকতে হবে। তাই কাকী-মা! আপনার কথা মত সহরই এক মাত্র আমাদের এখন বস-বাসের যোগ্য, যেখানে বার জাতির ভিক্ষান্ন জোটে।

সেই সন্ধ্যায় আলোচনাদির ফলে কিছুই স্থির হইল না—এই মাতা ও কন্যার এখন কোথায় থাকা সুবিধা-জনক। কারণ তাঁহারা সর্বদাই আশা করিতেছেন—ব্রহ্মাণ্ডনাথ কি করেন বা কোন পর্যন্ত আসেন। তারপর তাঁহার মতামত জানিয়া উভয়ে বাস-স্থান নির্দেশ করিবেন, কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল, ইন্দুমতীর বিশেষ চিন্তা হইতে লাগিল। বিমানের টাকা ফুরাইয়া গেলে তাঁহারা কি করিয়া সংসার-খরচ চালাইবেন বা বাড়ী-ভাড়া দিবেন। বামুন ও ঝিকে ত তাঁহারা অনেক দিনই বিদায় দিয়াছেন এবং এই বাড়ীর মাত্র এক অংশ রাখিয়া বাকী অন্য অংশ বাড়ী-ওয়ালাকে

ছাড়িয়া দিয়া কম ভাড়ায় ভাড়াটে আছেন, কিন্তু এখনকার এই কম ভাড়া, এই অল্প খরচ, তাহাই বা তাঁহারা কোথা হইতে চালাইবেন? যদি আর কোনও দিক দিয়া কিছু না আসে।

ইন্দুমতী তাই দিন-রাত অত্যন্ত ভাবিতেন ও তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না।

তারপর ইন্দুমতীর আর একটা অসুবিধা বিশেষ বোধ হইত—কে বাজার বা বাহিরের অন্য কিছু কাজ করিয়া দেয়?

তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে কাশী মিত্রের স্নান-ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন ও দুই-চারি পয়সার আলু, কুমড়া, কাঁচা কলা, তেঁতুল ইত্যাদি স্নান-ঘাটের বাজার হইতে কিনিয়া আনিতেন কিন্তু ইহা ছাড়া বাহিরের কি অন্য কোনও কাজ ছিল না, যাহার জন্য অন্যের সাহায্য আবশ্যক হইত?

যদিও সুবর্ণ সমস্ত বুঝিয়াই তাহার ছোট-ভাইকে দিয়া এ-বাড়ীর আবশ্যক কার্য করাইয়া দিত, তথাপি ইন্দুমতীর বিশেষ লজ্জা বোধ হইত—কেন তিনি এই স্কুলের ছাত্রটির পড়ার সময় নষ্ট করেন।

সুবর্ণ প্রথা মত তখন বাড়ী ফিরিয়া গেল। ইন্দুমতীও কন্যাকে পার্শ্বে বসাইয়া সহসা নিজ হাতে তাহার চুলগুলি এক মুঠ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—আরে! হয়েছে কি? ময়না! চুলগুলিতে যে একেবারে জড়া বেঁধে গেছে। আয়, ছাড়িয়ে দিই।

ইহা বলিতেই ইন্দুমতীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হইল, তাঁহার যেন বুকখানা ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মনে তখন অখণ্ড দুঃখ হইতেছিল—কেন তিনি ক্রোধ-বশে তাঁহার সেই আদরের ময়নার বিরুদ্ধে কতগুলি অকথ্য কথা সুবর্ণের নিকট বলিয়া দিয়াছেন? সুবর্ণ তাঁহাদের অতি নবীন সাথী। কেন তিনি তাহাকে এই লাঞ্ছিত গৃহের চির গোপনীয় কথা জানাইয়া

নিজেদের হীন করিয়াছেন? ময়না ত তাঁহার কন্যা, কোনও দিন অত্যন্ত আদরের ছিল।

সাধিকার নেহাৎ অ-নিচ্ছা-সত্ত্বেও ইন্দুমতী তাহার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অন্য-মনা হইয়া ভাবিলেন—তিনি যে-গর্হিত কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার সংস্কার আর শত চেষ্টায়ও করা যাইবে না। তিনি তাই ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ময়না উহা জানিতে পারিয়া মাতাকে বলিলেন—

মা! তোমার চোখে কি এখনও জল আছে? কই এত দিনেও কি তা ফুরল না? আশ্চর্য!

ইন্দুমতী আরও কাঁদিলেন এবং ক্রন্দনের বেগ প্রশমিত হইলে বলিলেন—

ময়না, আমি ঠিক কর্লাম, আর কাঁদব না। কেন কাঁদব? আমার কি হয়েছে? তিনি মারা গেছেন তাই বলিয়া? হাঁ, তাতে দুঃখ হতে পারে। কিন্তু আর এমন কি হয়েছে, যে এত হা-হুতাশ কর্ব? বিমান মরেছে? তাতে আমাদের কি? বিমান কে ছিল? বিমান ত মাত্র দেশের এক জন প্রতিবেশী ছিল। সে মরেছে, তার জন্যে ত আমরা যথেষ্ট কেঁদেছি, তবে আর কেন? আর সে-ই ত ছিল কাল। তার চক্রান্তেই ত আমাদের এমন নানা-স্থানী হতে হল। উঃ! কি ভুল করেছি! ময়না! কি পাপ করেছি! এখন ত সে-ভুল কিছুতেই সারবে না। সে-পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই।

ইন্দুমতী ইহা বলিতে বলিতে যেন অধীরা হইলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন—

ময়না! আজ আমাদের কিসের অভাব ছিল, যদি আমরা শ্বশুরের ভিটেয় থাকতাম? কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যে আর এ-মুখ নিয়ে দেশে ফিরতে পার্ব না। সব দিকই ত জঞ্জাল। তবে এক হয়—

কার্তিককে যদি পাই। কার্তিক আসলেই যে আমরা আগের মত হব। ময়না! তাই না কি?

ইন্দুমতী কার্তিকের কথা বলাতে সাধিকা লজ্জিতা হইল। সে পূর্বাপেক্ষা মাথা যেন আনতা করিল।

কিন্তু ইন্দুমতী সাহসে ভর করিয়া যেন জোর পাইলেন। তাঁহার এত দিনের ঘটনা-পরম্পরায় বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক যেন হঠাৎ গোছাল হইয়া গেল। তিনি স্ফূর্তির সহিত ময়নার চুলটা অতি পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া উঠিলেন।

সুবর্ণ আজ রাত্রিতে বাসায় গিয়া অতি সত্বর সমস্ত কার্য সারিয়া দ্রুত মাতার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহার খাওয়া শেষ না হইতেই ময়নাদের বাড়ী চলিয়া আসিল। তাহার প্রাণে যে আজ কত কথা মাথা উঁচু করিয়া উঁকি মারিতেছে, তাহা সে ভিন্ন আর কে জানিবে?

সে এ-বাসায় আসিয়াই কাকী-মাকে বলিল—

কাকী-মা! বিপদে মনে সাহস না এনে যদি ভয় আনা যায়, তবে বিপদ যেন পেয়ে বসে। আর বিপদে ধৈর্য চাই। ঐ যে এক জন কবি বলেছেন—

ভগবান! তুমি আমায় বিপদ দাও, তাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু সে বিপদে সম্মুখীন হতে যেন শক্তি পাই।

এ-রূপ অনেক দার্শনিক গবেষণার অবতারণা করিয়া সুবর্ণ কাকী-মার নিকট বলিল—

কাকী-মা! আজ আমি আর ময়না ওপরে তে-তলায় থাকব। আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন। দেখি, কোন শালা কি কাণ্ড করে।

এই বলিয়া সুবর্ণ কাকী-মার আদেশ গ্রহণ করিয়া সাধিকাকে লইয়া উপরে গেল। সঙ্গে একটি হেরিকেন ও দেশলাই গ্রহণ করিল। ঘরে ঢুকিয়া সে-দিন আর তাহারা দক্ষিণ দিকের দরজা বন্ধ করিল না।

সে-রাত্রি কৃষ্ণ পক্ষীয়া তৃতীয়া ছিল, সুতরাং জ্যোৎস্না দেরীতে উঠিলেও উহারা যখন শুইতে গিয়াছিল, তখন চন্দ্রালোক সম্পূর্ণ ভাবেই ছাদে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ বাতাসও বেশ তখন বহিতেছিল। উভয়ে বিছানায় অর্ধ-শায়িতাবস্থায় কনুইয়ে বালিস ভর করিয়া আলোটি সামনেই রাখিল। উভয়ের উন্নত বক্ষ বালিশের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল, তাহাতে তুলা-কাপড়ের বালিশ ধন্য হইয়া গেল। সুবর্ণ আলোটি একটু উস্কাইয়া বলিল—

ময়না! বিমান-বাবুর জন্যে তা হলে তোমার বড্ড কষ্ট হয়—না?

সুবর্ণ-দি সহসা এই কথা উত্থাপন করাতে ময়না বলিয়া ফেলিল—

কি আর কষ্ট! যে গেছে তার জন্যে কষ্ট করে আর কি ফল? হঠাৎ এ-কথা কেন সুবর্ণ-দি?

সুবর্ণ। বিমান-বাবু তোমায় খুব ভালবাসত—না?

ময়না। হাঁ, ভালবাসত না? নিশ্চয়ই ভালবাসত।

সুবর্ণ। তার প্রমাণ পেয়েছিলে?

ময়না। কি প্রমাণ?

সুবর্ণের কথা-বার্ত্তা যে কি উদ্দেশ্যে হইতেছিল এবং কোন দিকে উহা গড়াইবে, তাহা ময়না বুঝিতে পারিল না। কিন্তু প্রমাণের কথাটা শুনিয়া সে বলিল—

সুবর্ণ-দি! প্রমাণ আবার কি?

সুবর্ণ। প্রমাণ না? ভাই! প্রমাণ চাই বই কি? প্রমাণ চাই। প্রমাণ না পেয়ে কি বৃথা এক জনকে প্রাণটা ঢেলে দোব, আর সে তাই

নিয়ে ছিনি-মিনি খেলবে? শেষে যদি মাঝ দরিয়ায় ফেলে সে পালায়? তখন যে কুল-কিনারা দেখব না। মাঝে থেকে শুধু শুধু নিন্দা, গ্লানি, অপবাদ হবে, সুখ ত পাবই না। আর যদি প্রমাণ পাই, যে সে ভালবাসে, তবে নয় তাকে নিয়ে থাকলাম, জীবনটা এক ভাবে কেটে গেল। তাতে লোকে যাই বলে বলুক।

ময়না। সুবর্ণ-দি! তুমি কি বলছ? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

সুবর্ণ। আমি বলছি—বিমান-বাবু সতীশ ছিল না উপীন-দা ছিল?

ময়না এই কথায় চটিয়া গেল। বলিল—

সুবর্ণ-দি! বিমান-দা আমার দাদাই ছিল। আমি তার বোনই ছিলাম, অন্য কিছু নয়। ও—বুঝেছি সুবর্ণ-দি! তুমি আমায় ইতর মনে করেছ, হয় ত কারুর কাছে কিছু শুনেছ, তাই সে মরা-নামে গাল দিচ্ছ। সুবর্ণ-দি! মনের অ-গোচর পাপ নাই। আমার মনে-প্রাণে বিমান-দা ভ্রাতৃ-সদৃশই ছিল, তবে অ-লক্ষ্যে যদি পাপ করে থাকি। ঘৃত ও অগ্নি একত্র থাকিলে যদি ঘিটা বা আগুনটা, বা ঘি-আগুন দুইটা তরল হয়েই ওঠে, তবে সে তরলতা ঘৃতাগ্নি-ধর্মের, তাতে আরও ইন্ধন দিয়া আরও তরল না করিলে আরও বয়ে বা গলে যায় না। শৈত্যে আবার স্থির হয়। বরং সে স্থিরতা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়।

ময়না এই বলিয়া চুপ করিল ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

সুবর্ণ-দি বলিল—

ভাই! তুমি যদি আমার জীবনী শোন, তবে অবাক হয়ে যাবে। ভাই রাগ করো না। তোমায় আমি বিশেষ স্নেহ করি, তাই বলছি। ভাই নিশ্চয় জেনো, আমি তোমায় আঘাত দেবার জন্তে এ-সব বলছি না, আ

যা, তাই তোমাকে চেনাবার জন্যে বলছি। ময়না! পড়ে দেখ এই চিঠিগুলি, তা হলে বুঝতে পার্বে, আমার জীবন কি দুঃখের। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল, সে মরেছিল বিয়ের দশ-বর্জনের মধ্যে, আর আমি যার সঙ্গে ডুবেছিলাম, সে মরে নি, চলে গেছে, লুকিয়ে আছে!

এই বলিয়া সুবর্ণ কাঁদিয়া ফেলিল।

সাধিকা এক এক করিয়া তখন সেই চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার চোখ-মুখের ছাপে যাহা বোঝা গেল, তাহাতে উহা পড়িয়া সে যে বিস্মিতা হইতেছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল।

কিছু ক্ষণ পরে সাধিকা জিজ্ঞাসা করিল—

সুবর্ণ-দি! তোমার 'তিনি' চলে গেলেন? কি আশ্চর্য!

সুবর্ণ বলিল—

ময়না! না গিয়ে তাঁর উপায় কি? তিনি যে আমার মামা।

ময়না প্রশ্ন করিল—

এ-কথা আর কেউ জানে নি?

সুবর্ণ উত্তর করিল—

এক মা জানেন। তা মা নিজের ভাইয়ের কাণ্ড জেনে, আমাকেও বিশেষ কিছু বলতে সাহস না পেয়ে আমায় নিয়ে কলকাতা এলেন, মামাও গাজিপুরে এক চাকরি পেয়ে গা-ঢাকা দিলেন।

ময়না এ-বারে একটু প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছুক হইল, কারণ এই সুবর্ণ-দিই ত তাহাকে ইতঃপূর্বে খোঁচা দিয়া কথা বলিয়াছিল।

সে বলিল—

সুবর্ণ-দি! এই চিঠিগুল কি মামা গাজিপুর থেকে লিখেছিলেন? এখন লেখেন না? বেশ ভাল বাংলা জানেন ত তিনি। লেখায় বেশ

কবিত্ব, ভাব ও ভাষায় বেশ লালিত্য আছে। সুবর্ণ-দি! এই দিস্তায় দিস্তায় চিঠি লিখতে তাঁর চাকরি করে সময় হত ত? আর পয়সাও ত কম খরচ হয় নি। বেশ গন্ধ ত।

উভয়ে এ-রূপ হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া গল্প করিতে-করিতে সে-রাত্রিতে আর ঘরের দুয়ার বন্ধ করিবার বা নিদ্রা যাইবার আবশ্যক বোধ করিল না। ছাদে কোনও ভয়-ভীতের ব্যাপার সে-রাত্রিতে আর ঘটিল না।

—পাঁচ—

মাণিকতলা মেসের 'মেম্বররা' রমেনকে আজ কত দিন বড়ই ক্ষেপাইতেছে। যেখানে যে জটলা হয়, তাহা রমেন-বাবুকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই হইয়া থাকে।

মেস-বাড়ীটি দেখিতে বেশ সুন্দর, যদিও উহা নেহাৎ নব-নির্মিত নহে। শুধু চূণ-কামের উপর আছে বলিয়াই উহাকে ঝক-ঝকে চক-চকে দেখায়। বাড়ীটির সদর দরজাটা গলির ভিতর দিয়া, কিন্তু বাড়ীটির দুইটি দিক বড় রাস্তার উপরে। মেসটি ত্রি-তল এবং বড় রাস্তার উপর যে ধার দুইটি, উহা ঘুরাইয়া অ-প্রশস্ত লম্বা বারান্দা দুই তলায়ই আছে। ঐ বারান্দা হইতে কলিকাতার বেশ একটু দূরতর স্থান পর্যন্ত চোখে আসে এবং এই মেসের অধিবাসীরা ওখানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের আরাম ও বিশ্রম্ভালাপ করে, বিশেষতঃ বিকালে বা সন্ধ্যার দিক তাহারা ঐ স্থানে বিশেষ হল্লা করে। কেহ কেহ হয় ত আরাম-কেদারায় আধা-শোয়া অবস্থায় পড়া-শুনা করিয়া থাকে। মেসটি যে শুধু ছাত্রাবাস ছিল তাহা নহে, অনেক চাকুরেও সেখানে থাকিত। তবে চাকুরেদের কামরাগুলি প্রায়ই দো-তলায় ছিল।

রমেন-বাবু কিন্তু চাকুরে হইয়াও চাকুরেদের দলে মিশিয়া বাস করিতে ভালবাসিত না। সে অ-বিবাহিত ছিল। তাহার বয়স যদিও ত্রিশের কোঠায় পড়িয়াছিল, তথাপি যদি তাহাকে কেহ তাহার বয়সটা কমাইয়া কাঁচা বয়সের অর্থাৎ চব্বিশ, পঁচিশ বছরের বলিত, তবে সে ভারী খুশী হইত।

রমেন-বাবুর এমন কম বয়স বলিবার ও তাহা প্রতিপন্ন করিবার লোক ছিল এক মাত্র অসিতরঞ্জন। রমেন তাই তাহাকে বিশেষ পছন্দ করিত।

ধ্যানের ছবি

অসিত বেশ চালাক ছিল, রমেনের কম বয়সের পক্ষে ভোট দিয়া সে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া অনেক চা, বিস্কুট, কেক খাইত। দুই জনে পূর্বে ভিন্ন কক্ষে থাকিত, কিন্তু এ-রূপ ভাব জন্মিবার পর হইতে দুই জনায় একটা ত্রি-তক্তপোষের কামরায় স্থান লইল।

ক্রমে উভয়ের এ-রূপ বন্ধুত্ব হইল, যে তাহাতে অন্য লোকেরা বিশেষ হিংসা না করিয়া পারিত না। অসিতের কলেজ হইতে আসিয়া অপরাহ্নের জল-খাবার আর নিজের পয়সায় কিনিতে হইত না, উহা রমেন-বাবুর পয়সায়ই চলিয়া যাইত। রমেন-বাবু এক পোয়া রসগোল্লা আনিলে অর্ধেকের একটি বেশী অসিত পাইত। তার পর এ-দিকে ও-দিকে রাস্তায় বাহির হইয়া কোনও রেস্তোরাঁতে ঢুকিলে ত কথাই ছিল না। দুই জনে খাইয়াই যাইত, অসিত বারণ না করিলে চা কাপের পর কাপ আসিত, যদিও অসিতের সে-বারণ রমেনকে দেখাইয়া-শুনাইয়াই মাত্র ছিল। এই খাওয়ান-দাওয়ান ভিন্ন রমেন-বাবু অসিতরঞ্জনকে দুই চারি টাকা ধার দিত। উহা পরিশোধ না করিলেও রমেন তাহা বন্ধুর নিকট চাহিত না।

রমেন বাবুর সাহায্যে অসিতরঞ্জনের যে মহাউপকার হইয়াছিল, তাহা এই যে তাহার আর আর্থিক অনটন হইত না, যদিও তাহার বড় দাদা টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে বিলম্ব করিতেন।

কিন্তু মহাঅপকার যাহা হইয়াছিল, তাহা সে তখন না বুঝিলেও পাঁচ বৎসর পরে বুঝিয়াছিল, যখন তাহাকে বিদ্যাদেবীর পায়ে চির বিদায় জানাইতে হইয়াছিল।

অসিত আই. এ. পড়িত এবং ছাত্রও একটু ডাঁটো ছিল। সে বাল্য-জীবনে কেমন মেধাবী ছিল, কে জানিত, ছাত্র-জীবনেও কত বার 'ক্লাসে' গাড্ডু মারিয়াছিল, তাহার খবরও বিশেষ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু 'ম্যাটি-

কুলেশনে' দুই বার বিশ্রাম লইয়া যে সে তৃতীয় বার পরীক্ষা-সাগর পার হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ ছিল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক-পঞ্জিকা। আই. এ.তেও সে আহত সৈনিক হইয়া রণে ভঙ্গ দেয় নাই কারণ সে যে 'রবার্ট-ব্রুসের' 'মাকড়সার গল্প' পড়িয়াছিল এবং সেই আখ্যায়িকার সার-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে তাহা কার্যে প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। সে-জন্য বয়সও ষাটের দিক চাহিয়া তাহার এক কুড়ি নয় হইয়াছিল। সে রীতি মত আস্বাদন করিতে পারিত—রমেন-বাবু কি চাট তাহার সম্মুখে ধরিতেছিল, বিশেষতঃ সে নিজেকে সমর্থন করিত বিমান বাবুর উদাহরণ দিয়া —বিমান বাবু এক জন 'প্রোফেসার', তাহার 'রোমান্স' দেখাইয়া। তাহার তাই বহু দিন হইতে ইচ্ছা হইতেছিল, যে 'প্রোফেসার বাবুর' 'লভার'কে এক বার দেখিয়া তাহার নয়ন সার্থক করিবে, কিন্তু রমেন যে তাহাকে বিমানের ওখানে লইয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করিত।

রমেন তাই বলিত—আমার 'আইডিয়েলকে' দেখো হে। ও-বিষয় আমায় মাপ কর্তে হবে।

একদা সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় রমেন তাহার তক্তপোষে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, অসিত গা হাত পা ধুইয়া আসিয়া খড়ম-চটি পায়ে দিয়া ঠক-ঠক করিতেছে, ঐ কামরার লক্ষ্মীকান্ত-বাবু তখন অফিস হইতে কেবল ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে দো-তলার সবার যোগেন-দা খালি গায়ে ধব-ধবে একখানা মিহি পাড়ের কাপড় পরিয়া—উহার কোঁচার ফুলটি উঁচু করিয়া কোমরে গোঁজা, এক জোড়া 'সাণ্ডেল' পায়ে, চশমা এক জোড়া চোখে হঠাৎ রমেনদের ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি হে রমেন-ভায়া! জীবনটা কি শুকন খাটে শুয়ে পড়ে কড়ি কাঠ গুণেই যাবে?

অফিস হইতে সদ্যঃ-প্রত্যাগত লক্ষ্মীকান্ত-বাবু গায়ের জামার বোতাম খুলিতে-খুলিতে দ্রুত জবাব দিলেন—

ও-কথা আর বলবেন না যোগেন-দা! রমেন-ভায়া সাধু-বাবা হবে।

এই হাস্য-রসিকতায় রমেন নেহাৎ ক্রুদ্ধ বা বিরূপ হইল না। কারণ উহা হইয়া উপায় নাই, মেসের সকলেই তাহা হইলে তাহাকে পাইয়া বসিবে এবং উহা দিন-দিন সমক্ষে, পরোক্ষে বাড়িয়া চলিবে।

রমেন নিজে চোখে দেখিয়াছে—কলিকাতার রাস্তায় কোথায়-কোথায়ও কতগুলি ভিখারিণী বুড়ী আছে, যাহাদের 'বল হরি' বলিলেই রাগিয়া উঠে, আর গালাগালি করে। রাস্তার চেংড়ারা উহা জানিয়া বার-বারই 'বল হরি' 'বল হরি' করে এবং বুড়ীগুলিও ভীষণ চটিয়া সেই চেংড়াদের চতুর্দশ পুরুষ উৎসন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু তবুও তাহারা ছাড়ে না। শেষে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি কত কি হয়।

রমেন তাই সহ্য করিত ও এ-রূপ হাস-পরিহাস হইলে নিজেই মাতিয়া সকলের কথায় সায় দিত।

যোগেন-দা পুনরায় বলিলেন—

ভাই লক্ষ্মীকান্ত! এ-বারে মেসে চাকর না রেখে ঝি রাখবার বন্দোবস্ত কর, তা হলে দেখবে কত ঔপন্যাসিকের রসদ এই মেস থেকেই জুটবে। আমরা না হয় রাম, শ্যাম, যদু, মধু হব আর 'হিরো' হবেন—রমেন-বাবু। বাঁশী বাজানটা ত বিমান-বাবুর কাছ থেকেই ভায়া শিখেছে। আচ্ছা লক্ষ্মীকান্ত-বাবু! এক বার সে-'ধ্যানের ছবি'র গল্পটা ত তুমি আমায় বললে না? সেই 'রোমিও-জুলিয়েট', 'ওথেলো-ডেসডিমোনা'—কত কি যে এই ঘরে শুনতাম। লক্ষ্মীকান্ত-বাবু! তুমি ভাই! বড্ড বেরসিক।

লক্ষ্মীকান্ত-বাবু বলিলেন—

না, রমেন-বাবু এ-বার 'স্যার রজার ডি কভারলি' হয়েছেন, আর উনি উদ্বেলিত তরঙ্গ-সিন্ধু নন, এখন উনি 'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ'।

রমেন বলিল—

যোগেন-দা! আপনি কি এই জন্যেই এখানে এসেছেন? আমার পেছনে লাগা ছাড়বেন না? কি বলব? আপনি নেহাৎ গুরুজন।

যোগেন-দা জবাব দিলেন—

ভায়া! রাগ কচ্ছ?

রমেন কহিল—

ছিঃ! আপনার ওপর রাগ কর্ব?

যোগেন-দা বলিলেন—

জান কি ভায়া! একটু 'রিক্রিয়েশন', সারাদিন খাটুনির পর একটু আনন্দ। তা দাদা! টাকাটা দাও, মেসের হাত টান।

লক্ষ্মীকান্ত-বাবু কহিলেন—

তা বুঝেছি, যোগেন-দার এত দয়া, যে বৃথা কাজে এখানে আসবেন? যোগেন-দা! 'ফিষ্টটা' কবে দেবেন?

যোগেন-দা উত্তর করিলেন—

আর ভাই! 'ফিষ্ট'! মাস-কাবারে হাত খালি। অসিত-ভায়া! টাকাটা এসেছে? ও-মাসের চার টাকা বাকী, এ-মাসেও ত এক পয়সা পাই নি।

টাকার কথা বলিবা মাত্র রমেন-বাবু 'সুট-কেসটি' খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। ভাবিল—যোগেন-দা উহা পাইয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবেন। কিন্তু ইত্যবসরে লক্ষ্মীকান্ত-বাবু বলিলেন—

ওঃ! ভুলে ত গেছি। চিঠির বাক্সে যে রমেন-বাবুর একখানা চিঠি পড়েছিল—

এই বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত-বাবু তাড়াতাড়ি গাত্রোৎপাটন করিয়া পোষ্ট-কার্ড খানি বাহির করিয়া দিলেন।

রমেন চিঠিখানা পাইয়া বৈদ্যুতিক আলোতে উহা পড়িতে লাগিল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

যোগেন-দা হঠাৎ রমেনকে চিন্তিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোথাকার চিঠি?

রমেন একটু অন্য-মনা হইয়া পড়াতে যোগেন-দার কথার জবাব দিল না।

যোগেন-দা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোত্থেকে চিঠি এসেছে? অত ভাবছ যে?

রমেন উত্তর করিল—

এই কলকাতা থেকে।

যোগেন-দা বলিলেন—

যেখান থেকেই আসুক, খবর সব ভাল ত?

রমেন জবাব দিল—

এই দেখুন।

এই বলিয়া রমেন চিঠিখানা যোগেন-দার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিল।

যোগেন-দা চিঠিখানা তুলিয়া মাথাটি খাড়া করিয়া চশমাটার মধ্য দিয়া দৃষ্টি পাতিয়া উহা পড়িয়া দেখিল—কাকী-মা লিখিয়াছেন এবং পত্র-পাঠ যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু যোগেন-দা বুঝিতে পারিলেন না—ইনি কে।

চিঠিতে ঠিকানা, তারিখ যাহা দেওয়া ছিল—কলিকাতা, শুক্রবার। তাহা যোগেন-দার পক্ষে বুঝা অসম্ভব।

যোগেন-দা বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, যখন 'মহাবিপদ' লিখেছেন, তখন তোমার এখনই যাওয়া উচিত, রাত আর কতটুকু হয়েছে, বোধ হয় নটাও বাজে নি।

লক্ষ্মীকান্ত-বাবু তৎক্ষণাৎ পকেট-ঘড়িটার কাল এক গাছি রেশমী 'কার' টানিয়া বলিলেন—

মাত্র আটটা পঁয়ত্রিশ।

যোগেন-দা বলিলেন—

যাও, রমেন! তুমি এখনই যাও, দেরী করো না। অসুখ-বিসুখ হতে ত পারে। আর কলকাতা সহরে, চতুর্দিকে বিপদ। কোন দিক দিয়ে কি ঘটে, তা কেউ বলতে পারে না। এখানে বিপদ ঘটাটা আশ্চর্য নয়, বরং বিপদ না ঘটাটাই আশ্চর্য। যাও রমেন! জামাটা গায়ে ফেলে, আমি বামুন-ঠাকুরকে বলে দিচ্ছি, তোমার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখবে। 'মিল' ত নেওয়া হয়েছে।

যদিও এ-ঘরের কেহই বুঝিতে পারিলেন না—চিঠিটা কোন কাকী-মার, কিন্তু রমেনের জানা আছে—তিনি কে। ভাগ্যে ইহারা ঐ খোঁজ জানেন না, তাহা হইলে ইহা লইয়া—এই বিপদের চিঠি লইয়াই বা কত জনে কত রূপ ইঙ্গিত করিতেন।

সে যাহা হউক রমেন নিজে প্রস্তুত হইয়া লইল। তাহার সাজ-গোছের আর বিশেষ কিছু পরিপাটী করা হইল না। মাথাটায় অবশ্য ঐ সঙ্কট-মুহূর্তেও সে দুই-চারি-বার চিরুণী বুলাইয়া লইল। সে 'সুট-কেস' হইতে 'মনি-ব্যাগ'টা বাহির করিয়া, অতি শীঘ্র একটা বিড়ি দেশালাইয়ে ধরাইয়া

লইয়া অতি দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। যোগেন-দা 'দুর্গা', 'দুর্গা' বলিলেন।

রমেনের আজ রাত্রিতে কাকী-মাদের বাসায় প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না; কারণ দরজায় পৌঁছিতেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ঘটনার মত সুবর্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল।

সুবর্ণ বলিল—

এসেছেন রমেন-বাবু?

এই বলিয়া সুবর্ণ দরজায় আস্তে আস্তে টক-টক করিতে লাগিল।

সুবর্ণ কহিল—

চলুন, দু-জনায় এক সঙ্গে ঢুকি।

রমেন-বাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—

বাঃ! অদেষ্ট ভাল, মাহেন্দ্র-ক্ষণে যাত্রা করেছিলেম মেস থেকে। তা দেখি—যাত্রা কেমন শুভ হয়। ব্যাপারটা কি বলুন ত। বার থেকেই চিন্তাটা দূর করে ভিতরে যাই। আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে। সে-বারে ত বিমানটাকে শোধ দিইছি; এ-বারে কাকে দিতে হবে? আমি ত তৈরী হয়ে এসেছি।

সুবর্ণ মুখটি টিপিয়া চোখটা আয়ত করিয়া বলিল—

এ-বারে দেবেন আমায়।

রমেন উত্তর করিল—

তা আর কি করে হয়? এমন জল-জীয়ন্ত প্রাণটিকে কি করে শোধ দিই। আর আপনাকে? ছিঃ! এমন দয়ালু আমি হব কেন?

উভয়ে এ-রূপ কথা বলিতে বলিতে দেখিল—দরজাটা যেন খোলাই আছে। দু-জনায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—সম্মুখেই ময়না।

রমেন-বাবু চেঁচাইয়া বলিল—

বাঃ রে ময়না! তুইও ত বেঁচে আছিস? তবে এই দুই জনকেই ত বাঁচা পেলাম। আর রইল কাকী-মা? সে বুড়ী মরবে না। যাক্‌, তবে আর কেউ মরে নি! তবে আর যে-সব বিপদ ঘটুক, 'হাম ডোণ্ট কেয়ার'।

সুবর্ণ বলিল—

চলুন রমেন-বাবু! উপরে গিয়ে কথা হবে।

রমেন-বাবু বলিলেন—তা বেশ, এখানে রাস্তার উপর হল্লা করে কি ফল?

এই বলিয়া তিন জনেই একত্র উপরে গেল। দরজাটা অবশ্য খোলা থাকিল না। পর-দিন রমেনের আফিস ছিল না, মাসের শেষ শনিবার উপলক্ষে ছুটি। রমেন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া পূর্ব রাত্রিতে সুবর্ণের মারফৎ যে কথাগুলি শুনিয়াছিল, তাহাই পুনরায় কাকী-মার নিকট হইতে ঝালাইয়া লইল।

কাকী-মা কিন্তু মাথায় হাত দিয়াছেন, কারণ রমেনের সেই ত্রিশটি টাকা হইতে দুই টাকা কত আনা তিনি খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন যদি রমেন উহা চাহিয়া বসে। কিন্তু তাঁহার চিন্তা দূর হইল তখন, যখন সে বাগবাজারে নিজে গিয়া মুটের মাথায় ঝাঁকা ভরিয়া বাজার করিয়া লইয়া আসিল।

কাকী-মা উহা দেখিয়া বলিলেন—

রমেন! করেছ কি? সুবর্ণ পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—

'বাজার হুদ্দা কিন্তে আস্তে'…।

রমেন ওস্তাদ ছেলে। সে আগন্তুকার মুখ হইতে কথাটা টানিয়া লইয়া বলিল—

'ঢাল্যে দিছি পায়।'

রমেন চট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কোন পায়ে সুবর্ণ-দি ?

সাধিকা তখন মুখ খুলিয়া আস্তে আস্তে সুবর্ণ-দির কাণে কাণে বলিল—

কোন পায় সুবর্ণ-দি ! আমি জানি।

সুবর্ণ-দি দরজায় মুখ আড়াল করিয়া চোখটা ঘুরাইয়া স্মিত-মুখে জিজ্ঞাসা করিল—

কোন পায়ে ?

সাধিকা বলিল—

উপরে চল, বলব'খন।

এই রসিকতা কাকী-মা অবশ্য শুনিলেন না। কিন্তু রমেন বুঝিল। সে তখন কোনও কথা বলিল না। জিনিষগুলি নিজেই তুলিয়া ডালা ভরিয়া ময়নাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

ডালাটা রান্না-ঘরে নিয়ে যাবে, না এখানে থাকবে ময়না ?

ময়না জবাব দিল—আপনার কিছু ভাবনা কত্তে হবে না। আপনার আনবার পালা আপনি এনেছেন, আমাদের নেবায় পালা আমরা নিচ্ছি।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—

ময়না ! তুমি রমেন-বাবুকে খেতে দিয়েছ ?

ময়না উত্তর করিল—

কখন দিই স্বুবর্ণ-দি? রমেন-বাবু ত বাইরে ছিলেন। মার সঙ্গে কথা কইতে-কইতে তিনি টপ করে বাজারে চলে গেলেন, আর এই এসেছেন।

যথা-সময়ে রমেন-বাবুকে জল-খাবার স্বুবর্ণ ধরিয়া দিল। মাত্র দুইটি সন্দেশ ও এক গ্লাস জল ভিন্ন সে আর কিছু খাইল না।

জল-যোগ শেষ করিয়া রমেন একখানা পোষ্ট-কার্ড বাহির করিয়া তাহার মেসের ম্যানেজার যোগেন-দাকে লিখিল, যে তাহার 'মিল' যেন বন্ধ থাকে, যে পর্যন্ত না সে মেসে পৌঁছে। কারণ ইহাও ত হইতে পারে রমেন-বাবু আসিবেন বলিয়া—যে-হেতু তাহার আফিস আছে—বামুন-ঠাকুর যদি চাল নেয়। শুধু শুধু কেন পয়সা নষ্ট হইবে?

রমেন-বাবু পত্র লিখিতেছিল, এই সময় ইন্দুমতী তাহার দিকে এক বার চাহিয়া ভাবিলেন—কেন সে-দিন স্বুবর্ণ তাহার কথা মত রমেনকে চিঠি লিখিয়া দিল? ভগবান! তুমিই ভরসা।

সেই বৈকালে রমেন-বাবু তে-তলায় বিমানের কামরায় শুইয়া আছে, স্বুবর্ণ এই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

রমেন-বাবু! সব কাণ্ডই ত শুনেছেন, আর এক কাণ্ড নতুন ঘটেছে, তা বুঝি শোনেন নি?

এই বলিয়া স্বুবর্ণ হাসিয়া যেন ঘরটি মুখরিত করিল।

রমেন বলিল—

কি? কি ব্যাপার হয়েছে?

স্বুবর্ণ হাসিতে হাসিতে বলিল—

আজ দুপুরে আমাদের বাসার ঝি-মাগী বলছিল—দিদি-মণি! তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব, যদি তুমি সে কথা কারুর কাছে

না বল, বিশেষ গোপন কথা, আর ভারি সাংঘাতিক। আমি বললাম—কি রে? কি? বল, বলব না কাউকে। ঝি আমার 'বলব না' কথায় বিশ্বাস কর্লে না। সে একটা কাল নুড়ি পাথর, দেখতে ঠিক শালগ্রাম শিলার মত, তাই আমার মাথায় ছুঁইয়ে বললে—দিদি-মণি! "এখন বল—বলবে না কাউকে—নৈলে আমি বলব না। এ ত ভদ্দর ঘরের কথা। রমেন-বাবু! তখন আমি ঐ ঝির শালগ্রাম-শিলা ছুঁয়ে দিব্বি না করে পার্লাম না। ঝি সে-সময় গলাটা খাট করে, এ-দিক ও-দিক আট দশ বার তাকিয়ে বললে—দিদি-মণি! ও-বাড়ীর তোমার বন্ধু-ঠাকরুণের কি স্বভাব খারাপ? দিদি-মণি! এই দেখ, তোমার বন্ধুর কতগুলি চিঠি জমেছে। ঐ চক্কোত্তির গলির মেস-বাড়ীর কয়েকটি ছেলে ঐ চিঠি পাঠিয়েছে। দেখ দিদি-মণি! এর মধ্যে কোনও ছেলেটির বয়স পঁচিশের বেশী হবে না, কাঁচা বয়েস, দেখতে কেমন রাজ-পুত্তুরের মত, চোখগুলি গোটা পটল দু-খণ্ড করা, সব ছেলেরা কলেজে পড়ে, বেশ বড় লোকের ছেলে, কি সব জামা গায়ে দেয়, সব সিলকি, কাপড় জড়ি-পেড়ে, পায়েঁ চক-চকে জুত, চশমা-আঁটা, ফুল বাবু। তা এ-চিঠিগুলি তোমার বন্ধুকে দেবে দিদি-মণি? রমেন-বাবু! বুঝলেন ত? এ-কথা কাকী-মাকে বলে এসেছি, আপনাকেও বলছি।

রমেন সুবর্ণের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না—সে কি শুনিতেছে। কিছু ক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল। সুবর্ণও সেখানে বসিয়া রহিল।

রমেন ভাবিল—

সত্যই কি এ-রূপ এই পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছে? যদি এই প্রকার প্রকাশিত হইয়াই থাকে, তবে ইহার কারণ কি? শুধু-শুধু কি একটা

ভদ্র পরিবারের দুর্নাম কেহ দিতে পারে? শুধু-শুধু কি একটি ভদ্র মহিলাকে লোকে এই রূপ হীন বলিয়া মনে করিতে পারে? তবে ইহার কি গূঢ় কারণ আছে, যাহা তাহার নেপথ্যে অতি সহজে ঘটিয়াছে এবং এই আগন্তুক নারীটিও অ-বিদিত? রমেন এই কথাটি বার-বার ভাবিতে লাগিল।

সুবর্ণ এত ক্ষণ বসিয়াছিল। সে উঠিল এবং উঠিয়া রমেন-বাবুকে এই কক্ষ-মধ্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রাখিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যোগ করিল। রমেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল—

সুবর্ণ-দি! কোথায় যাচ্ছেন?

সুবর্ণ বলিল—

আপনি ভাবুন।

রমেন-বাবু বলিল—

না, আপনি যেতে পার্বেন না।

সুবর্ণ বলিল—

না, আপনাকে আপনার ময়নাকে পাঠিয়ে দিই।

রমেন-বাবু ভাবিল—এ-নারী ত বেশ সুরসিক। সে মনে মনে বলিল—কিন্তু ঠাকরুণ, আপনি রমেনকে চেনেন না। বিমান ত রমেনের কাছে—'লিলিপুট'।

রমেন প্রকাশ্যে বলিল—না সুবর্ণ-দি! আমার ময়নাকে পাঠাতে হবে না; আমার প্রাণের ময়না যে, সে ত কাছেই আছে।

সুবর্ণ এ-কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—

প্রাণের ময়না কাছে থাকলে সে-দিন যাবার সময় একটা কথাও ত বলে যাওয়া হয়েছিল না।

রমেন বলিল—

সুবর্ণ-দি! মাপ কর। তবে তোমার হাতের দু অক্ষর পেয়ে ত রাত দুপুরে ছুটে এসেছি। সুবর্ণ-দি! এক গেলাস জল দাও ত।

সুবর্ণ 'দিই' বলিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং দেখিল মাতা ও কন্যা দুই জনে একত্র শুইয়া আছে। সে ঘরে ঢুকিয়া এক গ্লাস জল ভরিতে কাকী-মাকে বলিল—

কাকী-মা! অত ভেব না। ওতে কি হয়েছে? রমেন-বাবু ত এখন থেকে এখানেই থাকবে। যাই, রমেন-বাবুকে এক গ্লাস জল দিয়ে আসি। এই বলিয়া সুবর্ণ জল লইয়া উপরে চলিয়া আসিল।

রমেন এই সময়টায় ভাবিতেছিল—অনেক ভেবে দেখলাম সাধিকাকে 'লভার' কর্তে গেলে 'ট্রেচারি' করা হবে। বিমানটাকে ত বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, তার আশার জিনিস স্পর্শ কর্ব না, তা হলে বিশ্বাস-ঘাতকতার পাপে ডুবব। তার চেয়ে এই ভাল। বেশ চালাক। ইত্যবসরে সুবর্ণ আসিয়া বলিল—

ও কি রমেন-বাবু! তুলনা কর্চ্ছেন—কে ভাল?

রমেন যেন থত-মত খাইল। সে বলিল—

তুলনায় টিকল না? কিন্তু কথাটা হচ্ছে—বাড়ীটাকে তা হলে কি পাড়ার লোকে 'ব্রোথেল' বলে? এ-নাম ছড়াল কি করে?

সুবর্ণ বলিল—'ব্রোথেল' মানে কি—

রমেন জবাব দিল—

'ব্রোথেল' মানে বেশ্যালয়।

সুবর্ণ বলিল—

তেমনই ত বোধ হচ্ছে।

রমেন উত্তর করিল—

এর প্রতিবিধান কর্ব।

এই বলিয়া রমেন চিন্তা করিতে লাগিল। সুবর্ণ আসিয়া ধীরে ধীরে রমেনের গায়ের উপর সুবর্ণের বক্ষের আদরের মার্জার-শিশু—'রাবণকে' আস্তে ছাড়িয়া দিল। মার্জার-তনয় রমেনের গায়ের উপর মেউ-মেউ করিতে লাগিল ও রমেন তাহাকে তাড়াইতে না পারিয়া—নিয়ে যাও সুবর্ণ-দি! নিয়ে যাও তোমার 'রাবণকে'—বলিতে লাগিল।

সুবর্ণ-দি কিছু কাল উহা না লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল, শেষে নিকটে আসিয়া বিড়াল-বাচ্চাটি কোলে করিল এবং উহার একখানা হাত নিজ হাতে ধরিয়া উহাদ্বারা রমেনের গালে একটি থাবা মারাইল। রমেন বিড়াল-হস্তের নখরের আঘাত পাইয়া বলিল—

উঃ! সুবর্ণ-দি! বড্ড লেগেছে?

সুবর্ণ জবাব দিল—

ব্যথা পেয়েছ রমেন-বাবু? এস, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া সুবর্ণ রমেনের মুখে, চিবুকে তাহার নারী-হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল!

রমেন বলিল—

আঃ!

'রাবণ' কিন্তু তখন রমেন-বাবুর ক্রোড়ে কাপড়ের মধ্যে জড়াইয়া ঘুমাইয়া থর-থর শব্দ করিতেছিল।

সুবর্ণ কিছু কাল পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আদরে 'রাবণকে' বক্ষে ধরিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

—ছয়—

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া গেলেও নদের চাঁদ গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায় নদের চাঁদের পিতা ব্যস্ত হইলেন, কারণ পুত্র উপযুক্ত।

তিনি বাল্য-কালে চাণক্য-শ্লোক যে না পড়িয়াছিলেন, তাহা নহে এবং 'প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ'—ইহা বেশ জানিতেন, তাই নদের চাঁদের কোনও কার্যে তিনি বিশেষ আপত্তি করিতেন না।

কিন্তু তিনি চিন্তিত হইলে কি হইবে? গৃহিণীর অভিপ্রায় ও কার্যের বিরুদ্ধে যে কোনও কথা বলিবার তাঁহার উপায় নাই। বলিলে, হয় গৃহিণী নোড়া লইয়া বৃদ্ধের অবশিষ্ট দাঁত কয়েকটি ভাঙ্গিতে যাইবেন, আর না হয় গৃহের বাসন-কোসন তৈজস-পত্রাদি ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিবেন, অবশেষে ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া বাহির হইবেন। নদের চাঁদের বাবা তাই গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া কিছু কাল খড়ম পায়ে উঠানে ঠক-ঠক করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন এবং এ-দিক ও-দিক দেখিতেছিলেন। গাছের একটি পাতা নড়িলে কান উঁচু করিয়া পথ-পানে তিনি তাকান। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল।

নদের চাঁদের বাড়ীতে একটি কুকুর ছিল। নদের চাঁদ উহার নাম 'কালে' রাখিয়াছিল, কারণ কুকুরটির সর্বাঙ্গ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, গায়ের লোমগুলিও বেশ লম্বা-লম্বা সজারুর কাঁটার মত ছিল।

এই 'কালে'র জীবনের সহিত নদের চাঁদের যে কত মধুময় গল্প ইতিহাস জড়িত ছিল, তাহা নদের চাঁদের কাছে—'কালে' কুকুরটি বেশ—শুধু এই কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিলেই বুঝা যাইত।

অমনই নন্দের চাঁদ 'কালে'র জন্ম-বৃত্তান্ত—কোন ছাঁচ-তলায়, কোন মুহূর্তে, জন্ম-কালে কি-রূপ দেখিতে হইয়াছিল প্রভৃতি এক-ঘেয়ে বিবরণ সকলের কাছে বলিয়া বাহবা লইত। 'কালে'র বীরত্বের কথায় সে যেন নিজেই বুক টান করিত। আজ কালের দাঁত নাই, সে বুড়া হইয়াছে; তাহার রুখিয়া যাওয়ার অভ্যাস মাত্র আছে। লড়াই করিতে সে পারে না, মাত্র বিকট ঘেউ-ঘেউ করা স্বভাবটি দিন-দিন বাড়িতেছে।

নন্দের চাঁদের পিতা সমস্ত সময়ই আশা করিতেছিলেন—'কালে' বুঝি নন্দের চাঁদের পায়ের শব্দ শুনিয়া পূর্বেই জানাইয়া দিবে—মনিব আসিতেছে, কিন্তু তাহা আজ আর হইল না।

'কালে' মুখখানা পায়ের মধ্যে গুঁজিয়া ঘুমাইতেছিল।

ব্রহ্মময়ী উত্তরের পোতার ঘরের দক্ষিণ বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া পা দুইখানা লম্বা করিয়া দক্ষিণ দিকে চালাইয়া খোঁটের কাপড়ে কিছু যজমান-বাড়ীর ভিজা চাউল-ভাজা লইয়া এক এক গাল করিয়া মুখে ফেলিতেছিলেন, আর কাঁচা লঙ্কার ঝালে শিষাইতেছিলেন।

ইত্যবসরে তিনি হাঁক দিলেন, যে তাঁহার বড়ই ঝাল লাগিয়াছে, শীঘ্রই তাহাকে একটু ঝোলা-গুড় দেওয়া হউক।

বধূ-মাতা অবিলম্বে একটি ছোট পাথরের বাটীতে করিয়া কতকটা পাতলা-গুড় আনিয়া দিল।

শ্বশ্রূ-মাতা বলিয়া উঠিলেন—

বাপ-ভায়ের মাথা খেয়ে কি একটু দানাও চোখে দেখ নি? 'যেমন ঘরের ছা, তেমনই মন-ডা।'

বধূ-মাতা অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় গিয়া ঐ পাতলা গুড় কলসিতে রাখিয়া শক্ত শক্ত প্রায় এক বাটী গুড় আনিয়া দিল।

এ-বারে শাশুড়ী-ঠাকুরাণী ঝাঁকিয়া উঠিলেন—

ওরে বাবা! আমি কি তোমার মত সোয়ামী-খাকী রাক্ষসী? এত গুলি গুড় আমি খাই? একে ত আমার অম্বলের ব্যাম। জাত-নেশী! আমার সংসারটাকে উজাড় কর্বি, আর আমাকেও মার্বি?

কমলা কোনও কথা না বলিয়া মাথা নত করিয়া রহিল। ব্রহ্মময়ী চক-চক করিয়া গুড় চাটিতে-চাটিতে বেশ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঐ নিস্তব্ধ মুহূর্তে কমলা অবশ্য গণিল না, যে কত চাটায় ঐ কথিত গুড় কতগুলি শ্বশ্রূ-মাতা খাইয়া শেষ করিলেন। শেষে একটি ঢেকুর তুলিয়া কোনও মতে নিঃশ্বাসটা থামাইয়া বলিলেন—

দেখ ত, রান্না-ঘরে ল্যাম্ফোর মনে ল্যাম্ফো জ্বলছে, আর এখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রয়েছ? তেল পোড়ে না? এ কি ছাড়া-ভিটে? ওগুলিরে গিলিয়েছ?

কমলা চলিয়া গেল। রান্না-ঘরে গিয়া হাঁড়ি সারিয়া শাশুড়ীর জন্যে এক বৃন্দাবনী ভাত বাড়িল এবং নিজে না খাইয়া ঘরে শুইয়া পড়িবে—মনে করিল।

ব্রহ্মময়ী বলিলেন—

আমি একটু রাতে খাব। তুমি খাও, সার গে।

কমলা যেন বাঁচিল। তাহার খাওয়া হইয়াছে কি না হইয়াছে, ইহা শ্বশ্রূ-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন না, ইহাতে সে বিশেষ প্রীতা হইল। সে আস্তে-আস্তে ঘরে গিয়া দরজায় খিল দিল। শয্যায় শুইয়া তাহার শুধুই মনে হইতেছিল, নিশ্চয়ই স্বামী তাহার দেশ ছাড়িয়া গ্রামান্তর গিয়াছেন বা ঐ রূপ কিছু করিয়াছেন। কমলা যেন তারপরে আর ভাবিতে পারিল না। সে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দবীর মা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ ডাক দিল—

মাসি! নদে এল?

ব্রহ্মময়ী উত্তর করিলেন—

যাবে কোথায়? মাগনা খাওয়া কোথায় মিলবে? আসবেই। আজ না আসুক, কাল আসবে, কাল না আসে, পরশু আসবে। সত্যি দবীর মা! ও-নচ্ছার যদি আবার আসে, তবে আর ও-টাকে না বকে, কাকের পিত্তি বেঁটে খাওয়াব। দেখি—যদি তাতে ঘেন্না হয়। বউটাকে ত শীগগিরই বিদায় দিচ্ছি।

দবীর-মা ও ব্রহ্মময়ী সেই রাত্রিতে অনেক ক্ষণ আলাপাদি করিয়াছিলেন।

পর-দিন বেলা নয়টার সময় ভোম্বল আসিয়া বলিল—

বামুন-দি, নদে-দা কাল রাতের ষ্টীমারে কলকাতা চলে গেছেন, তা শুনেছেন?

এই সংবাদে বামুন-দি চিন্তিতা হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন—

দবীর-মা যা বলেছে, তা-ই ঠিক হল?

তিনি ভোম্বলকে দুই চারি কথায় বিদায় দিয়া ঘরে গেলেন এবং সংহারিণী মূর্তিতে প্রথমেই কমলার মাথার এক গোছা চুল ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরের বারান্দা হইতে এক লম্ফে প্রাঙ্গণে নামিয়া তদবস্থায় দবীর মার উঠানে গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন—

দবীর-মা! এই সেই হারাম-জাদী, যে পরামর্শ দিয়ে ষাঁড়কে বাড়ী থেকে কলকাতা পাঠিয়েছে। এ-কেও ঝাঁটা মেরে এক্ষুণি বের কচ্ছি।

এই বলিয়া ব্রহ্মময়ী সম্মুখ-স্থিত এক তাড়া মুড় ঝাঁটা লইয়া কমলাকে দুই তিন ঘা প্রহার দিল। কমলা, যে চুলের টানের বেদনায় না কাঁদিয়া অবাক হইয়া অশ্রু-সিক্ত-নয়না হইতেছিল, অবশেষে ঝাঁটার ঘায়ের অত্যন্ত

বেদনায় উঁ উঁ করিয়া জোরে কাঁদিল। তাহার সন্তানগুলি হাউ-হাউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

ও-দিকে উদ্ধব সমদ্দার বেলা দ্বি-প্রহরে এ-বীভৎস কাণ্ড চোখে দেখিয়া আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাঁটু-পাটু করিয়া দৌড়াইয়া গিয়া একখানা পেয়ারা গাছের ডালের কচা ভাঙ্গিয়া সপাং সপাং আট-দশটা ঘা দবীর মার পিঠে মারিলেন।

দবীর-মা 'গেছি, মরছি, বলিয়া চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিল, আর তাহার মুখে যত ছোট লোকের গালা-গালি, বকা-বকি ছিল, তাহা বর্ষণ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী তখন ছুটিয়া গিয়া ঘাড় ধরিয়া উদ্ধব সমদ্দারকে নিজেদের খলটে টানিয়া আনিয়া ঐ একই ঝাঁটা দিয়া স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

যদি দবীর-মা এখন জমিদারকে ডেকে আনে, তবে বাহাত্তোরা! তোর যে এ-গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে, তোর মাথা মুড় করে তাতে যে জমিদার ঘোল ঢালবে, তা তুই জানিস্?

এই ব্রাহ্মণ বাড়ীর কাণ্ড দেখিয়া ঐ পাড়ার নাপিত, কায়স্থ, চণ্ডাল, ধোপা প্রভৃতি সকলেই মনে মনে ছি-ছি করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মময়ীর গালা-গালির ভয়ে কেহ কোনও কথা সমক্ষে বলিতে পারিল না, শুধু ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা ইহাও ইঙ্গিত করিল—বৌ-মা-ঠান আজ গলায় দড়ি না দেয়, বা করবী ফুলের বীজ খেয়ে না মরে।

পাড়ার লোকেরা এ-বাড়ী হইতে নামিয়া গেলে, ব্রহ্মময়ী এক দৌড়ে তোষনদের বাড়ী গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুই কি নদেকে ষ্টীমারে উঠতে দেখেছিস ?

ভোম্বল বলিল—

না-বামুন-দি !

বামুন-দি জিজ্ঞাসা করিলেন—

তবে শুনলি কোত্থেকে ?

ভোম্বল জবাব দিল—

শুনেছি—ভাল মানুষের কাছ থেকে।

বামুন-দি প্রশ্ন করিলেন—

কে সে ?

ভোম্বল উত্তর করিল—

গাঙ্গুলি-মাষ্টার।

বামুন-দি পুনরায় বলিলেন—

সে জানল কি করে ?

ভোম্বল জবাব দিল—

তা আমি কি করে জানব ? শোনগে তুমি তার কাছে।

ভোম্বলের বিরক্তি-ভাব দেখিয়া ব্রহ্মময়ী আর জেরা করিলেন না। সে ত আর নদে না, বা নদের বউ না, যে তাঁহাকে ভয় করিবে।

ব্রহ্মময়ী তখন এক পা দুই পা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

*   *   *   *

কয়েক দিন পর নদের চাঁদ কলিকাতা হইতে ব্রহ্মাণ্ডনাথকে লইয়া যাত্রাপুরে ফিরিয়া আসিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের 'মায়ের দয়া' হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই ;

শরীর ভয়ানক দুর্বল। কথা কহিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তিনি ত চলিতে পারেনই না।

পথে রেলে-ষ্টীমারে নদের চাঁদ তাঁহাকে অতি কষ্টে লুকাইয়া, ঢাকা দিয়া লইয়া আসিয়াছে। কারণ রেল-ষ্টীমারের কর্তৃপক্ষগণ যদি জানিতে পারে যে বসন্তের রোগী, তবে তাহারা অমনই রোগীকে পথি-মধ্যে যেখানেই হউক, নামাইয়া দিবে। কারণ উহা স্পর্শক্রামক ব্যাধি। এক জনের বীজ অন্যে ছড়াইলে তাহারও আক্রমণের ভয় আছে। তাই এই যান-কর্তৃপক্ষ কেন এক জনের জন্য সমস্ত যাত্রীদের জীবন-সংশয় করিবে ?

নদের চাঁদ সে-দিন যখন চারু-দিদের বাড়ী হইতে কলিকাতায় রওনা হয়, তখন তাহার আনন্দ আর কে দেখে ? চারু-দি ও তাঁহার মাতা নদের চাঁদকে এই রূপ একটি ছোঁয়াচে রোগের রোগী আনিতে যাইতে বার-বার নিষেধ করিয়াছিলেন। নদের চাঁদ সেই নিষেধ শুনিয়া চারু-দিকে বলিয়াছিল—

চারু-দি ! আম্মাদের জীবনটা কি শুধু পেলে-পুষে রাখবার জন্যে ? অন্যের বিপদে যদি আমরা এত ভীত হই, তবে আমাদের বিপদে অপরে গা ঢেলে উপকার কর্বে কেন ? ধরুন, আমারই যদি ঐ রোগটা হত, তবে কি কার্ত্তিক আমার জন্যে ছুটে যেত না ? সংসারে সবাই ত আর আমার মার মতন না।

এ-বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পথে ষ্টীমারে, গাড়ীতে নদের চাঁদের এক মাত্র আনন্দ যাহাতে হইয়াছিল, তাহা কার্ত্তিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া। সেই চিন্তায়ও আনন্দ। কত দিন সে কার্ত্তিককে দেখে না ; তাহার প্রাণ যেন কার্ত্তিকের অ-দর্শনে দিবা-রাত্রি হু হু করিত। তাহার পেটের মধ্যে কত কথা যে জমিয়া স্তূপ হইয়াছিল, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নহে। তাই সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কখন সে

কলিকাতায় পৌঁছিবে। ষ্টীমার, ট্রেণ যেন পথ আগাইতে চাহে না। সে-রাত্রিতে নদের চাঁদের পথে ক্ষণ-কালের জন্য ঘুম হয় নাই।

নদের চাঁদ সেই দিন যে-অবস্থায় বাড়ী হইতে চারু-দির ওখানে গিয়াছিল, সে-অবস্থা অন্যের ঘটিলে অপরে কিছুতেই তাহাতে ব্যথিত না হইয়া পারিত না। শত হইলেও নদের চাঁদের বউ, ছেলে, মেয়ে ছিল এবং মাতার এ-রূপ গঞ্জনার মধ্যে কি রূপে সে তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া আসিয়া দুঃখিত না হয় বা নিশ্চিন্ত থাকে? কিন্তু নদের চাঁদ সে-বিষয়ে বিন্দু-মাত্র টলিল না। তাহার এক মাত্র দুঃখ হইয়াছিল, সে-দিন সে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত নিরম্বু উপবাসী থাকাতেও মাতা তাহাকে খাওয়ার আগে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু এ-দুঃখও সে বহু কাল মনের মধ্যে চাঙ্গা করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে-মুহূর্তে সে চারু-দির হাতের দই, চিড়া, গুড় পাইল, সে মুহূর্তেই তাহার সমস্ত দুঃখ অপসারিত হইল। নদের চাঁদ ভাবিল—সংসারে ইহা অপেক্ষা তৃপ্তির আর কি আছে, থাকুক তা'র বৌ আর ছেলে-পিলে? তারপর যখন সে কোন কাজ করিতে সুযোগ পাইল, তখন সে যেন বাঁচিল, তাই সে কলিকাতা ছুটিল।

নদের চাঁদ মায়ের উপর বা নিজের অবস্থার উপর রাগ করিয়া কলিকাতায় যায় নাই। কিন্তু তাহার পত্নী মনে করিয়াছিল—স্বামী মনের দুঃখে দেশ-ত্যাগী হইয়াছেন, যদিও সে স্বামীর বে-ভোলা ভাব জানিত। সংসারে স্বামী যে কি হইলে সংসারী হইবে, তাহা কমলা এত দিনেও বুঝিতে পারে নাই। খাইতে হয় স্বামী তাই খান, ঝগড়া করিতে হয় তাই তিনি ঝগড়া করেন, কিন্তু তাহার মন যে কোথায়, তাহা পত্নী অনুমান করিতে পারে নাই।

তবুও পত্নী আজ বুঝি ভাবিয়াছে, তাহার স্বামী বোধ হয় প্রকৃতই মনের সাড়া পাইয়াছেন। কমলা তাই যেন একটু স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

সে ভাবিল—বাস্তবিকই স্বামীর যদি একটু চৈতন্য আসিয়া থাকে, তবে তাহার এই যন্ত্রণার কিছু আসান হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কমলা স্বামীর জন্য ভাবিল, পাছে স্বামী ক্রোধ-বশে অন্য গর্হিত কার্য করিয়া ফেলেন।

কমলা কয়েক দিন যাবৎ যার পর নাই অশান্তি ভোগ করিতেছিল। নদের চাঁদ বাড়ী হইতে যাইবার পর হইতে শাশুড়ী-ঠাকুরাণী যেন প্রমত্তা হইয়াছিলেন। তিনি হাতে ধরিয়া মারা হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকার উৎপীড়ন সম্ভব, তাহার একটিও বাদ দেন নাই।

কিন্তু কমলা কি করিবে? তাহার মৃত্যু ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই। বাপের বাড়ীতে সে যে একখানা চিঠি বা সংবাদ দিবে, তাহাও ত এ-বাড়ীতে সম্ভব নহে।

শাশুড়ী সদাই নজর রাখিতেন—বধূ কখন কি কাজ করে। কাজের উপর ছাপার বা হাতের লেখার অক্ষর থাকিলে যদি কোন মেয়ে-জাতি উহার প্রতি নজর দেয়, বা ছোঁয়, তবে ব্রহ্মময়ী তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাঁহার মতে স্ত্রী-গণের লেখা-পড়া শিক্ষা করা মহাপাপ। মেয়েরা লেখা-পড়া শিখিলে দেশকে নরকের পথে আগাইয়া দিবে। তিনি বলিতেন—মেয়েরা বেশ্যা হয় লেখা-পড়া শিখে।

কমলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না সেই দিন, যে-দিন নদের চাঁদ হঠাৎ আসিয়া উঠানে দেখা দিল। তখন প্রাহ্ন।

কমলা সে-সময় গোটা কতক চুণো মাছ, গোটা দুই কই, আর একটা শউল বঁটিতে কুটিতেছিল, আর 'হেই-হুই' করিয়া কাক তাড়াইতেছিল। ব্রহ্মময়ী বোধ হয় তখন ছেঁচি শাক তুলিতে-তুলিতে রমার বোনের বাড়ীর ক্ষেত পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

নদের চাঁদ বাড়ীর নামো হইতে উপরে উঠিতেই কমলাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ঐটুকু পথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক লম্ফে সোজাসুজি কমলার নিকট গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

মা কি তোমার হাতে ধরে মেরেছিল সে-দিন আমি না আসাতে? যাক, মেরেছিল, মেরেছিল, ওর স্বভাবই ঐ। দেখ কমলা! কলকাতায় গিয়ে কার্তিকের সঙ্গে দেখা হল না। কার্তিকের বড়-মামার বসন্ত হয়েছিল, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হল, নইলে দিন কতক সেখানে থাকতাম।

কমলা প্রসন্ন-চিত্তে হাসি-মুখে বলিল—

এসেছ, ভালই হয়েছে। তবে মাকে বলনা—যে বসন্তের রোগী তুমি নিয়ে এসেছ। মা তা হলে আর এক কাণ্ড বাধাবেন।

নদের চাঁদ বলিল—

দেখ কমলা! আমার এতে ভয় নাই। আমি সংসারে শুধু মার বকাবকির ভয় করি। আচ্ছা, মা না বকে ধরে মার্তে পারে না? লোকে জানল না, না হয় দু ঘা খেলেমই বা। কমলা! মাও চালাক হয়েছে। মা বোঝে,—মার্লে ছেলে নষ্ট হয়ে যায়, আর মাও হাতে ব্যথা পায়।

ইহা বলিয়া নদের চাঁদ হাসিল।

কমলা বলিল—

সে সব কথা পরে হবে। কখন এলে বল দেখি? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত?

নদের চাঁদ জবাব দিল—

কমলা! চারু-দির জন্তে কি না খেয়ে থাকতে পারি? কমলা! চারু-দিকে এক দিন তোমায় দেখাব। দেখবে—যেন পাথরের প্রতিমা। স্বভাবটা

যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা,—ভালবাসেও তেমনই শীতল করে। কমলা! কলকাতায় এখন বড় গরম। কমলা! যাই, মাকে ডেকে আনি।

এই বলিয়া নদের চাঁদ সন্নিহিত গৃহের ছাঁচ হইতে—মা—ওমা—বলিয়া গলায় যত জোর আছে, তাই দিয়া ডাক দিল এবং আমি এসেছি, শীগগীর বাড়ী এস—বলিয়া গগন-পথেই সংবাদ পাঠাইল।

কমলা তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাছের খালই লইয়া ঘাটে মাছ ধুইতে গেল। নদের চাঁদ মিহি গলার সুর ভাঁজিতে লাগিল—

'[illegible] জন্য কাঁদেরে আমার মন'

সে হঠাৎ গায়ের সমস্ত গেঞ্জি, চাদর প্রভৃতি এক টানে খুলিয়া বাস্ত-ঘরের চালার উপর ছুঁড়িয়া মারিল। সেগুলি রৌদ্রে ভাজা ভাজা হইতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ পরে ব্রহ্মময়ী দুই তিনটি বাহন সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে উঠিয়াই বলিলেন—

কে ডাকলিরে আমার বৌ?

বধূ কোন কথা না বলিয়া মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়া শাক ধুইবার ডালাখানা হাতে করিয়া আনিয়া উহা বাড়াইয়া ধরিল। শ্বশ্রূ তাহাতে শাকগুলি মুঠো মুঠো করিয়া তুলিয়া দিলেন।

ও-ঘরে নদের চাঁদ তখন একটা নারিকেল ছুলিবার কার্যে ব্যস্ত ছিল। সে জবাব দিল—

মা! সে-দিন চারু-দি আমায় খুব খাইয়েছিল। সারা দিনের না-খাওয়া, শরীর কষে গেছল। তা চিড়ে, দই, গুড় খেয়ে দেহটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু মা! কাকী-মার ভাতগুলি আর খেতে পার্লাম না। একটা টেলিগ্রাম এল।

রান্না-ঘরে তখন কমলার মন কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—

যা বারণ করেছি, তাই। এমন বুদ্ধি! আবার প্রস্তুত হই। এ-বারে বুঝি মাথার চুলগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, না তার চেয়ে আরও বড় শাস্তি দিতে পারেন। কি সে শাস্তি!

নদের চাঁদ নারিকেলটি ভাঙিয়া তাহার জলটুকু ফেলিয়া দিল, কারণ ঝুনা নারিকেলের জল সুপেয় নহে এবং এক খণ্ড নারিকেল হইতে দা দিয়া এক একখানি ফালি সে তুলিতেছিল আর মুখের মধ্যে তাহা পুরিয়া চিবাইতেছিল। সে উহা চিবাইতে-চিবাইতে বলিল—

মা! গেলুম ত কলকাতায়, কিন্তু যা-ই বল মা! সেখানে কি থাকতে মন টেঁকে? দু-দিন বেশ কাটালুম, শেষে মনে হতে লাগল, এ দু-দিন যে আমার নির্জ্জলা গেল। মা! যা-ই খাই, তোমার বকুনি না খেলে যে আমার পেট-ই ভরে না। মা! তোমার পায়ে পড়ি, তোমার সব অত্যাচার সহ্য কর্ব—মার, ধর, কাট, বাঁট—সব সইতে পার্ব, কিন্তু মা! তুমি অত জোরে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে নিও না। মা! এ-বারে প্রতিজ্ঞা কর্লাম, আর আমি দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। এই এক বার কলকাতা গিয়ে আমার সাধ মিটেছে। মা! কার্তিক কলকাতায় গিয়ে কি করে কাটাচ্ছে? সেখানে ত কেউ কারুর সাথে কথা কয় না। গায়ে ঘেঁষা লাগলেও চেয়ে দেখে না—কে ঘেঁষা মারলে। সত্যি মা! সেখানে গিয়ে আমার মনটা সব সময়ই পালাই-পালাই কর্ত, আর ভাবতাম—তোমার ক্যাটক্যাটানিই আমার ভাল ছিল।

ব্রহ্মময়ীর মেজাজটা তখন নরম ছিল। তিনি বলিলেন—

ঐ যে তোমার হু কা নদের চাঁদ!

নদের চাঁদ হুঁকার খোঁজ দেওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—

হাঁ, ভাল কথা, হুঁকাটাকে একটু তেল মাখাই। ইঃ! জলটা যে একেবারে গোদা হয়ে গেছে! যা! এই কত দিন বিড়ি খেতে-খেতে কলজেটা যেন শুকিয়ে যাবার মত হয়েছে।

এই বলিয়া নন্দের চাঁদ এক লম্ফে হুঁকাটা লইয়া উহার জল পরিবর্তন করিতে ঘাটে গেল।

—সাত—

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সুস্থ হইয়া গ্রামের কাজ-কর্ম লইয়া ব্যস্ত হইলেন। তিন রাত্রির অধিক তিনি গ্রাম ছাড়িয়া এ-যাবৎ বড় বিশেষ থাকেন নাই, তাহাতে কত দিন হইল বাড়ী-ছাড়া। তাই চতুর্দিকের রাশি রাশি কাজ তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল। তিনি যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় আজ দুই দিন পাইতেছিলেন না। ভগিনীর বাড়ীতে তিনি প্রথমতঃ কয়েক দিন কাটাইলেন, সেখানেও বহু লোক তাঁহার সন্ধানে ফিরিত। তারপর তিনি নিজ গ্রামে গেলেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বৈষয়িক লোক ছিলেন। প্রজা-জন যথেষ্ট ছিল। তারপর তাঁহার তেজারতী কারবারও বৃহৎ ছিল। তাহাতে খাতক-পত্র বেশ তাঁহার কাছে আসিত, যাইত। প্রজারা ও খাতকরা তাঁহাকে ভয়ের চোখেই বেশী দেখিত, কিন্তু পরোক্ষে গালাগালি দিত। বলিত—বামনা চামার, শালা সুদ-খোর। কারণ ব্রহ্মাণ্ডনাথ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিত। খাতকরা পায়ে ধরিয়া, বহু কাঁদা-কাটা করিয়া চোখের জলে মহাজনের পা ধুইয়া দিলেও তাহাদের একটি পয়সা সুদের মাপ হইত না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ 'হাইকোর্টে'র যে-মামলার জন্যে কলিকাতা গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হারিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনোভাব যে আজ-কাল কি-রূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মামলাটি আজ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল। মধুমতী নদীর পারে যে চর উঠিয়াছিল, সেই সম্পর্কে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের একটি অদ্ভুত স্বভাব বহু দিন হইতে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মধুমতী নদীর যে-চরটিই উঠিত, তাহাই তিনি দখল করিয়া লইতে সক্ষ করিতেন। এই মতলবানুযায়ী তিনি তাহার গ্রামের উত্তরে চারি পাঁ মাইল ও দক্ষিণে সাত আট মাইলের মধ্যবর্তী মধুমতী নদীর তীর-সংলগ্ন যত জায়গা ছিল, তাহা অধিকার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

এই চরা জায়গায় শস্যাদি অতি সুন্দর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিত দরিদ্র মুসলমানরা ঐ স্থানে গিয়া জমি-জাতি পাইয়া বস-বাস করিতে ভালবাসিত ও জমিদারকে বেশ খাজনা দিত এবং জমি বন্দোবস্ত, না পত্তন বাবদ মোটা টাকা সেলামী প্রদান করিত।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের এই বুদ্ধি করিয়া বেশ সম্পত্তি হইয়াছিল ও তি অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দুঃসাহসিক কার্য করিতে গি আবার তিনি চরিত্রটাও খুনী করিয়াছিলেন, কারণ কথায় কথায় ফৌজদা খুন, জখম, লাঠিয়ালী করিতে না পারিলে রাজ্য-বিস্তার হইত না। বাবদ যে টাকা ঢালিতে হইত, সম্পত্তি লাভ হইলে তাহার আট দশ ফিরিয়া পাওয়া যাইত। এই করিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথের নাম হইয়াছিল 'ডাকাত ব্রহ্মাণ্ড।'

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডনা গা-ঢাকা থাকিতেই চাহিতেন। এ-বারে আর তাহার সে-বিক্রম খাটিবে যে নিজ জমির সংলগ্ন বা দূরবর্তী চরা মাথা তুলিয়া উঠিলেই তাঁ হইবে এবং তিনি বলিবেন—ও চর ত বহু দিনের, নূতন ওঠে নাই। অবশ্য দেশে আসিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার 'মায়ের দয়া' হওয় এ-মামলায় 'হাইকোর্টে'র জজের কাছে তিনি সময় লইবার প্রার্থনা জান মামলা মুলতুবী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি

হারিয়া গিয়াছেন, ইহা কত দিন চাপা থাকিবে? বিপক্ষগণ যে শীঘ্রই 'ইনজাংসন' ঢ্যাড়া পিটাইয়া জারি করিবে। ব্রহ্মাণ্ডনাথের তখন গর্ব চূর্ণ হইবে না?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সংপ্রতি দেশের জন-হিত-কর কার্য লইয়া বড়ই লাগিয়া পড়িলেন, কারণ উহাই যে এখন তাঁহার অবলম্বন। সাধারণ লোকে যাহাতে তাঁহার প্রতি বিষ-কটাক্ষ না ফেলিতে পারে, তাহার জন্যই যে এখন তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইবে।

ইদানীং তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া যথা-বিহিত স্নান-আহারাদি কার্য শেষ করিয়া প্রথমেই নবীন ডাক্তারের আড্ডায় যাইতেন এবং দেখিতেন—দাতব্য চিকিৎসালয়ে রীতি মত ঔষধ-পত্র দান করা হয় কি না। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছিতেই বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রোগের রোগী আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিত। এ বলে—ডাক্তারবাবু অসুদ দেয় না। ও বলে—আজ তিন মাস ধরে 'ম্যালোয়ারী'র তেঁতো জল গিলছি, রোগ সারে না। অন্যে বলে—নবীন ডাক্তার টাকা না পেলে ভাল রংয়ের 'মিটচার' দেয় না। কেহ বলে—অসুদই নাই, দেবে কি?

এই রূপ আবেদন-নিবেদন, আসামী-ফরিয়াদী, সওয়াল-জবাব, রায় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথের বাড়ী ফিরিতে বেলা হইয়া যাইত। তারপর তিনি বৈকালের দিকে দুই এক জন দেশীয় পাইক বরকন্দাজ লইয়া রাস্তা-ঘাট, খোঁয়াড়, খেয়া-পাট প্রভৃতি দেখিতে যাইতেন, এবং সেখানে এক প্রহর সময় কাটাইয়া দেশের হিত-কর-কার্য তদারক করিতেন, অর্থাৎ কতগুলি বাজে লোক-দেখান কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আবার প্রতি রবিবার ইউনিয়ন বোর্ডের' 'জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিতেন'। তাহাতে লোকের সাজাই হইত, উপকার যে কি-রূপ হইত, তাহা দেশের লোকেই ভাল বলিতে

পারিত। ব্রহ্মাণ্ডনাথ তাই সেখানকার লোকের চোখে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো' বা।

কিন্তু এ-দিকে যে তিনি অরুন্ধতী ও চারুর তাগীদের উপর তাগীদ শুনিয়াও এ-বাড়ীতে আসিয়া এই উদ্বিগ্না নারী দুইটিকে বিস্তারিত সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবেন, ইহা তাঁহার সময়ে কত দিনই কুলাইতেছিল না। সে-দিন সকালেও নন্দের চাঁদ আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছে—বড়-মামা! অবশ্য করে আজ যাবেন, কাকী-মা আমায় বকেন। চারু-দি ত বলেন—'নন্দের চাঁদ কি বুড়ো-বুড়ী পোড়াচ্ছ? আমায় বুড়ী বানাও।

বড়-মামা আজ স্থির করিয়াছেন—ভগিনীর বাড়ীতে যাইবেন। কিন্তু সেখানে যাইবেন কি? তিনি ঐ ব্যাপার মনে করিয়াই যে রাগিয়া অস্থির। ঐ ব্যাপারই নাকি তাঁহাকে মামলায় হারাইয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তাই রাগে গড়-গড় করিতেন। তিনি এ-যাবৎ বহু চিন্তা করিয়াছেন—কিসে ইহার প্রতিবিধান করা যায়। যে-কারণ তাঁহাকে মামলায় হারাইল, তাহা কি-উপায় অবলম্বন করিলে সমূলে বিনষ্ট করা যায়।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ মনে মনে বলিলেন—

যদি ঐ অপয়া মাগীটাকে চোখের জলে, নাকের জলে করা যায়, তবে আমার সাধ মেটে, ও-মাগীটার পোড়া নিঃশ্বাস গায়ে লেগে কার্তিক ছোঁড়াটা নিরুদ্দেশ হল, আর আমিও জীবনে এই নূতন মামলায় হারলাম।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ মনে-মনে রাগিয়া বলিলেন—

চেন না মণি! তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে? এ-মাটিতে আর তোমার স্থান হবে? মনেও তা জায়গা দিও না। যে-টাকে নিয়ে বেরিয়েছিলে, সে-টা ত মরেছে, এখন আর একটাকে জুটিয়ে নাও। তার কি আর অভাব আছে?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখনই অরুন্ধতীর বাড়ী রওনা হইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া জল-যোগ করিয়া চাদরটা গলার দুই ধারে ঝুলাইয়া, কাপড়টার কোঁচা দো-ভাঁজে গুঁজিয়া, একখানা মোটা বাঁশের লাঠির মাঝখানে ধরিয়া রওনা হইলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি পান চিবানর কাজটা শেষ করিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যখন ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন বেলা পাঁচটা। চারু তখন কতগুলি বোরো ধানের গুমা খড় অর্ধ-শুষ্ক অবস্থায়ই এক জায়গায় জড় করিতেছিল।

বড়-মামা পৌঁছিতেই সে সেই কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া বিস্তীর্ণ উঠানটি এক তাড়া ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া ফেলিল। সে দ্রুত পদে গিয়া ঘর হইতে একটি বেতের মোড়া আনিয়া বড়-মামাকে ঘরের হাতিনায় পাতিয়া দিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ কিছু কাল অরুন্ধতীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে আলাপ করিতেছিলেন।

অরুন্ধতী বলিলেন—

দাদা! শরীরটা ভাল হয়েছে?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ জবাব দিলেন—

হাঁ, ভাল হয়েছে, তবে বড়ই চুলকনায় ধরেছে।

অরুন্ধতী পুনরায় বলিলেন—

তেঁতো খাও, নিম-পাতা ভাজা খাও। এখন এই চুলকণা ভাল হয়ে গেলেই শরীর ভাল হতে আরম্ভ কর্বে। বসন্তের পর চুলকণা হয়, তা ঐ চুলকণা সারলে ধর-ধর করে শরীরের পানোক ফেরে। ঐ সে-বার গাঙ্গুলি-মাষ্টারের হয়েছিল, সেরে গেল, দু-দিনে আবার আগের শরীর হল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভাগ্নী-প্রদত্ত মোড়ায় আর বসিলেন না। দুই ভাই-বোনে আলাপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। চারুর খাটুনি যেন ভয়ানক জোর হইল। তাহার ইচ্ছা—তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাটা লাগাইয়া, রান্না-বান্না সারিয়া স্থির চিত্তে গল্প শোনে। হইলও তাই।

চারু বলিল—

বড়-মামা! রান্না হয়ে গেল বলে। মাছের ঝোল, আর ভাত। খড়ে জ্বাল দিলে, হতে কতক্ষণ? আপনি আগে কিছু বলবেন না। আমি রান্না সেরে আসি বড়-মামা!

বড়-মামার কথা বলিবার পূর্বে ভগিনী বলিলেন—

পাগলী ঝড়ের মত খাটছে। বড়-মামা মাথা নাড়িয়া ভগিনীর কথায় সায় দিল। অরুন্ধতী বলিলেন—

চারু! ঝোলটা যেন ভাল হয়। তোর বড়-মামা কিন্তু খারাপ রান্না খেতে পারেন না।

চারু বলিল—

বড়-মামা! খাওয়া হবে ত গল্পের পরে?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উত্তর দিলেন—

হাঁ তাই। তুই রান্না সেরে আয়।

অরুন্ধতী ও চারু শুনিয়াছিলেন—কার্তিক আসিল না। কিন্তু সে যে নিরুদ্দেশ, ইহা তাঁহারা শোনেন নাই। তাঁহারা এখন তাহা শুনিয়া বিশেষ চিন্তিতা হইলেন এবং তাঁহাদের আর কোনও কথা ভাল লাগিল না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা ভ্রূ-ক্ষেপ না করিয়া তাঁহার ক্রোধের মহলা দিতে বসিলেন।

ইত্যবসরে গাঙ্গুলি-মাষ্টার তাহার সায়ং-ভ্রমণ ছলে চারুদের বাড়ী আসিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডনাথকে দেখিয়া বলিলেন—

আপনি কবে এলেন? শরীর ত একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। কার্তিকের খবর কি?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ পূর্বেই উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তিনি গাঙ্গুলি-মাষ্টারের জিজ্ঞাসিত কথার জবাব না দিয়া বলিলেন—

দেখ মাষ্টার! কি যে অদেষ্ট! তা আর কি বলব? এই যে আজ-কালের হালী 'ফ্যাসান' হয়েছে—মেয়েদের লেখা পড়া শেখাও—এ-টাই দেশটাকে উৎসন্ন দেবে। আমাদের 'তা' থাকল কই? সেই সনাতন হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি ত চুলয় গেল। এই ইংরেজী ধরণের সাজ, ইংরেজী ধরণের আদব-কায়দা, ইংরাজী পড়া, ইংরাজী চাল-চলন, ইংরাজী প্রেম—সবই হচ্ছে এই পুরাণ হিন্দু-সমাজটাকে নরকের পথে টেনে নেওয়ার ফন্দী। হারে! দেশ কি আমাদের তেমন? এ হল গরম দেশ, এখানকার লোক ভাব-প্রবণ! ঐ যে শুনেছি—বিলেতের মেয়েরা খেলে, বেড়ায়, পড়ে, চাকরি করে—সবই পুরুষের সাথে, কিন্তু কই তাদের ভেতর ত এত হক না হক প্রেম হয় না? তারা মেয়ে-পুরুষে মনে করে সঙ্গী-সঙ্গিনী। এ-রকম নিয়ম তাদের বহু দিন থেকে চলে আসছে, আর চির-কাল চলবে। সে-দেশের আবহাওয়া, সে-দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সে-দেশের অতি শীত, সে-দেশের অর্থের স্বচ্ছলতা, সে-দেশের চাল-চলন—সবই যে সে-রকমে বাঁধা। সে-দেশের বিয়ে হয় এক একটা মেয়ের কুড়ি পঁচিশ, বরং তার চেয়ে বেশী বয়সে, কিন্তু সে-দেশে কি এমন হয়, যে তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েদের উপর আঠার-কুড়ি বছরের ছেলেদের এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা? আজ-কাল কলকাতায় দেখেছি—বেশী বয়সে মেয়েদের বিয়ে সুরু হয়ে, এক রকম মজা হয়েছে। মেয়েরা এখন বড় হয়ে রাস্তায় বেরোয়, আর কি না ছেলেগুলোর মহাপর্ব। এত দিন তাদের কোনও বয়সের মেয়েকে দেখতে ঘরের

জানালায়, কি খোঁপরে, কি ছাদে, কি গঙ্গার ঘাটে ওঁৎ পেতে থাকতে হত। এখন আর তা হয় না। এখন একটা মেয়েদের স্কুল ছুটি হলেই হল, বা বিকেলে রাস্তায়, কি সকালে 'পার্কে' গেলেই হল। ছেলেদের এখন কত সুবিধা। আজ-কাল কত 'নভেলীয়ানা' হয় কলকাতায়! আর দেখ বিলেতে, সেখানে ও-সব কেউ ভ্রূ-ক্ষেপও করে না। হাঁ, তবে এই মেয়েদের রাস্তায়, ঘাটে, স্কুলে, মাঠে, দোকানে—সব জায়গায়ই যখন এই ছেলেরা সব সময় বিলেতের মত দেখতে পাবে, তখন আর এই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকান থাকবে না। তবে এ-পরিবর্ত্তন অবশ্য শীগগিরই এ-দেশে হবে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি—এই শুভ-কর্ম হবার আগেই যে আমাদের সর্বনাশ। কালিয়া জায়গাটা অত্যন্ত শিক্ষিত, সভ্য, প্রগতিশীল কিনা, তাই বৌটিও আমাদের তাই হয়েছেন, সমাজের শুভাদৃষ্টের ফল দেখিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমারও কপাল পুড়িয়েছেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যে-সমস্ত কথা বলিলেন, গাঙ্গুলি-মাষ্টার তাহাতে মাত্র সায়ই দিলেন। কারণ তিনি জানিতেন—তাঁহাদের প্রেসিডেন্ট-মহাশয়ের কোনও কথায় কেহ প্রতিবাদ করিলে প্রেসিডেন্ট-মহাশয় বিশেষ চটিয়া যান। সুতরাং গাঙ্গুলি-মাষ্টার-মহাশয় শুধু ব্রহ্মাণ্ডনাথের কথাই শুনিয়া গেলেন।

গাঙ্গুলি-মাষ্টার বলিলেন—

বড়-মামা! বৌ-মা কি করেছেন?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিকৃত ভঙ্গিমায় বলিলেন—

তিনি শিক্ষার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। গ্রামের নাম রেখেছেন। তিনি ভয়ানক প্রগতি-পরায়ণা, তাই-ই প্রমাণ করেছেন। আরও কি করেন, জানি না। চারু সতৃষ্ণ-নয়নে ব্রহ্মাণ্ডনাথের পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

বধূ-মাতা একটু প্রেমে পড়েছেন। বিমান বলে ঐ যে একটা ছোঁড়া ছিল, যার কথা তোমাদের কাছে বলেছি—তিনি তারই জন্যে যথা-সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন।

চারু জিহ্বা দন্তে কাটিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিতেই লাগিলেন—

গাঙ্গুলি! আমাদের সে-শিক্ষা কই? দেশের শিক্ষা কি-রূপ হওয়া উচিত, তা আমাদের শিক্ষা-নিয়ন্তৃগণ স্থির করেন। তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কথা বলাই ধৃষ্টতা। তাঁদের সব বড় মাথা, বড় বুদ্ধি। আমরা মূর্খ। তবে এ-টা বলা যেতে পারে, যে-শিক্ষায় শুধু 'নভেলীয়ানা' এনে দেয়, বিলাতী ভাব-ধারার এক অংশ অনুকরণ কর্তে প্ররোচিত করে, সে-শিক্ষা শিক্ষাই নয়—তা ছেলেদেরই হউক, আর মেয়েদেরই হউক। আমাদের আগেকার বাল্য-বিবাহ, গৌরী-দান যেমন শিশু-মৃত্যুর, বৈধব্যের সৃষ্টি কর্ত, তেমনি এই পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্তমানে মেয়েদের নিঃশেষ করছে, তাদের মাতৃত্ব-শক্তি কেড়ে নিয়ে অসার-সঙ্গিনী যক্ষ্মা-জননী কচ্ছে। সত্যি আমার দুঃখ হত—কলকাতায় যখন বৈকালে স্কুল-ফেরত মেয়েদের পানে তাকাতাম। দেখতাম—অমন কোমল-কান্তি ঠোঁটগুলি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—বাড়ী ফিরবার পথে শুধু তারা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে। স্কুলের গাড়ীতে মিহি-সুরে কথা কইছে, যেন ছ-মাসের রোগিণী। আবার কেউ বলেন দেহের ওপর এই দৌরাত্ম্য করে মেয়েদের প্রেমের স্পৃহা কমিয়ে, ইন্দ্রিয়-সংযম শেখান হচ্ছে। কিন্তু তাতে যে ননী-তোলা দুধের চিনি-পাতা দই হয়, তা কি শিক্ষা-নিয়ন্তৃগণ, সমাজ-শাসকগণ বুঝছেন না? সেই মন সংযম করে যে ইন্দ্রিয়-সংযম, তা বা কি জিনিস? আর ঐ যে কি বই বলে—কাব্য, উপন্যাস পড়িয়ে

ইন্দ্রিয় উৎক্ষিপ্ত করে, খেতে না দিয়ে, শুকিয়ে জিতেন্দ্রিয় করা বা কি জিনিস? ইংরাজীতে যাকে বলে 'বার্থ-কনট্রোল'—অর্থাৎ জন্ম-রোধ, তা এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের কৃপায় আপনি হবে, এ-জন্য আর চেষ্টা করে সন্তান জন্ম বন্ধ কর্তে হবে না। এ-টা হচ্ছে সে-রকম। ঐ যে এক-জন বলেছিল—আমরা পাঁচ ভাই আছি, পাঁচখানা ঘর লাগে; কত দড়ি, বাঁশ, খড় বছরে দরকার হয়, একটা দুইটা ভাই মরে যেত, একখানা দুইখানা ঘর কমিয়ে দিতাম, তাতে কম দড়ি, বাঁশ, খড় লাগত। কিন্তু সে মূর্খ বোঝে না, যে ঐ পাঁচ ভাই রোজগার কর্লে পঁচিশখানা ঘর হতে পারে। শরীর শুকিয়ে শুক-দেবের সৃষ্টি করা ভাল, না দেহ পুষ্ট করে জনক-রাজা হওয়া ভাল?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যে-সমস্ত যুক্তি-বিরোধী কথা বলিলেন, গাঙ্গুলি-মাষ্টার তাহাতে অনন্যোপায় হইয়া কেবল মাথা নাড়িয়াই গেলেন, আর হুঁ-হাঁ করিয়াই গেলেন।

অরুন্ধতী বা চারু এই কথা-বার্তা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন—

সে বউটা তা হলে খারাপ হয়ে গেছে?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উত্তর করিলেন—

তা একেবারে গেছে।

অরুন্ধতী বলিলেন—

কার্তিকটাকে খুঁজে-পেতে আনলেই ভাল হত।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ কার্তিকের নামে তখন হাসিলেন। তিনি হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

দেখ অরু! সেইটার উপর আমার হাসিও পায়, রাগও হয়। ঐ

বিমানটা যখন বসন্তে মারা গেল, তখন আমাকেই ত দাহ কর্তে হল। আমি কার্তিকটাকে ত নিয়ে কাশী মিত্তিরের ঘাটের শ্মশানে গেলাম, সেইটা তখন বললে—বড়-মামা! আমি দিদির কাছে, বৌ-দির কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি, নৈলে তারাও যদি বিমান-বাবুর মত ক্ষমা না করে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। এই বলে কার্তিকটা যে গেল, আর এল না। মাষ্টার! আমি বুঝছি—কার্তিকেরও ভাবনা নাই, সে কলকাতা সহরে দিদি-বৌ-দি যোগাড় কতে পেরেছে। আমাদের বধূ-মাতা সাধিকা দেবীর মত কারা যেন আমাদের গুণ-ধর পুত্রের আঁঠায় জড়িয়ে গেছেন। আর অরু! তোমার ছেলের খাওয়া-থাকার ভাবনা কি? তবে এখন শরীরটা সুস্থ থাকলে হয়, বসন্ত থেকে উঠেছে। তবে শীগগির আর তার এ-কালের রোগের ভয় নাই। আমি মাষ্টার! বুঝি না, এ পাগলের প্রেমে কে পড়ল?

চারু-দি বলিল—

বড়-মামা! তুমি শুধু খারাপটাই ধর। কার্তিককে সবাই ভালবাসে, কারণ সে বড় সরল। ক্ষেপাটে কিন্তু পাগল ত নয়। সে কারুর দৃষ্টিতে পড়বে কেন?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ চারুর কথায় হুঁ করিলেন।

তিনি বলিলেন—

আমি ও-কথা ঠাট্টা করে বলেছি। তুই কিছু মনে করিস না চারু! কিন্তু তা ত হল, মামলাটায় হেরে গেলাম, কি যাত্রা করেই যে বেরিয়ে ছিলাম, তা আর বলার নয়।

অরুন্ধতী তখন বারম্বার দাদাকে কলিকাতার ঐ ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডনাথও তাহা বলিলেন।

শেষে অরুন্ধতী বলিলেন—

দাদা! কার্তিক যখন আসত, আসত। কিন্তু বৌ-মাকে তুমি নিয়ে এলে না কেন? নদে ত তোমাকে ও বৌ-মাকে এক সঙ্গে আনতে পার্ত্ত।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ দৃঢ় স্বরে বলিলেন—

আমার শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে অমন কুলটাকে বাড়ীতে আনব? ওকে ত ত্যাগই করেছি। ফিরে কার্তিককে বিয়ে দেওয়াব, তার ত কাঁচা বয়স। ঐ বেশ্যাকে ঘরে এনে সংসারটাকে নরক বানাব? ওরে ঘরে আনলে যে সমাজে পতিত, এক-ঘরে হয়ে থাকতে হবে, তা জান অরু?

বড়-মামার এই কথায় সব চেয়ে বেশী যে ব্যথা পাইল, সে চারু। সে ভয়ে যেন কাঁপিতে লাগিল। অমন অল্প বয়সের মেয়েকে ত্যাগ! তা হলে যে সে-হতভাগিনী আরও ডুবে যাবে।

সে চুপ করিয়া থাকিল। তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি এক বার বড়-মামার মুখের পানে, আর এক বার মায়ের চোখের পানে পড়িতে লাগিল।

অরুন্ধতী দাদার দৃঢ় স্বরে ভীতা হইয়া বলিল—

তা দেখ, তোমার যে মত হবে তার বিরুদ্ধে ত কোন কথা বলতে পারি না, বা বলতে সাহস করি না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—

এমন বলবে এ-আশে-পাশের গ্রামে কার কটা মাথা আছে? মাথা ভেঙ্গে গুঁড় করে দেব না? তবে অন্যায়ের পক্ষপাতী ব্রহ্মাণ্ডনাথ নয়। ন্যায় কথা বল, জুতো মাথায় বইব, অন্যায় বল, ঐ জুতো মাথায় মারব।

কি! এত বড় আস্পর্ধা! তুই আমার ভাগ্নে-বউ, তুই কি না গ্রামের কে না ধর্ম-সম্পর্ক পাতিয়েছে, তার সাথে গিয়ে কলকাতার বাসায় থাকিস? আর লোকে বলবে—ব্রহ্মাণ্ড! তোমার ভাগ্নে বউ বাজারে বেশ্যা। অরু! অরু! ডুবে গেলাম! কালিয়া সভ্য জায়গা—সেখানকার মেয়ে এনে আমার সংসারটা রসাতলে গেল। আর দেখ অরু! দোষ ঐ মাগীর মার। তুই একলা সেখানে যাবি, যা; মেয়েকে নিয়ে যাস কেন? মেয়ে বিয়ে দিয়েছিস, মেয়ে পরের হয়েছে; তোর সে-মেয়ের উপর কি হাত? তা মাগী মেয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকেছে। ঐ বিমান যেন তোর সাত জন্মের জামাই। তবে মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেই পার্তিস। কার্তিককে জামাই পছন্দ না হয়ে থাকে, মেয়েকে নব গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মার্লে পার্তিস। তার সঙ্গে আর একটা বংশকে ডুবান কেন? অরু! আমার রাগ যেন কিছুতেই কমছে না। আজ ত কম দিন হল না। সেই কলকাতায় ঐ বাসায় যাওয়া অবধি এই পর্যন্ত আমি যেন রাগে পুড়ে ছাই-ছাই হয়ে যাচ্ছি। তা এত দিন কাউকে বলতে পারি নি, আজ বললাম। দেখ অরু! আমি এর রীতি মত ব্যবস্থা কর্ব, তবে আমার মনে শান্তি আসবে, নইলে এ-রাগ ক্রমেই বাড়বে।

অরুন্ধতী বলিলেন—

দাদা! এই নিয়ে বাজা-বাজি কর্লে দুর্নাম আরও ছড়াবে না? থুতু উপরের দিকে ফেল্লে যে নিজের গায়েই লাগে। এতে আমাদের মুখে চুণ-কালি আরও পড়বে না?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

বাজা-বাজি আর কি? প্রতিশোধ কি করে নেব, তাই-ই এত দিন

ভাবছি। এই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিঃস্তব্ধ হইলেন। অরুন্ধতীও নীরব রহিলেন।

চারু কি যে ভাবিবে বা করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে যে বড়-মামার ক্রোধের তর্জন গর্জন বিশেষ শুনিতেছিল, তাহাও মনে হইল না। সে শুধু অপলক-নেত্রে চিন্তা করিতেছিল বৌটির অবস্থা এবং কল্পনার নেত্রে বৌটির ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি কি হইবে ইহা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল। ইত্যবসরে ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

গাঙ্গুলি! কটা বাজে?

গাঙ্গুলি-মাষ্টার উত্তর করিলেন—

প্রায় দশটা! যাই, আমিও উঠি।

এই বলিয়া মাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইলেন। তাহার অনেক বক্তব্য থাকিলেও তিনি মনে মনে তাহা চাপা রাখিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড চারুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

চারু! দুটি খেতে দে।

চারু তন্মুহূর্তে উঠিয়া কোনও কিছু না বলিয়া রান্না-ঘরের দিকে গেল এবং দেশলাই দিয়া কেরোসিনের ডিবাটি ধরাইয়া ঢাকা ভাত ও মাছের ঝোল বাড়িতে লাগিল। সে তাহার হাতের কাজ করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন যে কোথায় ছিল, তাহা সে নিজেও জানে নাই।

চারু চলিয়া গেলে দুই ভাই-বোনে কিছু কাল আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার সারাংশ ইহাই ছিল—চারু বোধ হয় দুঃখিতা হইয়াছে।

চারু ভাবিতে লাগিল—

বড়-মামা হয় ত মিথ্যা করিয়া অভাগীকে দোষী করিতেছেন। তিনি হয় ত কার্ত্তিকের বৌদের কোনও ব্যবহারে রুষ্ট হইয়াছেন। বড়-মামাকে

আদর-যত্ন করিতে হয় ত তাঁহারা ত্রুটি করিয়াছেন। আর না হয় বড়-মামা 'হাই-কোর্টে' মামলা করিতে গিয়া উহাদের বাসার ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ও বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাই ঐ মামলার যথানুরূপ তদ্বির করিতে পারেন নাই ও মামলায় হারিয়া গিয়াছিলেন, তাই নানা কারণে হতভাগীদের উপর দোষ চাপাইয়া দিতেছেন, চারুর সে-জন্য নিতান্ত ইচ্ছা হইল—কি করিয়া এই অজ্ঞাত বিষয় সম্যক জানিতে পারে। সে কোনও মতে রাজী হইতেছিল না—যে ভ্রাতৃ-বধূ চরিত্রহীনা।

চারু মনে-মনে তাহার বড়-মামার বিরুদ্ধে অনেক নজীর পাইতে লাগিল। সে ভাবিল—

বড়-মামা যে সে-কেলে মতের, তাহা ত তাঁহার কথায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। তিনি নব্য তন্ত্রের নন। পুরাতন যাহা কিছু, সবই তাহার উৎকৃষ্ট। প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষা, সমাজ, চাল-চলন যাহারা ভাল বলে, তাহাদেরই তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দেন। তিনি মোটেই মানিয়া লইতে স্বীকৃত নন, যে দিনের পরিবর্তনে সমস্তের পরিবর্তন হইয়া যায়। কার্তিকের বধূ হয় ত আধুনিক কিছু হাব-ভাব দেখাইয়াছে, তাই তাহার উপর তিনি অগ্নিশর্মা হইয়াছেন।

চারু আরও ভাবিল—সাধিকা দেশের লোকের বাসায় গিয়া আছে, তাহাতে কি এমন গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, যে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে? সেই দেশের লোক বিমান-বাবু যদি প্রকৃতই সৎ ও আপন হন, তবে সেখানে বাস করায় বিশেষ কিছু গর্হিত কার্য হয় নাই।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ আহারান্তে গিয়া ভগিনীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে চারু আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। সে শেষে স্থির করিল—এ-বিষয় বিস্তারিত না জানিয়া-শুনিয়া ভ্রাতৃ-বধূকে সে দোষী সাব্যস্ত করিবে

না। সে মনে মনে বলিল—হাঁ, যদি বিমান-বাবুই খারাপ হন, আর কার্ত্তিকের বৌ ভাল হয়, তবে সেই বিমান-বাবু কি করিতে পারেন?

চারু মনস্থ করিল—এ-বিষয় সে নদের চাঁদের সঙ্গে আলাপ করিবে। নদের চাঁদ ত কলিকাতা গিয়াছিল, সে হয় ত এ-বিষয় কিছু শুনিয়াছে। কার্ত্তিকের বউয়ের সম্বন্ধে কিছু আর বানাইয়া বলিবে না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখন ভগিনীর সহিত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়া চারু বলিয়া ডাক দিলেন।

চারু রান্না-ঘর হইতে ডাক শুনিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলিল—

যাই।

চারু আসিলে ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

একখানা চিঠির কাগজ ও খাম দেও।

চারু উহা কি-জন্য লাগিবে তাহা জানিতে না চাহিয়াই বড়-মামার নির্দেশ মত তোরঙ্গ খুলিয়া চিঠির কাগজ ও খাম আনিয়া দিল এবং দোয়াত কলমও দিতে ভুলিল না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা পাইয়া লিখিল—

৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়

যাত্রাপুর (৺[illegible]হর)
১লা চৈত্র।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা বৈবাহিকা মহাশয়াষু—

সম্প্রতি নিবেদন এই, আপনার কন্যাকে আমরা আর আনিব না। আপনি হয় ত আমাদের পত্রের অপেক্ষা করিয়া আপনার কন্যার আরব্ধ-কার্য হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আপনার সে-

চেষ্টা করা বৃথা হইবে। প্রকৃতি দুর্দম। আপনার আমাদের ভয় করা অনাবশ্যক। আপনার নিকট হইতে আমরা আত্মীয়তা প্রত্যাহার করিলাম। ইতি।

নিবেদিকা—

বৈবাহিকা।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ অরুন্ধতীর জবানি এই পত্রখানা লিখিয়া উহা পাঠ করিলেন। অরুন্ধতী উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিলেন। চারুর মনটা তখন যেন বাতাসে নড়া পাতার মত কাঁপিতেছিল। সে এক মনে উহা শুনিয়া আর যেন দাঁড়াইয়া রহিতে পারিল না। সে পুনরায় রান্না-ঘরে গেল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা লিখিয়া খামে আঁটিয়া শিরোনামা লিখিলেন। অরুন্ধতী যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন। ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

কাল সকালেই চিঠিখানা ডাকে ফেলতে হবে।

—আট—

বৈবাহিকার পত্র পাইয়া বৈবাহিকা শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই তিন দিনের মধ্যে দিবা-রাত্রিতে অতি কম সময়ই সেই তক্তপোষ হইতে নীচে নামিয়াছেন। নেহাৎ যাহাতে ঘরের বাহির হইতে হয়, তাহাতেই মাত্র ঘরের বাহির হইয়াছেন। তিনি এ-কয়েক দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিট কালও বোধ হয় নিদ্রা যান নাই। একেই ইন্দুমতীর অনিদ্রার অভ্যাস ক্রমেই বাড়িতেছিল। তাহাতে এই ব্যাপারে সে অভ্যাসটি ষোল আনায় আয়ত্ত হইল। তিনি যে সমস্ত সময়ই চোখের জল ফেলিতেছিলেন, তাহাও নহে, শুধু এক দৃষ্টিতে ছাদের কড়ি কাঠের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ইন্দুমতী বড়ই আশা করিয়াছিলেন—যে বৈবাহিক এ-রূপ ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। যদিও তিনি সে-দিন ব্রহ্মাণ্ডনাথের আকার-ইঙ্গিতে ইহাই বুঝিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাণ্ডনাথ একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তথাপি তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, যে এই বর্ষীয়ান লোকটি অন্ততঃ তাহাদের বিপদ গণিয়াও এ-রূপ ব্যবহার করিবেন। ইন্দুমতী তাই বৈবাহিকার এই পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি এখন স্থির বুঝিলেন বাস্তবিকই তাঁহারা নিরাশ্রয়া।

ইন্দুমতী এই চিঠিখানা পাইবার পর হইতে উহা যে কত বার শুনিয়াছেন, তাহা অবশ্য তিনি গণিয়া রাখেন নাই, তবে উহার বার বার আবৃত্তি শুনিয়া যেন তাঁহার উহার সমস্ত কথা এক রূপ মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি উহা যতই মনে ভাবেন, ততই যেন একটা বিস্ময়ের ভাব তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি মনে মনে বলিলেন—ভগবান! তুমি কার? তুমি অ-সহায়ের?

না, তুমি কখনও বিপন্নের নও। যে সম্পদে তোমায় ডাকে, সে-ই তোমার কৃপা লাভ কর্তে সমর্থ হয়। এই কত দিন যাবৎ আমি এক মনে এক প্রাণে তোমায় ডাকছি, ইহাই কি তাহার পুরস্কার?

বাস্তবিক ইন্দুমতী রমেনের এ-বাসায় উপস্থিতি ও অবস্থিতি অবধি সদা কাল এত ভক্তি-গদগদ-ভাবে ঈশ্বরের পদে করুণার ভিক্ষা জানাইতেছিলেন, যে তাহা বোধ হয় বিমানের জীবিত-কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া এবং বিমানের মৃত্যুর পর নিরবলম্ব হইয়াও তিনি জানান নাই। কারণ, এই বাসাটির আকাশ-বাতাস ক্রমেই তাঁহার নিকট অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল। যেন একটা স্বৈরাচারিতা অহর্নিশ এই বাড়ীটার উপর রাজত্ব করিতেছিল। উহা ইন্দুমতী তাঁহার কক্ষের তক্তপোষের উপর বসিয়া শুইয়া সহজেই বুঝিতে পারিতেন। আর ভাবিতেন—ময়নাটাকে কোনও নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিতে পারিতাম, অথবা তাহাকে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখা সম্ভব হইত, অথবা ময়নার কলেরা হইয়া সে তিন ঘণ্টায় মারা যাইত।

ইন্দুমতী মেয়েকে ক্রমেই চিনিতেছিলেন এবং তাহার বিষয় যে-গরিমময়ী ধারণা ক্রমশঃ তাঁহার জন্মিতেছিল, তাহা নিশ্চিন্ততার কারণ যথেষ্ট হইলেও, এ-রূপ আবহাওয়ায় কোনও বয়স্থা মেয়েকে রাখা কোনও মতে অভিপ্রেত নহে বলিয়া তিনি মনে করিতেছিলেন।

ইন্দুমতী এই দুর্দিনে যাহাকে এক মাত্র সাথী পাইয়াছিলেন, সে যে দিন-দিনই গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া প্রমাণ করিতেছিল। ইন্দুমতী সেই কবির ভাষায় মনে করিতেছিলেন—'যেই ডাল ধরি আমি, ভাঙ্গে সেই ডাল।'

বিমানের জীবিতাবস্থা হইতে রমেনের উপর ইন্দুমতীর যে এক ক্রূর

বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি এ-যাবৎ অপসারিত করিতে পারেন নাই, যদিও রমেনের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ অভিযোগ এ-যাবৎকাল হাতে-নাতে পান নাই। কিন্তু এ-বিষয় তিনি সদা-ক্ষণ সতর্ক থাকিতেন।

ইন্দুমতীর সর্বাপেক্ষা চিন্তা হইয়াছিল সুবর্ণকে লইয়া। তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া হিন্দু-সমাজের প্রতি ধিকার দিলেন। কেন আজ-কালকার বয়সের ছেলেরা জোর করিয়া, দাঙ্গা করিয়া বিধবা-বিবাহ এ-দেশে প্রচলন করে না। তাহা হইলে এ-রূপ সুবর্ণের সৃষ্টি হইত না। হৃদয়কে উপবাসী রাখিয়া ভগবানের আরাধনা করা বৃথা আড়ম্বর মাত্র। মনের দেহের উপর অধিকার না থাকিলে, দেহ ত যাহা ইচ্ছা, তাহা করিবেই। ইহা দেহের ধর্ম। আমি ক্ষুধিত, আমি আহার করিতে চাহিব, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়-সংযম না শিখিয়া কি-রূপে ইন্দ্রিয় সংযত করিব? মূষিকের তৃপ্তি গর্তে, সে ত সে-দরজায় প্রবেশ করিতে যুদ্ধ করিবেই। পূর্ব হইতে সেই কক্ষের আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া চুর-মার করিয়া দ্বারে কণ্টক আরোপিত কর, তবে আর সে সেখানে যাইতে লোভ করিবে না। ইন্দুমতী মনে মনে বলিলেন—ও-সব শাস্ত্রের বচন আওড়াইলে চলিবে না। চাই এ-দেশের যুবকদের চেষ্টা, যাহা কোনও নজীরের ধার ধারে না। তাহা না হইলে বিধবা-বিবাহের প্রচলন এ-দেশে হইবে না।

ইন্দুমতী যতই সুবর্ণের ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে লক্ষ্য করিতেন, ততই তাহার দুঃখ হইত। কিন্তু তিনি সুবর্ণকে দোষী করিতেন না।

বেচারীর বিবাহের দশ দিনও পার হইয়াছিল না, তখন স্বামী মারা গিয়াছিল। স্বামীর স্বাদ সে কখনও পায় নাই। তারপর গৃহেও তাহার পিতামাতা সন্তানের অবস্থা সম্যক বুঝিয়া কখনই তাহাকে কঠোর শাসনে রাখিতেন না, বরং ক্রমান্বয় আদর দিয়াই আসিতেন। পাছে

অভাগিনীর মনঃকষ্ট হয়, সে-কারণ তাঁহারা তাহাকে ক্ষণ-কালের জন্ম কাল মুখে কথা কহিতেন না, বা এমন কাজ করিতে দিতেন না, যাহাতে তাহার মনে দুঃখ হইতে পারে।

ইন্দুমতী শুনিয়াছেন—স্বামী বিয়োগের পর সুবর্ণ পেড়ে-শাড়ী পরিতে চাহিত না, কিন্তু সুবর্ণের মাতা জোর করিয়া সুবর্ণকে পেড়ে-শাড়ী পরাইতেন, কারণ তাহা না হইলে মাতা নিজে বিধবা কন্যার সম্মুখে উহা পরিবেন কি করিয়া? সুবর্ণ শুধু মাছটি খাইত না, কিন্তু পিতার দৌরাত্ম্যতে ফুলকপি, শালগম হইতে আরম্ভ করিয়া বৈধব্য-নিয়ম-বিরুদ্ধ সমস্ত খাদ্যই না খাইয়া পারিত না।

সুবর্ণের পিতা একটু সৌখিন ছিলেন, বেশ বাবু-গিরি করিতেন। তিনি তাই মেয়ের জন্য আলাদা সাবান, তুষার, সুগন্ধি তৈল, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া মেয়েকে উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতেন।

সুবর্ণ এ-যাবৎ কোনও রাত্রিতে লুচি বা পরোটা, আলুর তরকারী অথবা মিষ্ট প্রভৃতি ভিন্ন খায় নাই, কোনও উপবাস, যথা, একাদশী, শিব-রাত্রি প্রভৃতি পর্ব পালন করে নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্যের যত রূপ বন্ধন আছে, তাহা তাহার কাছে অতি শিথিল ছিল, তাহাতে তাহার পিতামাতা বরং উৎসাহই দিতেন।

সুবর্ণের তাই উন্নত বক্ষ, রসাল দেহ, চঞ্চল নয়ন, সিক্ত অধর। কিন্তু এই রূপ সঙ্গীন অবস্থায়ও সুবর্ণের মাতা সুবর্ণকে ছোট্ট অভাগী মেয়ে বলিয়া লক্ষণ ভাইয়ের সঙ্গে এক কক্ষে শুইতে দিতেন। তাহার কারণ দুইটি ছিল। প্রথমতঃ, সুবর্ণের মামা উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত—আই. এ. পাশ। দ্বিতীয়তঃ উহা না হইলে সুবর্ণের মাতার সুবর্ণের পিতার প্রতি প্রৌঢ় জীবনের নিষ্ঠুরতা করা হইত।

যাক, এই রূপে সুবর্ণের জীবনের নাট্য-লীলার পট পরিবর্তন হইতেছিল। ইন্দুমতী তাই সুবর্ণের রমেনের সহিত ভিড়িয়া যাওয়াকে সমর্থন করিতেন। তিনি উহাতে সম্প্রতি এই উপকার পাইয়াছিলেন—ময়নার প্রতি উহা যেন হইয়াছিল—গণ্ডারের চামড়ার ঢাল।

রমেন সুবর্ণকে লইয়াই মত্ত থাকিত। এ-দিকে সাধিকা ভয় দেখাইয়া, যথা, শীঘ্রই তাহারা এ-বাসা ছাড়িয়া দিবে—রমেনের নিকট হইতে এ-সংসারের যাবতীয় খরচ আদায় করিত। রমেনও বাড়ী-ভাড়া প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যয় বিনা আপত্তিতে, হাস্য-মূর্তিতে বহন করিত।

ইন্দুমতী রমেনের চরিত্রে একটি জিনিস দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে রমেনের সন্তোষ ও নিরুদ্বিগ্নতা। রমেন ছিল সমস্ত অবস্থায় খুসী। টাকা পয়সা তাহাকে রোজগার করিতে হইত, তাই সে করিত। কিন্তু টাকা-পয়সার যে তাহার খুবই দরকার ছিল, ইহা তাহার কখনই যেন মনে থাকিত না। আজ সে কেরাণী-গিরির শতেক টাকা আনিল, কাল পরশুর মধ্যে তাহার যেন হাত খালি। টাকা হাতে পাইয়াই সে ধুম-দাম করিয়া ইহা কিনিত, তাহা কিনিত, তারপর আবার মাস কাবারের পানে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু এই [illegible] থাকার সময় রিক্ততার জন্য তাহার বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তা আসিত না। টাকার টানাটানি হইলে সে আফিসের সহকর্মীদের নিকট হইতে অথবা বন্ধু-বান্ধবের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া লইয়া আসিত। শূন্যত তাহার ছিল স্বোপার্জিত অর্থের, ঋণের অর্থের তাহার অভাব ছিল না। তাহার ধারণা ছিল, যদি কেহ কিছু তাহার কাছে চাহিয়া না পায়, তবে সে বড়ই ছোট হইয়া পড়িবে, তাহার মান বুঝি ক্ষইয়া যাইবে।

ইন্দুমতী রমেনকে নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে একটা বড়ই আশ্চর্য অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা শুধু এই বলা—

'রমেন! তোমার ত্রিশটি টাকা ত খরচ করে ফেললাম, কখন তোমার দরকার?'

ইন্দুমতী যদিও জানিতেন, ঐ ত্রিশটি টাকা পুনরায় একত্র করিয়া দেওয়া হয় ত তাহার জীবনে ঘটিবে না, তথাপি তিনি রমেনের টাকা শোধ দেওয়ার জন্য ভারী ব্যস্ততা দেখাইতেন।

রমেন কাকী-মার ঐ ব্যস্ততায় সত্যই মনে ঘা খাইত, তাই ঐ বিষয় কথা উঠিলেই সে সরিয়া পড়িত।

রমেনের মন বড়ই পরিবর্তনশীল ছিল। তাহার চরিত্র কি-রূপ ধরণের খারাপ ছিল, তাহা ইন্দুমতী বুঝিতে পারিতেন না। রমেন মেয়েদের নামে লাফাইয়া উঠিত বটে, কিন্তু কোন মেয়েটি যে তাহার চোখে দীর্ঘ কালের জন্য সুন্দর বলিয়া মনে হইত, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যাইত না, কারণ এই সুবর্ণ, যাহাকে লইয়া সে ইদানীং যেন মাতিয়া ছিল, সে-সুবর্ণের কথাও তাহার সমস্ত সময় মনে থাকিত বলিয়া মনে হইত না।

যদি কোনও স্নানের যোগ পড়িত, রমেনের তখনকার ব্যবসায় ইহা হইত, যে গঙ্গা-তীরে যে কয়েকটি ঘাট ছিল, সেখানে গিয়া তাহার চৌ-পর-দিন মহলা দেওয়া, আর তের চৌদ্দ বছরের মেয়েদের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা। অন্য স্নান যাত্রীদের গায়ে গায়ে রমেনের ধাক্কা লাগিলে সে চটিয়া লাল হইত।

রমেন ঐ দিনে যে কত জায়গায় হোঁচট খাইত ও কত লোকের গালাগালি সহ্য করিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যাইত না। ইন্দুমতী উহা দেখিতেন, আর বিস্মিতা হইতেন।

ধ্যানের ছবি

সে-দিন হোলী উৎসব ছিল। স্নুবর্ণ বহু পূর্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, রমেন বাবুর সঙ্গে সে এ-বারে দোল খেলিবে। সে তাই তাহার বাবাকে দিয়া সের আড়াই আবীর, আড়াই পোয়া কুঙ্কুম-আভে মেশান, দুই আনার খুন-খারাপি রং, কিছু বাঁদুরে রংও বটে, আর একটা পেতলের পিচকারি কিনাইয়া আনিয়াছে। রমেন ইহা জানিত না। সে গত রাত্রিতে একটা বায়স্কোপে গিয়া 'র‍্যামন-নোভারো—ছং' প্লে-টি দেখিয়া মত্ত হইয়া গিয়া আর নাকি বাসায় ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছিল না। সে মনে করিয়াছিল, বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে প্রেম করিয়া নাকি পিপাসা মেটে না। সে তাই স্থির করিয়াছিল, পালাটি ভাঙ্গিলেই ঐ বায়স্কোপের ষ্টেজে ঢুকিয়া ষ্টেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়া লইবে— কলিকাতায় ঐ রকম ফিল্ম তোলা হয় কিনা, কিন্তু রমেন বায়স্কোপে তাহার জানিবার বিষয়টির বিশেষ কোনও সন্ধান তথায় না পাইয়া অনেক রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আজ ঘুম হইতে উঠিতে তাহার বিলম্ব হইতেছিল।

স্নুবর্ণ তাই রমেন-বাবুর ঘরে ঢুকিয়া কতগুলি রং আনিয়া শয্যায় নিদ্রিত রমেন-বাবুর সমস্ত মুখখানি ভাল করিয়া চিত্রি বিচিত্রিত করিয়া দিল। রমেন উহা টের না পাইয়া ঘুমের ঘোরে—'র‍্যামন নোভারো—আইডিয়েল লভার' বলিয়া একেবারে স্নুবর্ণকে জড়াইয়া ধরিল। স্নুবর্ণ তদবস্থায় থাকিয়া হাতে করিয়া আরও কতকগুলি রংয়ে রমেনকে ছোপাইয়া দিয়া 'হোলী—হোলী' করিতে লাগিল। রমেন তখনও নিদ্রিত।

তখন সন্তঃ প্রত্যূষ। দিবালোক তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। ছিন্ন তিমির সেই তে-তলার ছাদে লুব্ধ মিহিরের সঙ্গে লুকো-চুরি খেলিতেছিল।

অন্ধকার প্রকৃতি, আলোক পুরুষ। পুরুষের জয় হইল, প্রকৃতি হারিয়া গেল। অচিরে আলোক অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়া ঢাকিয়া রহিল। রমেনও সুবর্ণকে রাঙিয়া দিল।

ইত্যবসরে সাধিকা চিরস্বভাবানুযায়ী ছাদে আসিয়া দেখিল—আজ হোলী এবং হোলীর জীবন্ত প্রতীক এই দুই বাঞ্ছা-কল্প-তরু।

কোমলে-কঠিনেই যুক্ত হয়। রংয়ে রংয়ে দুই জনে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে।

সাধিকা এ-রূপ শুভ দিনে এই সুখ-মিলন দেখিল। সে ভাবিল—ইহাই দোল-লীলার মেরু-দণ্ড কি? সেই যমুনা পুলিনে রাধা-শ্যামের অতুল প্রেম-লীলা। শ্যাম চিক্কণ ঘন মধুর মোহন রূপের অনুরাগ, আর ভুবন মনোমোহিনীর উন্মাদনা। হোলী দোলোৎসব। কত দিন আজ অতীত হইয়াছে। সেই স্মৃতি, সেই প্রেমের স্মৃতি, সেই অনাবিলতার স্মৃতি আজ দিগন্তে মুখরিত। হে আমার দেব! হে আমার প্রেমিক! হে আমার প্রভু! তুমি এ জগতে যে-শিক্ষা, যে-নীতি, যে-আদর্শ দেখাইয়াছ, তাহারই কি এই অপ-ভ্রংশ? শ্রীরাধার প্রেম—যাহা অতি সত্য, অতি মধুর, অতি নির্মল, তাহারই ত এই অপ-ব্যবহার! লীলাময়! এই ভ্রংশতার আবিলতা পরিত্যাগ করিলে ইহা কত অস্তিত্বময়! অবাস্তব না দেখিয়া আমি যেন চির সত্য দেখিতে পাই।

সাধিকা যেন আর ছাদে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার মন বড়ই খারাপ হইল।

সে মনে করিল—আর না। অনেক দেখিয়াছি, ইহা আর আ-কণ্ঠ পান করিব না। সে একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

বলিতে কি, তাহার গত জীবনের দিনগুলি স্বতঃই মনে জাগিল। এই

সেই কক্ষ, এই সেই সাজ-সরঞ্জাম, আর ঐ সেই দ্বি-প্রহর। বিমান-দা তাহাকে এখানেই, সেই দিনই এই রূপই প্ররোচিত করিতে প্রলুব্ধ করিতেছিল। আমিও পতিত হইয়াছি! আমি কেন বিমান-দার লুব্ধদৃষ্টি-বহ্নিতে অন্ধ পতঙ্গের মত জড়াইয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? সেই সু-দূর বাল্য কাল হইতেই বোধ হয় বিমান-দা আমার প্রতি শ্যেন-দর্শনে চাহিয়া-ছিলেন; নতুবা তাহার এত আদর, এত পরিশ্রম, এত অর্থ-দণ্ড হইয়াছিল কেন? হে ভগবান! আমি আজ দীনা, আমি আজ বিগত জীবনের সমস্ত কলুষরাশির স্বীকারোক্তি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি কি সত্যই বিমান-দাতে লুব্ধা হইয়াছিলাম? হাঁ, লোভ হইয়াছিল তাহার মধুর প্রতিকৃতিতে, কিন্তু সে লোভ কখনই ইন্দ্রিয়-জাত ছিল না। দর্শন নয়নের ধর্মই পালন করিয়াছিল। কুসুম সুন্দর, তাহার দিকে আমরা তাকাইয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা কুসুমের অবমাননা করিব?

বস্তুতঃ বিমান-দা আমাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ত আমার মনে মোহ আনয়ন করে নাই। উঃ! আমার মনে হয়—এই সেই প্রকোষ্ঠ, এই সেই পাপ-কক্ষ, এই সেই পতন-নিকেতন। না, আর ঐ গৃহে প্রবেশ করিব না। আমার দেহ ওখানে যখন অপমানিত হইতে যাইতেছিল, তখন আমার স্বামী আসিয়াছিলেন। তাঁহার করাল মূর্তি যেন দণ্ড-ধারী সেই স্মরণীয় মুহূর্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উঃ! আর গতি নাই। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। দেহ মৃৎ-পাত্র-স্বরূপ। দেহ উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, আর সে মৃৎ-দেহ ঘর্ষণে-মার্জনে পূত হইবে না।

সাধিকা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া বহু চিন্তা করিয়াছিল, শেষে আর সে ভাবিতে না পারিয়া মায়ের কাছে গেল। মাতার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া সাধিকা যথা-রীতি মাতাকে শায়িতাই দেখিল। সে আর তখন তাঁহাকে

ডাকিল না, বা ঘরের ভিতর বিশেষ শব্দ করিল না। মাতা কিন্তু তাহাতেও টের পাইলেন, যে কন্যা ঘরে আসিয়াছে।

ইন্দুমতী তখন ময়না বলিয়া ডাক দিয়া বলিলেন—বস, এখানে বস।

ময়না মায়ের গায়ে গা মিশাইয়া বসিল। মাতা তখন উঠিলেন। তিনি সহসা বালিশের তলায় হাত গুঁজিয়া দিয়া সেই খামের চিঠিটা টানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন—

ময়না! চিঠিখানা পড় ত।

ময়না বলিল—

মা! চিঠির ভিতর এমন কি নূতনত্ব আছে, যে তুমি ঐ চিঠিখানা লক্ষ বার পড়িয়েও পড়ান ছাড়বে না? ওতে ত আছে শুধু অপবাদ, ভীষণ ইঙ্গিত। মা! আমি ব্যভিচারিণী হয়েছি, তুমিও হয়ত আমাকে তাতে প্রবৃত্ত করাচ্ছ—তাইই শাশুড়ী বোঝাচ্ছেন। মা! এত অপমান আমার মা আমায় চিঠিতে করলেন? আমি তাঁর পুত্র-বধূ। মা! শাশুড়ী কি আমার চরিত্রের বিষয় এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছেন, যাতে আমাকে কুলটা ভাবতে সাহসী হলেন?

সাধিকার কণ্ঠে তখন দীপ্ত তেজ উদ্ভাসিত হইল। যেন তাহা সেই কবির ভাষায় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।

ইন্দুমতী এত কাল তাহাকে ছোট্ট অবুঝ মেয়ে মনে করিয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহারই শিশু ময়না, দুর্বলা বালিকা ভাবিয়াছেন, কিন্তু মেয়ের অন্তরে যে এত আত্ম-সম্মান-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা তিনি কখনও মনে করেন নাই। ইন্দুমতী, যিনি দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে দিন দিন দুর্বল-চিত্তা হইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার চোখের সামনেও যেন তন্মুহূর্তে

সাধিকার কঠিন দৃঢ়তা প্রতিভাত হইল। তিনি নিজেও তখন রোষ-দীপ্তা না হইয়া পারিলেন না।

তিনি বলিলেন—ময়না! দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার যে সাংসারিক ধর্ম। এতে ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, দুঃখিত হয়ে যে কোনও লাভ নাই, বরং দৈন্যের বোঝা আরও টেনে আনা হবে। ময়না! এখন কি উপায়?

উপায়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে সাধিকা আরও দৃঢ় ভাবে জবাব দিল—

মা! আমি উপায় স্থির করেছি। মা! আমি 'দেবী চৌধুরাণী' হব। বিমান-দার কাছে সেই ঔপন্যাসিকের 'প্রফুল্ল'র গল্প শুনেছি। আমি তাই কর্ব।

ইন্দুমতী উহার কিছুই বুঝিলেন না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সাধিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে স্থবর্ণ রঙ-বেরঙে সাজিয়া গুপ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া সাধিকার কথার জবাব দিল—

হাঁ, ভাই! তুমি শ্বশুর-বাড়ীতে স্থান না পেয়ে যখন এসে ডাকাতের দলে যোগ দেবে, বা বজরায় অভিযান কর্তে যাবে, তখন আমি তোমার সেনানী হব। আর শেষে যখন তোমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে ঢাকে-[illegible] বরণ করে নিতে আসবে, তখন আমি তোমার সই বা দাসী ব একটা কিছু হব।

ইন্দুমতী চুপ করিয়া গেলেন। স্থবর্ণের এ-রূপ ভৈরবী মূর্তি দেখিয়া তিনি যেন ঘৃণায় মগ্না হইলেন। তিনি আর তাহার দিকে বিশেষ তাকাইলেন না।

স্থবর্ণ বলিল—

কাকী-মা! আজ হোলী। কাকী-মা আমি তোমার পায়ে একটু আবীর বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

কাকী-মা ইহাতে হাঁ,—না করিলেন না, কারণ কোনও কথা বলিলেই ত সুবর্ণ ঘর ছাড়িয়া যাইবে না। ইন্দুমতী তাই সুবর্ণকে আবীর পরাইয়া দিবার জন্য পা ছাড়িয়া দিলেন।

সুবর্ণ ইন্দুমতীকে আবীর পরান শেষ করিয়া যখন সাধিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ছি ময়না! আজকার দিনে কি গুমড়ে বসে থাকতে হয়? এস, হোলী খেলি, তখন চুপ করিয়া রমেন ঐ কক্ষে প্রবেশ করিল। সে রাস্তা হইতে বাঁদর সাজিয়া মস্ত বড় এক হাঁড়ি খাবার কিনিয়া লইয়া আসিয়াছে।

রমেন বলিল—সুবর্ণ! শুধু আবীর মাথাতে এসেছ? দাও, কাকী-মাকে নমস্কার দাও, আর এই শুদ্ধ কাপড়ে তৈরী রসগোল্লাগুলি কাকী-মাকে দাও। ময়না এস, সবাই মিলে খাবারগুলির কিনারা করি।

সাধিকা তখন ঐ কক্ষ ত্যাগ করিল এবং বলিয়া গেল—থালা আনছি।

রান্না-ঘরে থালা আনিতে গিয়া সাধিকা দেখিল, মাত্র দুই খানা থালা, প্লেট ধোয়া আছে। সে আর দুই খানা সকড়ি বৃন্দাবনী লইয়া কল-তলা মাজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বাসন মাজা কি করিয়া চলিবে? সে কাঁদিয়াই অস্থির।

তাহার মনে হইয়াছে, তাহার স্বামীর এক মাত্র প্রিয় পর্ব দোল-পূর্ণিমা ও তাহার উৎসব। এই ত চাঁচর, বুড়ো-বুড়ী পোড়ান। আজ তাহার স্বামী কোথায়!

সাধিকা স্বামী, স্বামী বলিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। তাহার বিবাহের রাত্রির স্বামীর অদ্ভুত চীৎকারের কথা মনে পড়িল। স্বামীর পার্শ্বের সেই

প্রাণের বন্ধু নদে ঠাকুর-পোর কথা স্মরণ হইল। বন্ধুর কথায়ই ত তিনি বাক-রুদ্ধ হইয়া চারি পাঁচ ঘণ্টার অধিক নিস্তব্ধ ছিলেন। শেষে সেই গৃহ-দাহের বীভৎস দৃশ্য তিনি দেখিয়া আর চীৎকার না করিয়া পারিয়াছিলেন না।

সাধিকা মনে করিল, সে অতি শীঘ্র এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাত্রাপুরে যাইবে এবং তাহার স্বামীর বন্ধু নদের চাঁদ ঠাকুর-পোকে এক বার দেখিবে এবং সম্ভব হইলে তাহাকে অনুরোধ করিবে, স্বামীকে তিনি খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবেন কি না। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে। বন্ধুর ভালবাসা বন্ধুকে টানিয়া আনিবে। অন্যে তাহা পারিবে কেন?

সাধিকা থালা আনিতে দেরি করিতেছে দেখিয়া সুবর্ণ ঐ ঘর হইতেই চীৎকার করিল—

ময়না! ভাই! থালা কি তোমায় গিলে খেল?

ইন্দুমতী সুবর্ণের কোন রূপ অমায়িকতা আজ-কাল পছন্দ করিতেন না। ক্রমেই যেন সে তাহার চক্ষু-শূল হইতেছিল। ইন্দুমতী তাই বলিলেন—

সুবর্ণ! তুমি কি স্নান না করেই এ-সব খাবে? সুবর্ণ বলিল—

কাকী-মা! আজ যে হোলী। আমি যে পরমা বৈষ্ণবী।

ইন্দুমতী আর কোনও কথা বলিলেন না। রমেন বলিল—

কাকী-মা! সুবর্ণ বেশ 'আপ-টু-ডেট'। আমার তাই ওকে বেশ ভাল লাগে। বাঃ! সুবর্ণ! বেশ দেখাচ্ছে ত! কাকী-মা চোখ বুজিলেন এবং যেন কানে আঙ্গুল দিলেন। ক্রমে দুইটি দিন কাটিল।

সাধিকা স্থির করিয়াছে, সে তাহার মাতাকে লইয়া সকাল নয়টার ট্রেণে আজ যাত্রাপুর রওনা হইবে।

প্রাতঃকাল হইতে রমেন বায়না ধরিয়াছে, সে উহাদের সঙ্গে যাইবে।

সাধিকা তাহাতে কোনও মতে রাজি হইল না। ইন্দুমতী কন্যার কথায় সায় দিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে অন্য কেহ না থাকিলে যে তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর বাহির হইতে চান না।

ময়না বলিল—না, না, তা হবে না। কাউকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না। তাতে যা-ই হয়, হবে। সে একটু ভাবিয়া পুনরায় বলিল—

মা! দুই দিকেই আমাদের বিপদ। যদি কাউকে সঙ্গে নিই, তবেও আমরা দোষী হব—শ্বশুর বাড়ীর লোকে বলবে, যে যার-তার সঙ্গে এ-রূপ করে বেড়ায়, আর যদি কাউকে সঙ্গে না নিই, তবেও তারা বলবে, ছোট লোকের জাত, এদের সঙ্গে আবার কি সঙ্গীর দরকার হয়? দুই দিকেই আমাদের মুস্কিল। এ-রূপ ক্ষেত্রে কোন লোক সঙ্গে নিয়ে আমরা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রক্ষিতা হব না। আমরা সবার রক্ষিতা সাজব। এ বিশ্বই আমাদের রক্ষক। মা! যার কেউ নাই, তার যে সব আছে, তা কি তুমি জান না?

রমেনকে সঙ্গে লইয়া ইহারা যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় সুবর্ণ বলিল—

রমেন-বাবু! আমরা এদের ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসব। তাই ভাল। এ-বাড়ীটা ত রক্ষা করা চাই। সব জিনিষ-পত্র ফেলে কি করে সকলে যাওয়া যায়? যদি দরজা ভেঙ্গে চোরে সব নিয়ে যায়?

রমেন বলিল—

তা কি হয় সুবর্ণ? এরা যে আমার পাহারায় আছে। এরা যে বিমানের আশ্রিত। বিমান নাই, এখন যে এরা আমার কর্তৃত্বাধীন। শত হলেও বিমানের সঙ্গে যে অনেক দিন একত্র পড়েছিলাম। বিমান ত ওখানে থেকেও আমার কর্তব্যের ত্রুটি ধর্তে পারে। তা হয় না সুবর্ণ! তুমি এ

কয়েকটা দিন আর কাউকে নিয়ে এ-বাসার প্রহরী থেক। আমি এদের
সঙ্গে যাবই।

রমেন বলিল—

কাকী-মা! ভয় নাই, ময়নার কোন অনিষ্ট আমায় নিলে হবে না। য
হবে, তা আপনিই হবে। আর ময়না ত আমার কাকী-মার মেয়ে, আমা
বোন, অপর ত কেউ নয়।

—নয়—

চারু নদের চাঁদের বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া যে-রূপ শান্তি পাইয়াছিল, এ-রূপ শান্তি বোধ হয় তাহার জীবনে সে কোনও দিনই পায় নাই। কার্তিকের বন্ধু নদের চাঁদ, ওলের বন্ধু তেঁতুল। সেই নদের চাঁদের পত্নী-ভাগ্য যে এ-রূপ চমৎকার, তাহা চিন্তা করিয়া চারু শুধু ভগবানের বিচার-শক্তির তাৎপর্যের তারিফ করিল। এমন সরল উৎক্ষিপ্তকে সংসারে বাঁধিয়া স্থির করিয়া রাখিতে হইলে যে এ-রূপ ধারা বুদ্ধিমতী দেবীর আবশ্যক, ইহা তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবেন? চারু তাই নদের চাঁদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া এই অত্যন্ত ভালবাসার জনকে ফেলিয়া কিছুতেই যাইতে চাহিতেছিল না।

এ-দিকে কমলা চারু-দিকে যেন সিরিষের মত জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে শুধু বলে—

চারু-দি! বলুন ত আপনি আমার পূর্ব জন্মে কে ছিলেন? আমার আপনাকে এত মধুর লাগে কেন? ইচ্ছা করে, চারু-দি, চারু-দি করে দিন-রাত আপনার আদর-যত্ন করি, আপনার কথা শুনি, আপনার কোলের মধ্যে শুয়ে আপনার বুকে মুখ গুঁজে সময় কাটাই। চারু-দি! আমি, কিছু চাইনা, আপনি শুধু বলুন কমলা! তুই আমার আপনার ভাজ। চারু-দি! সত্যি আপনি মন্তর জানেন, নইলে যে এমন উগ্র চণ্ডী, তাকে আপনি কি করে হাতের মুঠোর মধ্যে করে রেখেছেন? ও ত চারু-দি, চারু-দি করে অস্থির। চারু-দি! সাপুড়ে না হলে কি সাপ ধর্ত্তে পারে?

চারু-দি কমলার কথায় মনে মনে শুধু বলিল—কমলা যাহা বলিয়াছে, তাহা শুধু তাহার নিজের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্বামীকে বশে রাখিতে বধূ ভিন্ন সংসারে কে পারে? এতে সীতা-সাবিত্রীও সাজিতে হয়, কমল-কিরণময়ীও হইতে হয়। কমলাতে চারু-দি যেন সর্ব-সমন্বয় দেখিয়াছিল। সেই ফুট-ফুটে চেহারাটুকু, সদা হাসি মুখখানি, মধুর কথাগুলি, সমস্তই যেন কমলাকে মা-কমলা করিয়াছিল। নদের চাঁদ কিন্তু কোনও দিন চারু-দিকে তাহার বৌয়ের কথা বলে নাই। চারু-দি সে-দিন নদের চাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া উহা জানিয়াছিল।

কমলাকে দেখা অবধি চারুর মনে একটা বড় আকাঙ্খা জন্মিয়াছিল—ভগবান অপরিমেয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া কার্তিকের প্রতিও এ-রূপ সদয় হইবেন, কার্তিকের বধূও কমলার মত হইবে।

চারু সেই রাত্রির কথা মনে করিয়া নিতান্ত ব্যথা পাইল ও তাহার চির সাধ—কার্তিকের বধূকে দেখা, তাহা যেন মুহূর্তে ধূলির সাথে মিশিয়া গেল। সাধিকার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, জীবনে হয় ত সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু সে-দিনকার ব্যাপারে সে-সম্ভাবনা চির জীবনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে।

চারু সেই বড়-মামা-প্রেরিত চিঠির কথা যেন ভাবিতেই পারি[illegible] না। ছি! ছি! এ-রূপ কলঙ্ক আরোপ কোনও বিচার-বুদ্ধি-স[illegible] মানুষে করিতে পারে না—না জানিয়া শুনিয়া তাহার আদি-বৃত্তান্ত! সন্দেহের উপরই ত এ-কার্য করা হইয়াছে। শুধু আক্রোশ!

চারু এ-বিষয় লইয়া নিজে নিজে বহু চিন্তা করিয়াছে। শেষে উহার হেতু নির্ধারণ করিতে অপারগ হইয়া নদের চাঁদের নিকট আ-মূল শুনিতে চেষ্টা করিয়াছে, তারপর কথাচ্ছলে কমলার কাছেও ইহা

বলিয়াছে, কিন্তু উহারা সকলে কিছুই যে ইহার কিনারা করিতে পারে নাই।

চারু-দির এখন শুধু ইহা মনে হইতেছে—কেন নদের চাঁদকে সে এই বৃত্তান্ত বলিয়া উত্তেজিত করিয়াছে? আবার সে ভাবিতেছে—নদের চাঁদই বা ক্ষেপিয়া কি করিবে? বড়-মামা যে নদের চাঁদেরও বটে। নদের চাঁদ গোঁয়ার-গোবিন্দ হইলেও সে বড়-মামার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিবে কি?

চারুর মন তাই নানা চিন্তায় পুড়িয়া খাঁক হইয়া যাইতে লাগিল। সে নিরুপায় হইয়া নদের চাঁদকে এই অসম সাহসিক কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল—যেন অন্ধকারে দা, কুড়ুল, সড়কি বড়-মামাকে সে ছুঁড়িয়া না মারে।

নদের চাঁদ চারু-দির পা ছুঁইয়া স্বীকার করিয়াছে, যে সে বড়-মামাকে কিছু বলিবে না, তবে গ্রামের অন্য কেউ যদি এ-বিষয় লইয়া কোঁদল করে, তাহা হইলে সে তাহাকে জাহান্নামে পাঠাইবে, অর্থাৎ রাত্রি-কালে চৌ-মাথা পথের উপরের গাছে চড়িয়া সে বসিয়া থাকিবে এবং সেই কোঁদল-কারী বাজার করিয়া সেই পথে আসিলে তাহার মাথায় সেই গাছের উপর হইতে বড় বড় থান ইট, অথবা পাথরের বড় ঢিল সে ছুঁড়িয়া মারিবে অথবা উঁচু হইতে ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার ঘাড় মটকাইবে। চারু-দির ইহাতেও ভয় হইল।

কয়েক-দিন পরে নদের চাঁদ তাহার অভ্যাস মত রাত্রি-কালে ষ্টীমার-ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছে। সঙ্গে একটি টিনের লণ্ঠন। ছোট কেরোসিনের ডিবা টিপ টিপ করিয়া উহার ভিতর জ্বলিতেছে, আর উহার কালি তাহার হাতময় করিতেছে। পথে আসিবার কালে নদের চাঁদ বার বার

লণ্ঠনের কাচ চারিখানি পরখ করিয়া লইয়াছিল, যে উহার মধ্যের যে দুইখানি কাচ ফাটিয়া গিয়াছে, তাহা চলিতে গেলে পড়িয়া যাইবে কি না। ইত্যবসরে টৌনা-ষ্টেশনের একটু দূর হইতেই ষ্টীমারের সিঁটি দিল, যে সিঁটির শব্দ শোনা নদের চাঁদের কাছে আবাল্য চির রম্য লাগিয়া আসিতেছে।

তাহার মনে পড়িল—কার্তিকের সঙ্গে সে কত কাল একত্র হইয়া অন্ধকারে গুপারি, নারিকেল, আম, জাম, এঁটেলি, খেজুর বৃক্ষের সারির মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়া ষ্টীমার ধরিয়াছে এবং ষ্টীমারে আগত ভদ্র, ইতর জাতির কত মোট-মাটালি ষ্টীমারের 'ডেক' হইতে কাঁধে করিয়া আনিয়া নদীর তীরের অসমতল চরার উপর পাতান একখানি তক্তা সিঁড়ি দিয়া অতি সন্তর্পণে কুলির মত নামাইয়া আনিয়াছে এবং আবশ্যক হইলে ঐ মাল-পত্র আবার টৌনা-ষ্টেশন হইতে দূরে গ্রামের ভিতর বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়াছে। ইহাতে উপকৃতেরা কার্তিক-নদের চাঁদকে কত ভাল বলিয়াছে, যথা, এ-রূপ পরোপকারী দেশের যুবকেরাই আজ কালকার মহাভারত মহাদেশের প্রাণ।

কিন্তু আজ কার্তিক তাহার সঙ্গে নাই। তাই নদের চাঁদ ভার মনেই অভ্যস্ত কার্য করে, আর প্রতি দিনের ষ্টীমারেই ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখে—কার্তিক আসিয়াছে কি না। তাহার অদৃষ্টে আর দৌড়াইয়া গিয়া চারু-দিকে নূতন খবর বলিয়া বাহাদুরী বা আদর পাওয়া ঘটে না।

চারু-দি অবশ্য রোজই অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিত—নদের চাঁদ! আজ ষ্টীমারে কে কে এল? নদের চাঁদ বলে—এ, সে, কত লোক।

ষ্টীমার আসিয়া ষ্টেশনে অনেক ক্ষণ লাগিয়াছে। সে-দিন ষ্টীমারে

বেজায় ভিড় ছিল। বোধ হয় কোন ছুটি উপলক্ষে বাবুরা দুই-এক দিনের জন্য দেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

নদের চাঁদ অন্ধকারে অনেককে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতেছে ও জোরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—সারেং! সাবধান, সাবধান, সিঁড়ি যেন পড়ে না, সিঁড়ি যেন পড়ে না, ভাল করে 'ব্যেম্বু' ধর খালাসি! ভাল করে, 'প্যাসেঞ্জার' নামছে।

ইত্যবসরে নদের চাঁদ শুনিতে পাইল—মচ। অর্থাৎ সেই তক্তার সিঁড়িখানা উক্ত শব্দে ভাঙ্গিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়াছে, আর এক সিঁড়ি লোক জলে হাবু-ডুবু খাইতেছে। নদের চাঁদ লাফাইয়া গিয়া জলে পড়িয়া দেখিল—ঘাটে জল কম, এক গলা হইবে। সে গগন-ভেদী চীৎকার করিয়া বলিল—'ভয় নাই, ভয় নাই, ভাঙন না, ভাঙন না, চরা।

ষ্টেশনে ও ষ্টীমারে মহাকলরোল পড়িয়া গেল। যাহাদের যে-রূপ আলো ছিল—কাহারও দেশী লণ্ঠন, কাহারও হেরিকেন—সমস্ত তাহারা বাহির করিল।

মূহূর্ত-মধ্যে নদের চাঁদ জল হইতে দৌড়াইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া, নিকটবর্তী একটা চালা-ঘরের দোকানে প্রবেশ করিল। অদূরে গরুকে খড়-জল দিবার একটা মস্ত বড় ডাগারী পড়িয়াছিল। এক বস্তা তুষও নিকটে ছিল। সে ঐ তুষ ঐ ডাগারীতে ভরিয়া ঐ দোকানের এক টীন কেরোসিন তেল উহাতে ঢালিয়া দিল, এবং উহা ষ্টেশনের উঁচু মাটীর ডিবির উপর আনিয়া রাখিল।

দোকানী অবশ্য ক্যাট ক্যাট করিতে লাগিল—কেন অতগুলি তুষ ও কেরোসিন নদের চাঁদ লইয়াছে? নদের চাঁদ তাহাকে ভয়ানক চোটের সহিত তাড়া দিয়া বলিল—এতগুলি লোক ডুবে মরছে, আর তোমার ঐ দুটি তুষ, এক ফোঁটা কেরোসিন গেল, তাই তোমার ভারী লেগেছে? নিও আমার বাড়ী থেকে ওর চার ডবল তুষ ও এই তেলের দাম।

নদের চাঁদ দৌড়াইয়া গিয়া বিড়ি ধরাইবার দেশলাই নিজের ট্যাঁকের টীনের কৌটার মধ্য হইতে বাহির করিয়া ঐ পাত্রে আগুন ধরাইয়া দিয়া উহা একবার উস্কাইয়া দিল।

মুহূর্ত-মধ্যে ভীষণ অনলালোক দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং নদীর এ-কূল ও-কূল আলোকিত করিয়া ফেলিল। ষ্টীমারের সারেং—আচ্ছা বাবু! আচ্ছা বাবু! করিতে লাগিল। প্যাসেঞ্জারগণ ঐ আলোকে নিজেদের জিনিষ-পত্র কুড়াইতে লাগিল।

রমেন জলে পড়িয়া আর উঠিতে পারে নাই। তাহাকে না দেখিয়া সাধিকা বলিল—

মা! রমেন-দা?

সাধিকা মাতাকে লইয়া আগেই আসিতেছিল, তাই তাহারা দুই জনে ঘাটের গোড়ার সিঁড়ি হইতে একটু লাফ দিয়া তীরে পড়িতে পারিয়াছিলেন, যদিও তাহাদের সমস্ত কাপড়-চোপড়ে জল-কাদা ছিটিয়া গিয়াছিল। সাধিকা তাহা সংযত করিয়া পুনরায় বলিল—

মা! রমেন-দা?

নদের চাঁদ অদূর হইতে এই মহিলাটির অস্ফুট কণ্ঠ—'মা! রমেন-দা!—শুনিয়াছিল। সে কাদা-মাখা ভিজা-কাপড়ে মহিলাটির প্র[illegible] অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

বৌ-দি! কি বলছেন?

মহিলা জবাব দিল—

আমাদের সঙ্গের আমার দাদাকে দেখছি না ত।

নদের চাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল—

বৌ-দি! তাঁর নাম কি?

মহিলা উত্তর করিল—

রমেন-বাবু।

নদের চাঁদ তখন অতি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—

রমেন-বাবু! রমেন-বাবু! আপনি ষ্টীমারে না জলে? সাড়া দিন।

রমেন-বাবু, যিনি সিঁড়ি ভাঙ্গায় 'সুট-কেশ' লইয়া একেবারে ষ্টীমারের কোলে গিয়া পড়িয়াছিলেন, হাঁক দিলেন—ভয় নাই, ব্যস্ত হয়ো না, এই যে আমি রমেন।

নদের চাঁদ তখন পুনরায় ঝাঁপাইয়া গিয়া রমেন-বাবুর নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিল—ভদ্র লোক গলা-জলে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছেন। তাঁহার গায়ের ভিজা পরণ-পরিচ্ছদাদির জন্য এবং 'সুট-কেশ'টির ভারে তিনি এত ভারী বোধ করিতেছেন, যে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ও-দিকে নদীর জলের স্রোতের টান ষ্টীমার আসায় আরও বাড়িতেছিল।

রমেনের বাড়ী ছিল বীরভূমে। নদী আসিয়া দেখিয়াছে গঙ্গা। তাই এই নদী-সঙ্কুল পল্লী-গ্রাম দেখিয়া একে তাহার বিস্ময় ও ভীতির পরিসীমা ছিল না, তাহাতে এই মহাকাণ্ড, সে যেন শঙ্কায় অর্ধ-মৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, নদের চাঁদ তাহাকে কোনও মতে উপরে তুলিয়া আনিয়া সুস্থ করিয়া বলিল—

রমেন-বাবু! আপনি যেখানেই যান না, আজ আমার সঙ্গে আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে, তা নইলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। আমি এ-সব মাল-পত্র মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলছি, আপনারা কষ্ট করে আমার সঙ্গে চলুন, লণ্ঠনটা আমার হাতেই থাকবে। কোনও ভয় নাই আপনাদের।

রমেন এক বার ঘোমটা-স্থিতা কাকী-মার মুখ পানে তাকাইল, এবং এক বার ময়নার অন্য দিকে ফেরান অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখ-পানে চাহিল, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে যেন ইঙ্গিত পাইল না এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাইতে। রমেন তাই কিয়ৎ কাল চুপ করিয়া রহিল।

নন্দের চাঁদ বলিল—ও-কি রমেন-বাবু! কথা কইছেন না যে? ভিজে কাপড় শীগগির না ছাড়লে যে অসুখ কর্বে। চলুন, রমেন-বাবু।

নন্দের চাঁদের কথায় রমেন-বাবু বিশেষ সাড়া দিল না, [illegible] নড়িল না!

এ-দিকে ষ্টীমার ছাড়িয়া গিয়াছে, ষ্টেশন হইতেও যে-যাহার মাল-পত্র বহিয়া লইয়া একে একে যাইতেছে। নন্দের চাঁদ সহসা রমেন-বাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

রমেন-বাবু! আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। আপনাকে এঁদের নিয়ে এই দিগ-রাতে বনের পথে এই বিপন্ন অবস্থায় আমি কিছুতেই ছাড়ছি না। রমেন অনন্তোপায় হইয়া বলিল—

বাবু! আপনি এঁদের বলুন।

সাধিকা তখন অস্ফুট কণ্ঠে নেপথ্যে রমেন-দাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—

রমেন-দা! ভদ্র লোককে বলুন—আমাদের ক্ষমা কর্তে হবে।

সাধিকা ফিরিয়া তাহার গলা ছোট করিয়া মাতাকে বলিল—

মা! এ অন্যত্র নয়, আমাদের বর্তমান অবস্থায় যেখানে-সেখানে গিয়ে ওঠা কোনও মতেই উচিত না।

নন্দের চাঁদ আর রমেন-বাবুর মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি পুনরুচ্চারিত শুনিতে অপেক্ষা করিতে পারিল না, কারণ সে উহা সমস্তই নিজ কানে শুনিতে পাইয়াছিল। সে বলিল—

বৌ-দি আমি ভদ্দর লোক একটুও নই। বামুন বটে, তবে ছোট লোকের

এক শেষ, গোঁয়াড়, গামাল। আমি যা বুঝি, তা করি, আধুনিক শিক্ষিতদের মত দো-ভাষায় কথা বলি না। বৌ-দি! ইনি আপনার মা ত? মাঐ-মা! পায়ে ধরছি, আপনার পায়ে মাথা লোটাচ্ছি, আমি যা বলেছি, তা আপনাদের কর্তেই হবে। আর না হয়, আমি এখানে শুচ্ছি, আপনারা আমার মাথা মাড়িয়ে, আমায় পথে সরিয়ে রেখে, যেখানে হয় যান, নইলে আমি পথ রোধ করে রাখলাম। মাঐ-মা! তা কি হতে পারে? যাঁদের আমি জল থেকে ডাঙ্গায় তুলেছি, তাদের আমি বনে ফেলে যেতে পারি? অন্ধকারে আলো নিভিয়ে ঘরে যখন শোব, তখন সেই অন্ধকার দেখেই আমার প্রাণ কেঁদে উঠবে—আপনাদের কোথায় অন্ধকারে ফেলে চলে এলাম।

নদের চাঁদ না-ছোড়বান্দা হইল। অবশেষে তাঁহারা সকলেই নদের চাঁদের সঙ্গে নদের চাঁদের বাড়ী গিয়া পৌছিলেন।

ব্রহ্মময়ী তখন চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় দশটা। ব্রহ্মময়ী এই আগন্তুকদের দেখিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন—

ও হারাম-জাদা! তোর এমন কম্ম? ভদ্র লোকদের ষ্টেশন থেকে আনলি—শুনেছি আমি ভোম্বলের কাছে, রাতের ষ্টীমারের সিঁড়ি ভেঙ্গে অনেক লোক জলে পড়ে গেছে। পাজি! দৌড়ে কেন বাড়ী এলি না? ঘরে কি শ্বশুর-পিতৃ-পুরুষের আশীর্বাদে কাপড়ের অভাব ছিল? কেন এঁদের ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে আনলি না? দে এঁদের নতুন লাল পেড়ে শাড়ী সিন্দুক থেকে বের করে। আর ঐ ভদ্র লোককে দে একখানা সরু লাল পেড়ে ধুতি। আর আপনি মা! এই নতুন কাচা সাদা কাপড়খানা পরুন। আপনার আশীর্বাদে উনি অনেক থানের কাপড় পান; বছরে ও-রকম দুই দশখানা গরীব দুঃখী বিধবা মেয়েদের

আমি বিলাই। ও কমলা! নেকি! আয় আলোটা নিয়ে। এই দেখ তোর বয়সী এক জন এসেছে। আজ তোর রাত্তিরে বেশ ঘুম হবে। নাঃ, আর ঘুম না, গল্প করেই কাটাবি, তা কি আমি বুঝি না? মা! আপনি কাপড় ছেড়ে বসুন। যাও বৌ-মা! ঘরে যাও। ঐ যে আমার ঘর-আলো-করা পুতের বৌ। নদের চাঁদ! ড্যাকরা! দাঁড়িয়ে আছিস? ঐ ভদ্র লোককে কাপড় ছাড়িয়ে বসতে দে, তামাক দে।

সমস্ত কার্য যেন নিমেষে হইল।

ব্রহ্মময়ী ইন্দুমতীর সহিত বসিলেন। কমলা সাধিকাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রান্না-ঘরে গেল। তাহার ছেলে-মেয়েরা তখন ঘুমাইতেছিল। নদের চাঁদ তখন রমেন-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল।

ইহাদের আতিথ্যে ও সম্ভাষণে আগন্তুকগণ সকলেই প্রীত হইলে বটে, কিন্তু সাধিকার মন যেন দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সে চিন্তা করিতে লাগিল—

কে এই জন, যে তাহাদের ষ্টেশন হইতে এত সমাদরে বাড়ী লইয়া আসিয়াছে, যাহার নাম এই বাড়ীর গৃহিনী কিছু কাল পূর্বে উচ্চারণ করিলেন?

সাধিকা ভগবানের পায়ে নিবেদন জানাইল—

ভগবান! এক নামে এক গ্রামে যেন দুই জন থাকে।

ভগবান এই নবাগতা নবীনার করুণ প্রার্থনা শুনিলেন কি? নদের চাঁদ নামে কিন্তু এই গ্রামে দুই জন হইল না। সাধিকার উৎকণ্ঠিত মন অনতিবিলম্বে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া কমলার মুখ হইতে পাকে-চক্রে শুনিয়া লইল। সাধিকা প্রমাদ গণিল।

সে-রাত্রি যেন কমলা বা নদের চাঁদের কাছে প্রভাত হয় না। নদের

চাঁদ রমেন-বাবুর ঘরে শুইয়াছিল। কমলা ও সাধিকা এক বিছানায়ই রাত্রি যাপন করিয়াছিল এবং ব্রহ্মময়ী ইন্দুমতীর পার্শ্বে ছিলেন।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হাত-মুখ না ধুইয়াই নদের চাঁদ কমলার ইচ্ছানুযায়ী চারু-দির কাছে গেল। কমলা নদের চাঁদকে বলিয়া দিয়াছিল, যে সে চারু-দিকে ইহা বলিবে—চারু-দি কমলার মরা মুখ দেখেন, যদি তিনি এই সঙ্গে না আসেন। নদের চাঁদ চারু-দির কাছে কমলার শেখান কথা ভিন্ন অন্ত কিছু বলে নাই। সে চারু-দিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

এ পল্লী-গ্রাম, সহর নয়। অনতিকাল-মধ্যে গ্রামের সকল লোকই জানিল—ষ্টীমার-ঘাটে কি ঘটিয়াছে এবং নদের চাঁদের বাড়ীতে কাঁহারা আসিয়াছেন।

গ্রামের অধিবাসী মেয়ে-পুরুষ সকলে দলে দলে এই বাড়ীতে আসিতে লাগিল এবং এই আগন্তুকগণের নূতন সাজ, আধুনিক কায়দা দেখিয়া তারিফ করিতে লাগিল। এক বৃদ্ধা ত বলিয়াই ফেলিল—তোমরা বল, নদের চাঁদের বউ অপ্সরা, দেখ ত এই বউটি এসেছে, যেন ডানা-কাটা পরী। অন্ত প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিল—উনি কারা?

* * * * *

মধ্য পাড়ায় ভট্টাচার্যদের বাড়ী আজ ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হইবে। গ্রামের মাতব্বর ব্রহ্মাণ্ডনাথ যে সভাপতি হইবেন, ইহার নিমন্ত্রণ গত পরশ্ব ব্রহ্মাণ্ডনাথ লোক মারফত পাইয়াছিলেন। আজ বেলা তিনটার সময় দলে দলে ব্রাহ্মণ দল-পতিরা শশি ভট্টাচার্য-মহাশয়ের নাট-মন্দিরে আসিয়া ভিড়িলেন, এবং মস্ত বড় একটা আগুনের কুণ্ড হইতে শশি ভট্টাচার্যের চাকর দুই জন কলকিতে আগুন তুলিতে লাগিল, আর চারি পাঁচটা হুঁকা অবিরল হাত বদল করিবার ব্যবস্থা করিল।

রাজকুমার চক্রবর্তী বলিল—

ছি ছি ছি! জাত ধম্ম রসাতলে গেল!

গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোটা গলায় তামাক টানিতে টানিতে জবাব দিলেন—

রাজু-খুড়! তুমি বল খালি খালি। দোষ উদ্ধব সমদ্দারের আর ঐ অকাল কুষ্মাণ্ড নদে-বেটার।

রাজকুমার। কেন? নদেরই বা কি দোষ? উদ্ধব সমদ্দারেরই বা কি দোষ? এক জন এসেছে অন্য দেশ থেকে। এসে বিপদে পড়েছে। খেলা কথা তোলা? জলে পড়েছে, তাই নদে তাদের ঘরে এনেছে। এতে তার বাপের কি মহাদোষ হয়েছে?

গিরিশ। তবে তুমি বল—দোষ কার?

রাজকুমার। তা বলতে গিয়ে জেল খাটব?

গিরিশ। না, বলই না।

রাজকুমার। না, বলব না, এ-দেশ খারাপ, এ-দেশের বাতাসের কান, মুখ, সবই আছে।

গিরিশ। বাঃ! কি মুস্কিল।

রাজকুমার। তুমি তা বুঝবে কি? বয়স হতে এল সত্তর, কিন্তু বুদ্ধির মাথাটি খেয়েছ। যদি নিজে কিছু না বোঝ, তবে বাড়ী গিয়ে গিন্নী-ঠাকরুণকে পাঠিয়ে দাও, তিনি সভা-সমিতি করুন। তোমার কাজ না সমাজ রক্ষা। যে দিন-কাল পড়েছে···। বুঝতে পার না এই হালী আমদানি দেখে? যে-লোকটা এদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে, সে বলে ভাই—ব্রাদার, আপন কেউ না।

গিরিশ। তাই নাকি?

রাজকুমার। আরে সেই বিমান-বাবুও যা ছিলেন, রমেন-বাবুও তাই।

গিরিশ। রাজ্‌খুড়ো! মানুষ হও ত, এদের এ-দেশে স্থান দিও না। এ-বীজ বড় সাংঘাতিক, দেশ-শুদ্ধ ছেয়ে ফেলবে, এ কচুরিপানা, তা জান?

রাজকুমার। এসেছি ত তাই কর্ত্তে, এখন দেখি ন্যায়পঞ্চানন, স্মৃতিরত্ন-মশায়রা কি বলেন। আর যে-ঘরের কাণ্ড, তাতে পণ্ডিত-মশায়ের বাক্যি বেরুলে হয়।

ইত্যবসরে ব্রহ্মাণ্ডনাথকে অদূরে আসিতে দেখিয়াই চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা সুর পাল্টাইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—

রাজকুমার। এ নাট-মন্দিরখানা বেশ বড়, বেশ পাঁচ শ লোক এখানে বসতে পারে।

গিরিশ। কত কালের তৈরী এখনও ঠিক আছে।

রাজকুমার। না, জায়গায়-জায়গায় ঘুণ ধরে গিয়েছে। এখানে প্রত্যেক পূজায় থিয়েটার, যাত্রা, কথকতা, পুঁথি প্রভৃতি হয়। বেশ, দেশের একটা আড্ডা, সভা, সমিতি, কমিটির জায়গা।

ব্রহ্মাণ্ডনাথকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উপস্থিত সভ্যগণ কেহ দাঁড়াইল, কেহ হাই তুলিয়া হাত দুই থানার আলস্য ঝাড়িয়া প্রেসিডেণ্ট মহাশয়কে অভ্যর্থনা জানাইলেন। ক্রমে একে একে ছোটতে-বড়তে ঘর খানার অর্দ্ধেকাংশ ভরিয়া গেল।

প্রেসিডেণ্ট-মহাশয়কে আর উঠিতে হইল না। তিনি মধ্য-স্থলে সেই পাতা শতরঞ্চির উপরই বসিলেন। দূরে নিকটে সভ্যগণ, দর্শকগণ উপবেশন করিলেন। তামাকের ধূম্রে যেন সেই ঘরের উপরাংশটায় মেঘ জমিল। কেহ খো খো করিয়া কাসিয়াও তামাকের টানের মাত্রা

ত্যাগ করিতে পারিল না, কেহ ঐ সময়ের মধ্যেই পৈতা কানে জড়াইয়া গাড়ু লইয়া প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেল। অদূরে কয়েক জন যুবক ধব-ধবে ফতুয়া পরিয়া, কেহ বা চোখে সোনার, কেহ বা 'সেলের' [illegible] দিয়া বৃদ্ধদের অদ্ভুত স্বভাবের নিন্দা-বাদ করিতে লাগিল।

প্রেসিডেন্ট-মহাশয় তখন সভাস্থ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

আজ কিসের সভা? কি উপলক্ষ্য করে এ-সভা ডাকা হয়েছে, তা ত আমি কিছুই জানি না। যে চিঠি নিয়ে গেছল, সেও কিছু বলতে পার্লে না—কি জন্য সভা হবে।

সভ্য-বৃন্দ সকলেই মৌন রহিল। সভা-স্থল গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিল। একটি মধ্য-বয়স্ক সহসা বলিয়া ফেলিল—

আপনার ভাগ্নে কার্তিকের বউ নাকি নিজের মাকে সঙ্গে করে, আর একটি বন্ধু নিয়ে, সেধে শ্বশুর-বাড়ী এসেছেন, তাকে আপনারা নাকি আগে ত্যাগ করেছিলেন। আজ এই সভা এঁরা এ-জন্য ডেকেছেন, যে [illegible] নিতে হলে গ্রাম্য সমাজ-বন্ধন অনেক শ্লথ হয়ে যায়। [illegible] এখন আ[illegible]নি এই ব্রাহ্মণ-সভার প্রবর্তক ও সভাপতি, আপনি [illegible] সভায় যা হক মতামত দিয়ে যাবেন, এঁরা তাই-ই আশা করেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ জলে পড়িলেন না। তাঁহার চোখের সমুখের [illegible] পর্দাটা যেন কেহ হঠাৎ টানিয়া ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিল, [illegible] তাহা তিনি নিজেই জানেন না।

এই সময় নরের চাঁদ সভা-মণ্ডপে আসিয়া বলিল—

বড়-মামা। এখানেই—এই নাকারির [illegible] তিনি আপনাকে একটি বার ডেকেছেন। আপনি না গেলে তিনি নিজে এখানে উপস্থিত হবেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সকলের অনুরোধে—'আগে ঐ কাজটা সেরে আসুন, তারপর কথা হবে'—গাত্রোত্থান করিয়া চারুর কাছে গেলেন।

বড়-মামা যাইতেই চারু বড়-মামার পা দুইখানি দুই হাতে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল—

বড়-মামা! তুমি কিছুতেই এঁদের বাড়ীতে রাখতে অমত কর্তে পার্বে না। আমরা এক-ঘরে হয়ে থাকব, সেও ভাল, তুমি কার্তিকের বউকে ফেলতে পার্বে না। বড়-মামা! আমি মাকে বুঝিয়ে, বলে-কয়ে ঠিক রাখব। কার্তিক কোথায় গেছে, তার অবর্তমানে তার বউ যেন অপমানিতা হয়ে চলে না যায়।

ব্রহ্মাণ্ড আকাশ জুড়িয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—

ও-সব ছেলে-মানষী কর্তে গেলে সমাজ রাখা চলে না। স্ত্রী নায়ক, বহু নায়ক হলে সংসার মাটি হয়।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তন্মুহূর্তে এক ঝাঁকানি দিয়া চলিয়া গেলেন। চারু-দি সেই ধূলায়ই লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নদের চাঁদের বক্ষ যেন তখন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ পূর্ব হইতেই রাগিতেছিলেন এবং চারুর ব্যাপারে আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি সভা-স্থলে ফিরিয়া আসিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন।

স্মৃতিরত্ন-মহাশয় ও স্থায়পঞ্চানন-মহাশয় ব্রহ্মাণ্ডনাথের অনুপস্থিতি সময়ে বচন আওড়াইতে আওড়াইতে মুক্ত-কচ্ছ হইয়া গিয়াছিলেন এবং দুই জনে বিষম শাস্ত্র-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডনাথের পুনরাগমনে উহা পুনরায় মহামারী ব্যাপারে পরিণত হইল। তাহার সারার্থ এই—

কার্তিকের বউয়ের ব্যভিচার-দোষ ব্রহ্মাণ্ডনাথকে ত দুষ্ট করিবেই,

অধিকন্তু উদ্ধব সর্দ্দার, তাঁহার পুত্র নন্দের চাঁদ ও উদ্ধবের পরিবারবর্গ অশুচি-গ্রস্ত। সুতরাং এরা সকলেই শাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

আপনারা থামুন, থামুন, আমি দেখছি। সমাজের কোনও [illegible] এই ব্রহ্মাণ্ডনাথ বর্ত্তমান থাকতে হবে না। অবিলম্বে এই [illegible] দলের মাথা মুড় করে মাথায় ঘোল ঢালব। ব্রহ্মাণ্ডনাথের সে রক্তে জন্ম নয়। সে হিন্দু। তার সমাজ তার নিজের হৃদয়, তার পত্নী তার নিজের বক্ষঃ-পঞ্জর।

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ইট-পাটখেল যেন কামানের গোলার মত সেই সভায় আসিয়া পড়িতে লাগিল।

রাজকুমার মাথায় ঘা খাইয়া পড়িয়া গেল। গিরিশ নীচু হইয়া শতরঞ্চিতে শুইয়া পড়িয়া কোনও মতে বাঁচিল। ন্যায়পঞ্চানন, স্মৃতিরত্ন-মহাশয়—দোহাই বাবা! রক্ষে কর, রক্ষে কর, প্রাণে মের না, প্রাণে মের না বলিয়া অর্ধোলঙ্গাবস্থায় দৌড়াইল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন—নন্দের চাঁদ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ইট ছুঁড়িতেছে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ নন্দের চাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

নন্দে! ফৌজদারীর আসামী কর্ব জানিস?

নন্দের চাঁদ বলিল—

বড়-মামা! চার-দিকে কথা দিইছি, যে আপনার গা ছোঁব না, নৈলে এত ক্ষণ ফৌজদারী, দেওয়ানী বের হয়ে যেত। করুন সে-ফৌজদারী এখন। তা হলে আপনার ভাগীকে আদালতে হাজির কর্ব, তা জেনে রাখুন। বলুন, যে-পাষণ্ডরা কার্তিকের বৌয়ের বিষয় এই সব খারাপ কথা মুখে

ধ্যানের ছবি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা।

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০-এ, গৌর লাহা স্ট্রীট
কলিকাতা

—গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

১। লক্ষ্য-ভেদ (উপন্যাস)—

২। বসন্তের ফুল (ছোট-গল্প)—

৩। বাংলা-ভাষায় ছোট-গল্প—

(বাংলা ছোট-গল্পের ইতিহাস—আরম্ভ হইতে ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উৎসর্গ

অকৃত্রিম সুহৃদ্বর

প্রথিতনামা ঔপন্যাসিক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার

সুসাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের কর-কমলে

এই উপন্যাসখানি উৎসৃষ্ট হইল।

ধ্যানের ছবি

উপহার

পূর্ব-কথা

"ধ্যানের ছবি" উপন্যাসখানি "সাথী" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এক বৎসরের অধিক কাল যাবৎ প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে। এখন উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। "সোনায় সোহাগা" উপন্যাসের ঘটনাংশ "ধ্যানের ছবি" উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাংশ বিধায় ইহা এ-বারে একত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, যদিও "সোনায় সোহাগাকে" স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাসনা রহিল, "সপ্ত কাণ্ড নর-রামায়ণ" নাম-করণ করিয়া "ধ্যানের ছবি", "সোনায় সোহাগা" প্রভৃতি এই রূপ সাতখানি উপন্যাস প্রকাশিত করিব। জানি না, পাঠক-পাঠিকাগণ এই দীর্ঘ উপন্যাস পছন্দ করিবেন কি না।

গ্রন্থকার